756 B 00212 6

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

বঙ্গলক্ষ্মী

৩৪শ বর্ষ—বর্ণানুক্রমিক বর্ষসূচী

মাঘ, ১৩৬৫—কার্ত্তিক, ১৩৬৬

লেখ সূচী

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
অমৃতের সাধনা	মীরা দেবী	৬৬
অনামী	ধীরেন বসু	৭৩
অন্নপূর্ণা স্মরণে	বিভা সরকার	৮১
অন্ধের মুক্তি	হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৮২
অন্তরালে	নীহাররঞ্জন সিংহ	৩৬
অনুভূতি (কবিতা)	কল্পনা মল্লিক	১০৭
আবাহন সঙ্গীত	যূথিকা দাস	১২৯
আশাদির মহিলা সমিতি	অন্নপূর্ণা রায়	৬১
উপনিষদমালা	পুষ্প দেবী	৩১
একটি বিকেল (কবিতা)	রমেন্দ্রনাথ মল্লিক	৩৭
এ যুগে নারীদের সমস্যা	ডাঃ সরলা ঘোষ	৬
একটি রাজপথের আত্মকাহিনী	অনুরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৭
এ কালের মন	হিরণ্ময়ী বসু	১১৬
কালের প্রহরী (কবিতা)	সুপ্রীতা মিত্র	৭
কাঞ্চনজঙ্ঘা	দুর্গাবতী ঘোষ	১৪
কাদম্বরী	নমিতা রায়চৌধুরী	২০
কৃষ্ণকলি	কৃষ্ণপ্রভা ভাদুড়ী	১৫, ৫২, ৮৮
গ্যালিফ ষ্ট্রীটের সেই বাড়ীটি	মীরা দেবী	৯
ছেলে	পুষ্প দেবী	১০৫
জাহ্নবী জীবন (উপন্যাস)	কমলা দেবী	১৩০
দীপ জ্বালি	রমেন্দ্রনাথ মল্লিক	১১৫
দুর্গতিহরা দুর্গার আবাহনে	কবিকঙ্কণ হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	
নাচের পুতুল	অনুজবালা দেবী	
নিবিড় রাত্রির পর (কবিতা)	সিদ্ধার্থ গঙ্গোপাধ্যায়	১২৪
নূতন ভবিষ্যৎ (কবিতা)	হেমলতা ঠাকুর	৫
পাষাণের কান্না	জিতেন্দ্রলাল ঘোষ	৭৫
পূরবী ও সুরুয়া বধূ	নন্দিতা গঙ্গোপাধ্যায়	৩২
প্রতিবেশী	ঊর্মিলা দেবী	৩৪
প্রসাধন	হিরণ্ময়ী বসু	৯৬
বিদেশের ডাকে	প্রীতি সেন	৪৮
বিরহ আধিল সে [illegible])	উমাশী চট্টোপাধ্যায়	১২৯
বৃষ্টিতে	রমেন্দ্র নাথ মল্লিক	৯৬
ভারতের গ্রামীন স্বাস্থ্যকেন্দ্র	রাজকুমারী অমৃত কাউর	৩
ভুলেছ কি সেই সব কথা (কবিতা)	অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	
মনের মানুষ	আশা গঙ্গোপাধ্যায়	
মহিলা সমাচার	জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ	
মুসলমান যুগে দুর্গাপূজা	ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী	১০৩
যুগ পরিবর্ত্তন	নির্ম্মলচন্দ্র দে	৬৮
রাণীক্ষেত (কবিতা)	দুর্গাবতী ঘোষ	৩১
শুভ শরৎ	ইন্দিরা দেবী	১০৪
শ্রীশ্রীদুর্গা	স্বামী সচ্চিদানন্দ	৯৯
সমস্যাকণ্টকিত বাংলা	সতীদেবী মুখোপাধ্যায়	১১৩
সমাধান (কবিতা)	আদিত্যনাথ মিশ্র	১১৪
সরোজনলিনী	পুষ্প দেবী	১
সরোজনলিনী স্মরণে	তরলিকা সান্যাল	৫
সমাজ সমস্যায় নারীর দায়িত্ব	কণা দেবী	১৩
সঙ্কোচ কেন বা এত অভিসারে হবে	অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	৯৪
সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি		৫১, ৬২, ৯৬, ১৩৬
সাহিত্যে শাশ্বত জয়ী ও শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ	—তপতী চট্টোপাধ্যায়	৩৮
সাঁঝের প্রদীপ (কবিতা)	ধীরেন বসু	৪৭
সাম্প্রতিক সাহিত্যে তরুণ লেখকের ভূমিকা	—গোপালকৃষ্ণ রায়	
সাম্প্রতিক সাহিত্য ও সমালোচনা	—গোপালকৃষ্ণ রায়	
সিঁদুর খেলা	রমা দেবী	
সুবোধবালা ঘোষ স্মরণে	জিতেন্দ্রলাল ঘোষ	
স্বয়ংসিদ্ধা অন্নপূর্ণা		
স্নেহের শিকল	হিরণ্ময়ী বসু	
স্বপ্ন বাসর	মীরা দেবী	
স্বপ্ন	গীতা গুহ	
স্বর্গীয় মন্দির	ধীরেন বসু	

লেখক সূচী

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
অন্নপূর্ণা রায়—আশাবির মহিলা সমিতি (গল্প)		৪১
অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—সঙ্কোচ কেন বা এত		
	অভিসারে হবে (কবিতা)	
ঐ—ভুলেছ কি সেই সব কথা (কবিতা)		
অনুরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়		
	—একটি রাজপথের আত্মকাহিনী	৮৭
অমৃতবালা দেবী—নাচের পুতুল (গল্প)		২২
আদিত্যনাথ মিশ্র (কবিতা)—সমাধান		১১৫
আশা গঙ্গোপাধ্যায়—মনের মানুষ (একাঙ্কিকা)		১২১
ইন্দিরা দেবী—শুভ শরৎ (প্রবন্ধ)		১০৪
উর্ম্মিলা দেবী—প্রতিবেশী (ঐ)		৩৪
কণা দেবী—সমাজ সমস্যায় নারীর দায়িত্ব (প্রবন্ধ)		
কল্পনা মল্লিক—অনুভূতি (কবিতা)		
কমলা দেবী—ভাগীরথী জীবন (উপন্যাস)		
গীতা গুহ—স্বপ্ন (গল্প)		
গোপালকৃষ্ণ রায়—সাম্প্রতিক সাহিত্যে		
	তরুণ লেখকের ভূমিকা (প্রবন্ধ)	৭৮
ঐ সাম্প্রতিক সাহিত্য ও সমালোচনা		১১২
জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ—মহিলা সমাচার		২৬, ৬২, ৯৫, ১৩৪
জিতেন্দ্রলাল ঘোষ		
	সুবোধবালা ঘোষ স্মরণে (প্রবন্ধ)	
ঐ— পাষাণের কান্না (গল্প)		
তরলিকা সান্যাল—সরোজনলিনী স্মরণে (কবিতা)		
তপতী চট্টোপাধ্যায়—সাহিত্যে শাশ্বত ত্রয়ী ও		
	শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ (প্রবন্ধ)	৩৮
ঐ বিরহ জাগিল সে হৃদয়ে(কবিতা)		
দুর্গাবতী ঘোষ—কাঞ্চনজঙ্ঘা (কবিতা)		১৪
ঐ রাখীবন্ধন (ঐ)		৩৯
ধীরেন বসু—সাঁঝের প্রদীপ (কবিতা)		৪৭
ঐ—অনাদী		৭৪
ঐ—ক্ষয়িষ্ণু মন্দির		১১৮
নমিতা রায়চৌধুরী—কাদম্বরী (প্রবন্ধ)		২০
নন্দিতা গঙ্গোপাধ্যায়—পূরবী ও মহুয়া কবু (প্রবন্ধ)		৩২
নির্ম্মলচন্দ্র দে—যুগ পরিবর্ত্তন (প্রবন্ধ)		
নীহাররঞ্জন সিংহ—অন্তরালে (গল্প)		
পুষ্প দেবী—সরোজনলিনী (প্রবন্ধ)		
ঐ—উপনিষদমালা (কবিতা)		৩১
ঐ—ছেলে (গল্প)		১০৫
প্রীতি সেন—বিদেশের ডাকে (প্রবন্ধ)		৪৮
বিভা সরকার—অন্নপূর্ণা স্মরণে (ঐ)		৮১
মীরা দেবী—অমৃতের সাধনা (গল্প)		৬৬
ঐ প্যালিক ষ্ট্রীটের সেই বাড়ীটি		৮৯
ঐ—স্বপ্ন বাসর		১০৯
ভক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী—মুসলমান যুগে		
	দুর্গাপূজা (প্রবন্ধ)	১ ৩
যূথিকা দাস—আবাহন সঙ্গীত		১২৯
রমা দেবী সিঁদুর খেলা (প্রবন্ধ)		১১৮
রমেন্দ্রনাথ মল্লিক—একটি বিকেল (কবিতা)		৪৭
ঐ— বৃষ্টিতে (ঐ)		৯৬
ঐ— দীপ আলি (কবিতা)		১১৫
রাজকুমারী অমৃত কাউর—ভারতের		
	গ্রামীন স্বাস্থ্যকেন্দ্র (প্রবন্ধ)	
সতীদেবী মুখোপাধ্যায়—সমস্যাকণ্টকিত		
	বাংলা (প্রবন্ধ)	১১৪
ডাঃ সরলা ঘোষ—এ যুগে নারীদের সমস্যা (প্রবন্ধ)		৬
স্বামী সচ্চিদানন্দ—শ্রীশ্রীদুর্গা		৯৯
সিদ্ধার্থ সংগোপাধ্যায়—নিষিক্ত		
	রাত্রির পর (কবিতা)	১২৪
সুপ্রীতা মিত্র—কালের প্রহরী (কবিতা)		৭৪
হিরণ্ময়ী বসু—প্রসাধন (প্রবন্ধ)		৪৪
ঐ— স্নেহের শিকল (গল্প)		৭২
ঐ — একালের কল		১১৬
হেমলতা ঠাকুর—নূতন ভবিষ্যৎ (কবিতা)		৫
হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—অন্ধের মুক্তি (গল্প)		৮২
ঐ— দুর্গতিহরা দুর্গার আবাহনে		১০২
ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী—কৃষ্ণকলি (উপন্যাস)		১৪, ৪৫, ৮৮

P30216

৩৪শ বর্ষ]　　মাঘ—১৩৬৫　　[১ম সংখ্যা

সরোজনলিনী

শ্রীপুষ্প দেবী

প্রথম সরোজনলিনী দেবীকে আমি দেখি আমাদের বাড়ীতে। পরণে তাঁর খদ্দরের চাকাই, মাথায় কাপড় লেপিন দিয়ে আটকান। একহাতে একটি বালা ও মোটা শাঁখা। অপর হাতে একটি রিষ্টওয়াচ ও শাঁখা। আজ-কালকার কীর্ত্তন ও শীতলতায় ঘুম তখন নয়। কাজেই তাঁর সাজের মধ্যেকার বৈশিষ্ট্য আমার শিশুমনকে প্রবল ভাবে নাড়া দিয়েছিল। তখন আমারও বয়েস নয় কি আট হবে। শুনেছিলুম ইনি এম-বি-ই টাইটেল পেয়েছিলেন। আমার বাবারও এম-বি-ই টাইটেল ছিল। কিন্তু তখনকার ঘুগের মহিলাদের মধ্যে এ সম্মান প্রায় বিরলই ছিল বাবার এম-বি-ই টাইটেল পাবার কথা মনে করতে গেলে মনে পড়ে আমরা তখন পাবনায়। বাবার বন্ধুরা দলবেঁধে এসেছিলেন বাবাকে সম্বর্দ্ধনা জানাতে পরণের ধুতি পরে খালি পায়ে এসে বাবার কপালে দিয়েছিলেন চন্দনের তিলক গলায় দিয়েছিলেন সাদা ফুলের মালা। কি মালা তা মনে নেই। ঐ সময় আমি পাবনার স্কুলে পড়তুম। সে সময় বাবা সরকারী চাকরীতে থাকা সত্ত্বেও তাঁর ইংরাজ বিদ্বেষের কথা এক ঘটনায় মনে আছে। স্কুল দেখতে আসবেন লাট সাহেব। আমাদের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ক্লাসে এসে জানালেন তাঁরা আমায় নির্ব্বাচন করেছেন লাট সাহেবের গলায় মালা পরানর জন্য। মনের আনন্দে বাড়ী ফিরে বাবাকে দেকথা বলতেই, বাবার মুখ প্রলয় গম্ভীর হয়ে গেল। বললেন "না তা হতে পারে না।" কি যে এর মধ্যে কোথায় আছে বুঝতে পারিনি সেদিন। পরে শুনেছিলুম বাবা স্কুলে জানিয়েছিলেন তাঁর মেয়ে কোন ইংরেজের গলায় মালা দেবে না। তখন সময় সংক্ষেপ। তবু স্কুল কর্তৃপক্ষ কোন-রকমে কলকাতায় খবর দিয়ে মালার বদলে একটী ফুলের স্তবক দিয়ে সে যাত্রা আমায় রক্ষা করেন। আমার বাবা ছিলেন সে যুগের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা পাওয়া মানুষ—মনে হয় এই ঘটনাই আমার মনে প্রথম ইংরাজ বিদ্বেষের বীজ বপন করে। থাক্ বাবার কথায় আমি আসল মানুষ থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছি। বলছিলুম সরোজনলিনী দেবীর কথা। জানি না সবাই জানেন কিনা সরোজনলিনী খুব ভালো টেনিস খেলতে পারতেন। অমন সুন্দর টেনিস খেলতে খুব কম মেয়েকেই আমি দেখেছি। তাঁর মাথার কাপড় একটু সরতো না। কোনদিন দেখিনি তাঁকে একবিন্দু অসংযত বা একফোঁটা অশৌভন তাঁর ভেতর। আমার মা তখন খুব অসুস্থ। মা ছিলেন কলকাতায় আর আমি ছিলুম বাবার অপরিহার্য্য সঙ্গী। বাবা টেনিস খেলতেন আমি

থাকতুম মাঠে দাঁড়িয়ে। আবার কখনো এমনও হয়েছে সরোজনলিনী খেলা শেষ করে বাড়ীর ভেতর চলে যাবার সময় আমাকে ডেকে নিয়ে যেতেন। বাবা হয়ত তখন অন্য কারুর সঙ্গে খেলছেন। ঐ সময় একদিনকার কথা মনে পড়ে। তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখেছিলুম তিনি নিজে হাতে করে তরকারি কুটে দিচ্ছেন। তার মধ্যে একটি বড় আলুকে কেটে আধখানা তিনি তুলে রেখে দিলেন আলের আলমারীর মধ্যে। তাঁর মিতব্যয়িতা আমি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছিলুম। আবার বলছি সে আজকের কথা নয়। আজ দৈনন্দিন মাছ তরকারীর খরচের জন্য পাঁচ টাকার বাজার করতে দিতে গেলে বেশ ভাবতে হয় এতে চারজন প্রাণীর দু'বেলার মাছ তরকারী কুলুবে কিনা। কিন্তু সে যুগে দৈনন্দিন বাজারের জন্য এক টাকায় পর্য্যাপ্ত বাজার হত। যাঁরা একটু বুঝেসুঝে চালাতেন তাঁদের বাড়ী আট আনার বাজার হতেও শুনেছি। সেদিনে আধখানা আলুর সম্বন্ধে একজন আই সি-এস অফিসারের স্ত্রীর এতটা সচেতনতা কম প্রশংসনীয় নয়। আবার এ জিনিষও স্বচক্ষে দেখেছি মুক্তহস্তে তাঁদের দানশীলতাকে দান করতে। এই দানের জন্য তাঁরা নিজেদের সম্বন্ধে যে মিতব্যয়িতা করতেন তার মূল্য কম নয়।

আমি যে যুগের কথা বলছি তখন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব বিশেষ করে উচ্চপদস্থ কর্মচারী মহলে তাদের অনুকরণের অনেক খারাপ জিনিষ এনে দিয়েছিল। সেই যুগে গুরুসদয় দত্ত ভারতীয় কৃষ্টিকে রক্ষা করার জন্য তাঁর আপ্রাণ চেষ্টা ও ত্যাগ দিয়ে তিনি যেমন ইংরাজ প্রভাব থেকে নিজেদের রক্ষা করেছেন তেমনি আই-সি-এস মহলের দৃষ্টিভঙ্গীরও মোড় ফিরিয়ে দিয়েছেন।

আজ মেয়েদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা ও ডিগ্রীর অভাব নেই। কিন্তু সরোজনলিনীকে আর আমি কারুর মধ্যে পেলুম না। শুনেছি তাঁর শিক্ষার প্রথম ভিত্তি ইউরোপেই হয়েছিল—কিন্তু পাত্রবিশেষে তা সত্যিকারের শিক্ষা হয়ে তাঁকে উঁচুতেই তুলেছিল। তিনি যে ভারতীয় নারী এ বোধ তাঁর রক্তে মজ্জায় প্রতি ধমনীতে সর্ব্বদা সচেতন ছিল। অমন আত্মসম্ভ্রম বোধ অমন শালীনতা অমন পাতিব্রত্য ভারতীয় নারীর বৈশিষ্ট্যতায় অমন করুণা ও মমতায় ভরা মন সত্যিই দুর্লভ বস্তু।

আজকের নতুন আবহাওয়ায় কীর্ত্তন ও গীতসভার মাধ্যমে মহিলাদের মধ্যে আবার সেই পুরনো দিনের অনুকরণে কিছুটা আগ্রহ হই। কিন্তু সে যুগে যখন বাড়ীতে গীতা বা চণ্ডী বাখলে সেটা রাজদ্রোহিতার অপরাধে দণ্ডনীয় ছিল, তখনকার যুগে গুরুসদয় দত্ত মশায়ের মালকোঁচা মেরে কাপড় পরা, আমার বাবার তসরের ধুতি ও খড়ম পরে বাইরে বেরোন ও সরোজনলিনীর বেহালা আমাদের মেম সাহেবের বদলে মা ডাক কম বিস্ময়কর বস্তু ছিল না। নিজেদের ভারতীয় কৃষ্টি ও শিক্ষা সম্বন্ধে গৌরব বোধ অথচ সংস্কার মুক্ত মনের জন্যই বোধহয় আমার বাবা স্বর্গত সুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের অত শ্রদ্ধাভাজন হতে পেরেছিল।

আজ বারে বারেই শুধু মনে হয়, কই আবার কেন সরোজনলিনীকে আমরা পাচ্ছি না ও কই তাঁর আদর্শ নিয়ে আবার কেন ঘরে ঘরে জন্মাচ্ছেন না সাধ্বী সরোজনলিনী আদর্শ স্বরূপিনী সরোজনলিনী, আমার সেই শৈশবের মনের সোনার পাতে আঁকা সরোজনলিনী ?

ভারতের গ্রামীন স্বাস্থ্য কেন্দ্র

লেখিকা—শ্রীরাজকুমারী অমৃত কাউর
অনুবাদ—শ্রীবীরা পাঠক, বি-এ

৪০ বছর আগে যখন গান্ধীজি প্রথম রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তখন তিনি আমাদের এই কথাই সচেতন করিয়ে দিয়েছিলেন যে, ভারতবর্ষ প্রধানতই গ্রামীন ও কৃষি-প্রধান দেশ এবং তার সমৃদ্ধি নির্ভর করছে গ্রামবাসীদের কল্যাণের উপর। শিক্ষিত মানুষরা প্রায় সকলেই সহরবাসী। এই সত্য আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। "ভারত যদি বাঁচতে চায় তবে তার গ্রাম সকলকে আগে জাগিয়ে তুলতে হবে"—এই ছিল গান্ধীজির বাণী। অতএব আমরা সকলেই যে দোষে দোষী (নিজ স্বার্থ পূরণের জন্য গ্রামের কাছ থেকে গ্রহণ করা) সেটা বন্ধ করতে হবে। এখনও আমি সময় সময় ভাবি, আমরা সহরবাসীরা কি সত্যই গ্রাম-বাসীর মঙ্গল কামনা করি? ও তার জন্য কতখানিই বা স্বার্থ ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছি?

আমরা যখন রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করলাম তখন আমাদের গ্রাম সমূহের কিরূপ অবস্থা ছিল? সর্বত্রই দুঃখ দারিদ্র অশিক্ষা ও রোগ বিরাজমান ছিল। মানুষ ও পশু প্রায় সমপর্যায়ে একই গর্তে বাস করতো বললেও চলে। পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ জল সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল না। পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য রক্ষার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। বর্ষার সময় এক গ্রামের লোকের সঙ্গে অন্য গ্রামের লোকের কোনও যোগাযোগ থাকতো না। এবং যখন বন্যা বা অন্য কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটতো, তখনকার অবস্থা অবর্ণনীয় ও কল্পনাতীত ছিল। সাধারণতঃ মানুষরা সহানুভূতিপ্রিয় ছিল না। এর প্রধান কারণ অশিক্ষা ও অজ্ঞতা। এবং তারা অত্যধিক কুসংস্কারাপন্ন ছিল। ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়, ডাক্তারী সাহায্য বা চিকিৎসা ব্যবস্থার কোনও বন্দোবস্ত ছিল না বললেই চলে। প্রসূতি ও নবজাত শিশুর মৃত্যুহার পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা বেশী ছিল। এই সমস্যা অতি বৃহৎ, এবং এর সমাধানেরই বা কি ব্যবস্থা করা যায়? এই কথা ভাবলে অতি বড় হৃদয়বান ব্যক্তিরও বুক কেঁপে উঠবে, এবং অতি সুখী মানুষও দুঃখে ম্রিয়মান হয়ে পড়বে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের সাহায্য নিয়ে ওই সকল মহৎ ব্যক্তি হৃদয়ে শক্তি সাহস ও আশা সঞ্চয় করে একনিষ্ঠ ভাবে সমাজ ও গ্রামসেবা ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। এখন আমরা গর্বের সঙ্গে সেই অতীত দিন গুলির পানে ফিরে চাই। যদিও সম্পূর্ণ তৃপ্ত হতে পারি না। অনিষ্টের সঙ্গে চিরদিনই সাহসী হয়ে সংগ্রাম করে যেতে হয়।

আমি যখন প্রথম স্বাস্থ্যমন্ত্রী হলাম কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টে, তখন দেশের এই স্বাস্থ্য সমস্যার কথা ভেবে অতিশয় বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। কোথা থেকে এবং কিভাবে এই সমস্যা সমাধানের কাজ সুরু করবো এটা স্থির। আমার পক্ষে তখন বিস্ময়ের বস্তু হয়েছিল। আমাদের হাতে বিশেষ কিছুই মাল মশলা ছিল না। সুতরাং অতি প্রয়োজনীয়তার দিকেই দৃষ্টি দিতে হয়েছিল। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সকল প্রদেশ স্বায়ত্তশাসিত থাকায় ওদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা ও সাহায্য করা আমাদের বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এবং সকল ক্ষেত্রে তারা যাতে একই পদ্ধতিতে চলে সেটা বুঝিয়ে দেওয়াও ছিল আমাদের কর্তব্য।

আমার সহকর্মীরা (মন্ত্রিসভার)ও আমি স্থির করলাম প্রথমে আমরা শিশু ও মাতৃমঙ্গল কাজে মনোসংযোগ করবো। তারপর গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন হোল আর পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন নারী কর্মীরা। এদের প্রাথমিক কাজ হোল গ্রাম্য ধাত্রীদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া। আজ আমরা নিঃসংকোচে ও বিনা দ্বিধায় বলতে পারি যে এর ফল শুভ হয়েছে। আমাদের দেশে আজ শিশু ও প্রসূতির মৃত্যুর হার অনেকাংশে কমেছে এবং সেই স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলি চারিদিকে বিস্তৃতি লাভ করেছে। যে

সহায়তা তাদের জন্যে প্রদান ছিল অথচ তাই থেকে তারা বঞ্চিত ছিল। স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়তো সহজ হতে পারে, কিন্তু তার পরিচালনা করা মোটেই সহজ কাজ নয়। আমরা সকলেই আশা করি এইগুলির দ্রুত উন্নতি সাধন হোক। কিন্তু সাধারণ কর্মী সংগ্রহ করা একটী মস্ত সমস্যা এবং এই সমস্যার সমাধানের জন্য অনেক সময় লাগবে।

একথা খুবই আনন্দের যে এখন প্রায় প্রত্যেক জাতীয় পরিকল্পনা ও N. E. S. ব্লকগুলি বা (Community Project) এলাকায় শিশু ও মাতৃমঙ্গল সদন প্রতিষ্ঠান কার্যকরী হয়েছে ও নারী কর্মী ও ধাত্রীগণকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। আমি আশা করছি দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনাতে প্রাদেশিক সরকারগুলি চেষ্টা করবেন যাতে তারা আরও অধিক মাত্রায় কর্মীদের শিক্ষা দিতে পারেন এবং পল্লীর স্বাস্থ্য মঙ্গল কাজে উন্নতি সাধন করতে পারেন।

দ্বিতীয় যে সমস্যাটীর প্রতি আমরা মনোযোগ দিয়েছিলাম সেটী হোল পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যরক্ষা বা স্বাস্থ্যতত্ত্ব (Sanitation)। একটী কমিটী নিয়োগ করা হয়েছিল যাদের কাজ ছিল এই বিষয় অনুসন্ধান করে Report প্রদান করা। প্রত্যেক প্রদেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রীদের এই কমিটীর সুপারিশগুলিকে কাজে পরিণত করতে অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহা কাজে পরিণত হয়ে ওঠেনি। তার কারণ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় সরকারেরই স্বাস্থ্য বিষয় আয় ব্যয় (Budget) ছিল নামের ভিতর। যে সকল গ্রামে সাধারণের পানীয় জল বা কোনও প্রকার জল নিকাশের কোনও ব্যবস্থা নেই, সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের চাহিদা মিটানো সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া অজ্ঞতা ও অশিক্ষা গ্রামের লোকেদের মধ্যেই বেশী। স্বেচ্ছা হিতৈষীরা এই গ্রাম্য অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর করতে কিছুটা সাহায্য করতে পারেন। সব থেকে প্রধান বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্যের ব্যাপারে। শিশু ও মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষা দিয়েছে কি উপায়ে রোগের আক্রমণ থেকে নিস্তার লাভ করা যায়। বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের জন্য অনেক অর্থ দেওয়া হয়েছে এবং আমি আশা করছি এই ব্যাপারে আরও অধিক মনোযোগ দেওয়া হবে। কারণ এটী হচ্ছে মানুষের জন্মগত অধিকার। পরে একটী Public Health Act তৈরী করা হয়েছিল কিন্তু তার Provision নিয়ে একটু গোলমাল ছিল বা মতভেদ ছিল। (প্রাদেশিক অথবা কেন্দ্রীয় কোন্ সরকার কর্তৃক গৃহীত হবে এই নিয়ে মতভেদ) আমার মনে হয় এতে অনেক দেরী হবে এই কাজের। আমি আন্তরিক ভাবে আশা করছি যে এই Act যত শীঘ্র সম্ভব যেন কেন্দ্রীয় সভায় থেকে পাশ করা হয়।

আমাদের দেশে চিরদিনই রোগ মুক্তির চেয়ে প্রতিরোধের দিকেই বেশী মনোযোগ রয়েছে। পরে অবশ্য এ বিষয়ে উপলব্ধি করা হয়েছিল। ম্যালেরিয়া দূরীকরণ ও সমূলে বিনষ্টের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমাদের গ্রামবাসীরা এতে অনেক উপকৃত হয়েছে। আরও একটী নিদারুণ রোগ হোল যক্ষ্মা। এর জন্য নির্ভর করছে অনেকগুলি বস্তুর উপর। যথাযথাব, জীবনীশক্তির অভাব, উপযুক্ত বাসস্থানের অভাব যেখানে বেশী সেখানে এই রোগ দ্রুত প্রসার লাভ করে। মানুষকে এই রোগের হাত থেকে রক্ষার জন্য আমরা B.C.G. টীকার ব্যবস্থা করলাম। আমার মনে হয় অন্যান্য দেশে এর ফল যেমন ভালো হয়েছে আমাদের দেশেও সেই রকম হবে। কোড় ও কুষ্ঠ এই দুটী রোগও মানচিত্রে আঁকা হয়েছে। গ্রামবাসীরা এখন জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবল্পনা ব্যাপারে বেশ সচেতন হয়ে উঠছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনার কাজে আমরা প্রথম থেকেই জোর দিয়ে এসেছি এবং বর্তমানে অনেক জায়গায় এইগুলি স্থাপিত হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলি যদি সঠিক ভাবে পরিচালিত হয় তবে শীঘ্রই গ্রামবাসীরা চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য ব্যাপারে প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হবে। পল্লীস্বাস্থ্যের কার্যকরী ব্যাপারে আমরা দ্রুত অগ্রসর হতে পারছি না তার কারণ প্রধানতঃ প্রাদেশিক সরকার উপযুক্ত চিকিৎসক পাচ্ছেন না যাঁরা গ্রামে গিয়ে কাজ করতে পারেন। এই কাজের জন্য চিকিৎসকদের বহুবার আবেদন করা হয়েছে, কিন্তু ভুলে যাওয়া হয় যে প্রাদেশিক সরকার চিকিৎসকদের উপযুক্ত সুখ সুবিধা প্রদান করেন না যেটী তাদের গ্রামে বসবাসকালীন একান্তই প্রয়োজনীয়। বাঁধা মাহিনা ও কাজের সুবিধা করে দেওয়াও অতি প্রয়োজন। এই জন্যই আগে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিস্তার প্রয়োজন। In-

door ক্লিনিক ও প্রসূতির জন্য সীট Outdoor রুগীর জন্য রোগ নির্ণয় কাজের ব্যবস্থা, মল মূত্রাদি পরীক্ষার কাজ রেডিয়াম সাহায্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে আগে কার্যকরী করা করা উচিৎ এবং উপযুক্ত ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার ও তাঁদের সহকারী নিয়োগ অতি প্রয়োজন। কেন্দ্রগুলিতে যখন এই সকল ব্যবস্থা স্থায়ীভাবে কার্যকরী হবে, তখন গ্রামবাসীরা আমাদের সহরবাসীর মতই চিকিৎসার সুযোগ লাভ করতে পারবে।

আমি সত্যই আশা করি প্রত্যেক প্রদেশে অন্ততঃ একটি করে আদর্শ গ্রাম গড়ে উঠুক। যেখানে বাস করে সুখ লাভ করতে পারবো। এগুলি আমাদের পুরাতন পল্লীর মত যাতে রোগপূর্ণ না হয়। আমার মনে হয় জাতীয় পরিকল্পনা ঠিকমত কার্যকরী হয়েছে যার ফলে চিকিৎসা সাহায্য এখন সর্বত্রই পাওয়া যাচ্ছে। যা ১০ বছর আগে পাওয়া যেতোনা। ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে। উপযুক্ত লোকের অভাব ও অর্থের অভাব এই দুইটি হয় থেকে কঠিন সমস্যা। অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূরীকরণের চেষ্টা এখনও করে যেতে হবে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর দপ্তর থেকে যেভাবে কার্য পরিচালনা করা হয় আমি সেইভাবে এই প্রবন্ধ লিখেছি। মন্ত্রী দপ্তর এই সংস্থাগুলি কেবল মাত্র ছুঁয়ে গেছেন। কিন্তু আমার মনে হয় ভিত্তি ভালো ভাবেই গাঁথা হয়েছে যার উপর আমরা সত্যিই কিছু ভালো জিনিষ গড়ে তুলতে পারবো। শুধু সহযোগিতা এর আমরা সকলেই যাতে এই কাজে ব্রতী হই এই আমার ইচ্ছা। মাত্র দশ বছর স্বাধীনতা লাভের মধ্যে আমার পক্ষে যেটা আশাতীত ও অবর্ণনীয় সৌভাগ্যের সুযোগ হয়েছে, যার ফলে আমি দেশের স্বাস্থ্য গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছি।

নূতন ভবিষ্যৎ

শ্রীহেমলতা ঠাকুর

ওগো আমার চিরদিনের নূতন ভবিষ্যৎ
কেউ জানে না কেমন তুমি সৎ কি অসৎ।

কেউ জানে না তোমার চির গতিপথের আলো
কেমন করে নিভাও তুমি কেমন করে জ্বালো।

জানে না কেউ সুদূরে কার চলছে কাণাকাণি
সুদূর হোতে আনছে নূতন ভবিষ্যতের বাণী।

মরণ ওগো মরণ আমার হরণ করি সব,
নির্ব্বাণে দিও শান্ত কর অনন্ত নীরব।

আকাশ ছোঁয়া বাতাস সেদিন সেথায় হ'ল স্থির
নূতন বাণী ধ্বনি নিল আনন্দ গভীর।

জগৎখানা নূতন হবে আশ্চর্য্য নূতন,
ডালে বসে গাইছে কোকিল হারান্ত স্বপন।

সরোজনলিনী স্মরণে

শ্রীতরলিকা সান্যাল

বিশ্বের তুমি বরণীয়া আজি স্মরণীয়া হ'লে মনে,
তোমার স্বপ্ন সফল হয়েছে জাগাইলে নারীজনে।

সাধনা তোমার আদর্শ বাণী মণির দীপিকা হাতে
কত প্রাণ পেলো পরশ তাহার তমসা-আবৃত রাতে!

কত ভারত, কত অসহায়া ছিন্ন মূলের মত,
অন্ধকারের জীবন লইয়া দারিদ্র্য কত শত।

পথেও যাদের ঠাঁই মেলেনাকো দিশেহারা হ'য়ে ঘোরে—
কর্মক্ষেত্র রচনা করেছ তাদের অনাগত কোন্ ভোরে।

তা'রা পেলো পথ; তরুণ আলোর দীপক রাগিণী গেয়ে
শিল্পী চলেছে, কর্মী চলেছে, তুমি দেখিলে না চেয়ে!

জাগালে যাদের, পথ দেখে দিলে মনের মূলে
পূজনীয়া হ'লে, মানসকুঞ্জে উঠিবে নিত্য দুলে!

এ যুগের নারীদের সমস্যা

ডাঃ শ্রীসরলা ঘোষ

(সংযোজনিনী সমিতির ৩৪শ বার্ষিক উৎসবে প্রদত্ত "সংযোজনিনী বক্তৃতা")

আজকে আমার বক্তব্য বর্তমান যুগে নারীদের সমস্যা —আমরা এখন এমন এক যুগে বাস করছি, যখন চারদিক থেকে নানারকমের শৃঙ্খল এবং পুরুষ ও নারীকে বিচ্ছিন্ন ও বিযুক্ত করে দিয়েছে। দেশ আমাদের স্বাধীন হোয়েছে, কিন্তু ২০০ বছরের পরাধীনতার জড়তা কাটিয়ে উঠতে এই ১০ বছর সময় কিছুই নয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলি প্রচণ্ড বেগে এগিয়ে চলেছে, আমাদের বাঁচতে হোলে তার সঙ্গে পা ফেলে চলতে হবে কিন্তু না আছে আমাদের শক্তি বল না আছে অর্থবল. পৃথিবীর অগ্রগামী দেশগুলির তুলনায় আমরা ১০০ বছর পিছনে পড়ে আছি। দেশকে এগিয়ে নিতে হোলে মেয়েদের বাদ দিলে চলবে না। মেয়েদেরও দেশ গঠনে পুরুষের সঙ্গে সমান দায়িত্ব। আর শাসনের শতনের পরও সোভিয়েট রাশিয়াতে এই প্রশ্নই দেখা দিয়েছিল, কিন্তু আজ অনেক বিষয়ে তারা পৃথিবীর অন্যান্য দেশকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছে—এ শুধু পুরুষের একার চেষ্টাতে নয়, সমস্ত রাশিয়ান নারীসমাজের শক্তিও এর পেছনে ছিল।

আমাদের দেশে এমন এক সময় ছিল যখন মেয়েদের কোন স্বাধীনতা ছিল না। তাদের কোন শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল না, তখন শুধু তাদের প্রয়োজন ছিল বংশের জন্য সন্তান প্রসব করা ও পুরুষদের জন্য ঘর সংসার দেখা শোনা করা। এখন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গিয়েছে ও নানাস্থানে মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা হোয়েছে ও তাদেরও স্বাধীন দেশের উপযুক্ত নাগরিক করে গোড়ে তোলবার কিছু ব্যবস্থা হচ্ছে। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের আইনও বদল হোয়েছে—এখন মেয়েরাও সমান অধিকার লাভ করেছে। আগেকার বিধানে মেয়েদের কোন অধিকার ছিল না এখন তার আমূল পরিবর্তন করা হোয়েছে। এখন পুরুষের সঙ্গে মেয়েরাও দেশের জন্য ও নিজের জন্য ইচ্ছানুযায়ী কাজে নিযুক্ত করবার সুযোগ ও সহানুভূতি রাজ্য সরকার থেকে লাভ করেছে। কিন্তু তাহোলে আমাদের সমস্যা সমাধান হয়নি এবং আরও নতুন নতুন সমস্যা সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। আজকে আমি দরিদ্র মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের কথাই কিছু বলবো—সমাজ যাদের নিয়ে গঠিত।

মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় সমস্যা—প্রাণধারণের জন্য অন্ন ও বাসস্থান। নিজের জন্য ও সন্তান সন্ততির জন্য আগেকার দিনে এই দায়ীত্ব সম্পূর্ণ পুরুষের উপর ছিল ; তখনকার দিনে সামাজিক ব্যবস্থা এমন দৃঢ় ছিল যে বিধান লঙ্ঘন করবার মত কারও সাহস ছিল না ও সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী একান্নবর্তি পরিবারের মধ্যে পিতৃহীন কন্যার বিবাহ বা বিধবা ভ্রাতৃবধূর ঘরের মধ্যে আর একজন মেয়ের সঙ্গে জীবন কেটে যেত। সব ক্ষেত্রেই যে এ ব্যবস্থা সর্বাঙ্গীন সুন্দর ছিল তা আমি বলতে চাই না। কিন্তু এ ব্যবস্থা থাকাতে মেয়েরা অনাথা হোয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হত না। কিন্তু কালের গতির সঙ্গে ২ একান্নবর্তি পরিবারও লোপ পেয়েছে। এর উপর জনসংখ্যা সীমা ছাড়িয়ে দ্রুতবেগে বেড়েই চলেছে—ফলে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য অসম্ভব বেড়ে গিয়েছে। সঙ্গে ২ জীবনযাত্রার মানও বেড়ে গিয়েছে ও সাধারণ গৃহস্থরা দুঃস্থ আত্মীয়কে আশ্রয় দিতে পারেন না ও দেশে অনেক দুঃস্থ ও আশ্রয়হীন আত্মের সন্ধানে পথে ২ ঘুরে বেড়িয়ে আরও সমস্যা জটিল করছে।

এখন সংসারের খরচ এত ব্যয়সাধ্য হোয়েছে যে শুধু মাত্র পুরুষের রোজগারে সংসার চলে না, মেয়েদেরও রোজগার করতে হয়। অর্থের অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই বাপ মা মেয়েদের সম্যক শিক্ষা দিতে সমর্থ হয় না ও বিবাহ দিতে পারেন না। অথচ রোজগার না করলে এদের ভবিষ্যৎ জীবন অন্ধকার। এই বয়সের মেয়ে প্রতি ঘরে ২ দেখতে পাই ও ইহাদের সমস্যা সবচেয়ে বেশী।

যারা উচ্চশিক্ষার সুযোগ ও সুবিধা পেয়েছেন, যেমন প্রফেসর, ডাক্তার ইহাদের সংখ্যা খুবই কম।

এখন পর্য্যন্ত আমাদের দেশে কেবলমাত্র কয়েকটি চাকরির পথ মেয়েদের জন্য খোলা আছে যেমন স্কুলে শিক্ষকতা, হাসপাতালে নার্স, টেলিফোন অফিস ও অন্যান্য কোন ২ অফিসে ক্লার্ক, টাইপিষ্ট। এ ছাড়া কারখানাতেও শিল্পকাজে মহিলা কর্ম্মী নেবার ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশে এখনও শিক্ষকদের মধ্যে মাত্র শতকরা ১৬।১৭ জন শিক্ষয়িত্রী, বাকি সব পুরুষ শিক্ষক। অথচ শিশু ও ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবার জন্য মেয়েরাই উপযুক্ত। তারা মায়ের জাত, শিশুদের মন তারাই ভাল বোঝেন, কিন্তু এখানেও পুরুষের প্রাধান্য বেশী। তার কারণ উপযুক্ত শিক্ষিকার অভাব ও আমাদের দেশে এখনও মেয়েদের কাজে তত আস্থা নাই। অন্যান্য দেশে পুরুষের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক বেশী। এই অল্পদিন আগে রাশিয়ান মহিলারা এসেছিলেন আমাদের নারী সংস্থান দেখতে: তাদের মুখে শুনলাম, সে দেশে শিক্ষকদের মধ্যে শতকরা ৮০ জন হচ্ছেন মহিলা শিক্ষক। ইংলাণ্ডেও অনুরূপ সংখ্যক নারী শিক্ষা ক্ষেত্রে নিযুক্ত আছেন।

নার্সিং মেয়েদের একটি বিশেষ জীবিকা উপার্জ্জনের পথ। দরিদ্র মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা সহজেই এই উপজীবিকা নিতে পারেন। উচ্চশিক্ষার খরচ ও নাই, ও শিক্ষার সঙ্গে ২ রোজগারও করেন এবং তাদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থাও থাকে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত এই পেশা আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা সহজে নিতে চান না। সমাজও নার্সিং লাইনকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন না অথচ আতুরকে সেবা করা সবচেয়ে বড় ধর্ম। অনেক বাপ মা বলেন, মেয়েকে নার্সিং এ দিলে আর তার সমাজে বিয়ে হবে না। দেশে উপযুক্ত নার্সের এখনও অনেক অভাব, মেয়েরা যদি এই লাইনে যায় ও দরিদ্র মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের অনেক সমস্যা সমাধান হয় ও দেশেরও কাজ হয়। আজকাল কিছু মেয়ে গবর্ণমেণ্ট ও প্রাইভেট অফিসে ক্লার্ক, টাইপিষ্ট ও টেনো এই রকম কাজে নিযুক্ত আছেন—এখানেও অনেক সমস্যা। অফিসের কর্ত্তৃপক্ষরা মহিলা কর্মী কাজের উপযুক্ত হোলেও সহজে নিতে চান না, কেন না পুরুষের সঙ্গে কাজ করাতে নানা রকম অসুবিধা হবার সম্ভাবনা হয় ও অনেক স্থলেই মেয়েদের আলাদা কোন ব্যবস্থাই নাই। এ ছাড়া নানা রকমের শিল্প কারখানায় বহু প্রকারের কাজ আছে যা ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের দক্ষতা বেশী। কিন্তু মেয়ে কর্ম্মীদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করার দরকার হয় বলে কর্ত্তৃপক্ষরা প্রায় মহিলা কর্ম্মী নিতে রাজী হন না বিবাহিতা মহিলা কর্ম্মীর maternity bar দেবার ব্যবস্থা আছে, এতে খরচ বেশী হয়, এজন্য আজকাল অনেক ফ্যাক্টরীতে মেয়ে নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এতে মেয়েদের মধ্যে বেকার সমস্যা বেড়ে গিয়েছে। রাশিয়াতে সেদিন শুনলাম মেয়ে ও পুরুষের মাহিনাতে কোনও তারতম্য নেই কিন্তু আমাদের দেশে একি কাজে মেয়েদের মাহিনা পুরুষদের চাইতে কম। মেয়েরা কর্ম্মজীবনে এখনও পুরুষদের মত সমান সুযোগ ও সুবিধা পাচ্ছেন না। পাশ্চাত্যদেশে হোটেল ও দোকানে বিক্রীর কাজ বলতে গেলে মেয়েদের একচেটিয়া, এ সব কাজে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন হয় না। এখন পর্য্যন্ত এসব কাজে আমাদের দেশের মেয়েরা যেতে সাহস পান না ও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় আমাদের দেশে এ সব জায়গার আবহাওয়াও ঠিক মহিলাদের উপযুক্ত নয়। এই ভাবে আমরা দেখতে পাই খুব কমই কাজ মেয়েদের জন্য আমাদের দেশে আছে। এই ত গেল চাকরির বাজার। এ ছাড়াও চাকুরে জীবি মেয়েদের আরও অনেক সমস্যা আছে। মেয়েদের উপরই ঘরকন্নার ভার, যাবতীয় সমস্ত সংসারের কাজ করে তাদের চাকরি করতে যেতে হয়, এতে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে ও সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারে না। বিশেষ করে ছোট ২ শিশুদের বাড়ীতে ফেলে এসে কাজে মন নিবিষ্ট করতে পারে না। অন্যান্য দেশে চাকুরে জীবি মায়েদের সন্তানদের তত্ত্বাবধানের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা থাকে। আমাদের দেশে এখন পর্য্যন্ত সে সব কোনই ব্যবস্থা নাই—এক জুটমিলে creche ছাড়া। এ ছাড়া এদেশে খাওয়া দাওয়ার এমন ব্যবস্থা যে মেয়েদের অনেক সময় নিজেদের রান্নাঘরে নিযুক্ত থাকতে হয় খাবার ব্যবস্থা করতে। যে সব মেয়েরা চাকরি ও সংসার দুই করেন তাদের পক্ষে দুইদিক সামলানো এক ভীষণ সমস্যা হোয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন সময় এসেছে নূতন ছাচে সংসারের ব্যবস্থা করা যাতে অল্প

সময় ও সামান্য পরিশ্রমে কাজ সারা যায়। আর পুরুষদেরও অন্যান্য দেশের মত সমানভাবে সংসারের কাজে সাহায্য করা।

অনেক দেশে বিবাহিতা মেয়েদের জন্য আংশীক সময়ের কাজের (পার্ট টাইম) ব্যবস্থা আছে এই সুবিধা থাকাতে মেয়েরা বিবাহ, সংসার করা ও চাকরি করবারও সুযোগ পান। আমাদের দেশেও এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা বাঞ্ছনীয়। তাহোলে অনেক বিবাহিতা মেয়েও কাজ করতে পারেন। ইংল্যাণ্ডে প্রমশিল্পে ২১০০০,০০০ প্রমশিল্পির মধ্যে প্রতি তিনজনে একজন মহিলা ও তাদের মধ্যে অর্দ্ধেক বিবাহিতা। আমরা দেখতে পাচ্ছি যদিও আমরা কাগজে কলমে সমান অধিকার পেয়েছি, প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশ নারী প্রগতির দিকে অনেক পিছাইয়া আছে।

সমাজের দিক থেকেও চাকুরে জীবি মেয়েদের অনেক সমস্যা। সমাজতন্ত্রি লোকেরা এই সব চাকুরে মেয়েদের একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করেছেন ও তাঁদের ধারণা এই সব মেয়েরা সংসার করার অনুপযুক্তা সকল মেয়েই চান যে সে স্বামী পুত্র সন্তানাদি নিয়ে একটী সুখের সংসার গড়ে তোলেন। কিন্তু বেশীরভাগ সময় এই মেয়েদের সারা জীবন অবিবাহিত থাকতে বাধ্য হয়—ইহা দেশের দিক থেকে ও নারীসমাজের দিক থেকে অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতি।

এ ছাড়া জনসংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে যাওয়াতে উপযুক্ত বাসস্থানেরও অভাব দেখা দিয়েছে। এই সব চাকুরেজীবি মেয়েরা নিরাপদ বাসস্থানের অভাবে অনেকস্থলে বিপদগ্রস্থ হন। এখন সহরে এই ধরণের মেয়েদের জন্য ২।১টি হোষ্টেল খোলা হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাহাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। নিরাপদ বাসস্থানের অভাবে অনেক মেয়েকে চাকরি ছাড়িতে বাধ্য হয়।

আমাদের দেশে বেকার সমস্যা সাংঘাতিক রূপ ধারণ করেছে। অন্যান্য অনেক দেশে বেকার সমস্যা নাই বল্লেই হয় সেখানে সকলেই কাজে নিযুক্ত হয়। এদেশে বেকার সমস্যা এত বেশী যে লক্ষ লক্ষ ছেলেরাই কাজের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুতরাং মেয়েদের বেকার সমস্যা যে গুরু আকার ধারণ করবে, এতে সন্দেহ নাই। বাংলা দেশেই ২০ লক্ষ লোক বেকার। গণনা করে দেখা গিয়েছে যে ১৯৬১ সালে অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে আমাদের জনসংখ্যা ৪২ কোটিতে দাঁড়াবে ও ৫০ লক্ষ লোকের কর্ম-সংস্থানের প্রশ্ন উঠবে। যত রকমই পরিকল্পনা হউক না কেন যদি জন্ম হার এই হেটে বেড়ে যায় তাহ'লে দেশ থেকে খাদ্যাভাব, স্থানাভাব ও বেকার সমস্যা সহজে সমাধান হবে না। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন যে নারীই সৃষ্টি করে ও তাহারাই দেশ ও পৃথিবী গড়ে তোলে। তাই আজ মেয়েদেরই প্রস্তুত হোতে হবে দেশের ও নিজেদের সমস্যা সমাধান করবার জন্য ও সমস্ত বাধা-বিপত্তি ঠেলে পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে অন্যান্য দেশের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে।

গ্যালিফ ষ্ট্রীটের সেই বাড়ীটি

শ্রীমীরা দেবী

গাড়ীটা চলে গেল। একটা হর্ণ নয় ইঞ্জিনের শব্দ নয়, নিঃশব্দে বেরিটোস্থিখানা চলে গেল।

আজ থেকে ঠিক ছ'মাস আগে ঠিক ঐখানটাতেই এসে দাঁড়িয়েছিল একখানা ট্যাক্সি। বেনারসীতে মোড়া সিঁদি মৌবে সাজান একটি নিরীহ মেয়েকে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল ট্যাক্সিখানা। শঙ্খধ্বনি আর উলুধ্বনির মধ্য দিয়ে বরণ করে ঘরে তুলেছিল এ বাড়ীর বড় বৌ—এ বাড়ীর সবচেয়ে ছোট বৌকে ; আজ থেকে মাত্র ছ'মাস আগে।

গাড়ীটা চলে গেল। গ্যালিফ ষ্ট্রীটের বাড়িতে কোন ব্যতিক্রম ঘটল কি ? মস্ত বড় বাড়িটার দু'একটা কোণে হয়ত একটু চাপাকান্না জমে উঠেছিল কিছুক্ষণের জন্য, তারপর সেই চিরাচরিত প্রথানুযায়ী ভাতের থালা সাজিয়ে বড়বৌ হাঁকডাক করেছেন সবাইকে খেয়ে নেবার জন্য। বড়কর্ত্তা ধমক দিয়েছেন চাকরবাকরকে রোজদিনের মতই। ছেলেরা তেমনই হল্লা করেছে, মেজবৌ তাদের জামাকাপড় গুছিয়ে তুলতে তেমনই ব্যস্ত থেকেছে। শুধু ব্যতিক্রম ঘটল কি ছোটকর্ত্তার ? ছোটকর্ত্তা খাওয়াদাওয়া করেনি, নিঃশব্দে পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেছে। কে জানে কোথায় নেমে গেল। সবই ঠিক ছিল, সবই ঠিক থাকবে, কিন্তু মনগুলোও কি সব ঠিক আছে ? বড়বৌ ভাত বাড়তে গিয়ে অর্দ্ধেক দিয়েছে, অর্দ্ধেক ভুলেছে। ভাতের গরাস মুখে তুলেই শরীরটা বড় খারাপ বোধ করেছে, তাই না খেয়েই উঠে গেছে। মেজবৌ ভুল করে কাচা কাপড়গুলো আবার কেচে ফেলেছে। বড় কর্ত্তা দাড়ি কামাতে গিয়ে রক্তপাত করেছেন অনেকবার। ক'টা দিন এমন হবে বৈ কি। তারপর সব চুপচাপ, যথা পূর্ব্বম্ তথা পরম্ হয়ে যাবে।

বড়বৌয়ের বয়স হয়েছে, তাই হয়ত সামলে নিতে একটু দেরি হচ্ছে। কতটুকুই বা ছিল তখন এ ছোটকর্ত্তা ? সবে ইস্কুলের ছাত্র। ইস্কুল থেকে বাড়ী এসে বৌদিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলত—বৌদি, তুমি আমায় খাইয়ে দাও, আমি হাত ধুতে পাচ্ছি না, বড্ড খিদে পেয়েছে। শাশুড়ী হেসে বলতেন, 'বৌমা, ও তোমার দেওর নয় মা, ও তোমারি ছেলে।' সেই দেওর, আজকের ছোটকর্ত্তা না খেয়ে বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে, কারও দিকে চেয়ে দেখবার অবসর হল না তার।

কত ঘটনার সাক্ষী গ্যালিফ ষ্ট্রীটের ঐ বাড়িটা। যে বাড়িতে আজ বিশ বছর বড়বৌ এসেছে। এর আগের খবর বড়বৌ জানে না। এ বাড়ীর খবর বড় চাপা। কিছু দিন আগে এই বাড়ীতেই যখন একটা অসবর্ণ বিয়ে ঘটে গেল তখন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন কর্ত্তারা, আর পুরণো বাড়ীর গিন্নীরা এসে যা নয় তাই শুনিয়ে গিয়েছিলেন বড়বৌকে। তবু বড়বৌ সেই বৌকে বুকে টেনে নিয়েছিল। যত অন্যায়ই করে থাকুক তারা, সমাজকে লুকিয়ে ত কিছু করেনি ; সমাজের অনুশাসন, সামাজিক বিধিবিধি সবকিছুকে মেনে নিয়েছে তারা, কাউকে ফাঁকী দেয়নি, কারো ঘরও ভাঙে নি।

কিন্তু আজকের ব্যাপারটাকে মেনে নিতে পারেনি বড়বৌ। অগ্নি নারায়ণ সাক্ষী করে বিয়ে করে এনে তারই চোখের সামনে ছোটকর্ত্তার ঐ নির্লজ্জ বাড়িচার অসহ্য। বাড়ীর অনেকেই জানত এ ব্যাপারটা। কাণাঘুষা করেছে এ নিয়ে, কিন্তু বড়বৌয়ের মত স্পষ্ট গলায় প্রতিবাদ জানায়নি কেউ।

বড়বৌ একদিন শুনল, ছোটকর্ত্তা বিয়ে করবে। শুধু বিয়ে নয়, ভালবেসে বিয়ে করবে। আর সেই মেয়ে ওকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে যে এ বাড়ীর সব কিছু জানে।

জন্ম থেকে মা-হারান যে মেয়ে, সে মেয়ে ভুলে গেল কাঁদতে। ভুলে গেল খেলাধূলো করতে। এক মায়ের স্নেহচ্ছায়ার সুখটুকু যার জানা হল না, ভালবাসার একাধিপত্যের অধিকার যার পাওয়া হল না, শিশুমন তার ছড়িয়ে

পড়ল সবার মাঝে। বাবা, দাদারা, দিদিরা তাকে যথেষ্ট স্নেহ দিয়ে, যত্ন দিয়ে, কিন্তু তবু কোথায় যেন ফাঁক থেকে গেল। কি নেই, কি যেন পাওয়া হল না। ছোট থেকেই তাই সতী বড় গম্ভীর, শান্ত, সেবাপরায়ণা। বাবার সে একমাত্র সম্বল! বাবা যে জানতেন না কখন কি খেতে হবে, কখন কি পরতে হবে। সতী না হলে তাঁর এক মুহূর্তও চলতো না। তাই কত ভাল সম্বন্ধ এনেছে তার দাদারা, কিন্তু সে রাজী হয়নি। বাবাকে ছেড়ে কোথাও যাওয়া তার চলবে না। কিন্তু সেই বাবাও যখন তাকে ছেড়ে চলে গেলেন, সেদিন ভেঙ্গে পড়ল সতী। হৃদয়ের আকুলতা তাকে শোকের বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল। সেই বন্যার ঘরস্রোতে ভাসতে ভাসতে সে শুনতে পেল আহ্বান —সুদূরের আহ্বান। আর কেন, কোন বন্ধনই ত আর নেই। ঐ ডাকে সাড়া দিল সতী। একবস্ত্রে সামান্য ক'টি টাকা মূলধন করে পাড়ি দিল কেদার-বদ্রীর পথে।

কেদার-বদ্রীর পথে বৈচিত্র্যের সম্ভার উজাড় করে সাজান রয়েছে। বিমুগ্ধ হয় সতী। কিন্তু শান্তি কৈ? এখানে এসে মনের চাহিদা যায় কমে। কি পাওয়া হল না সে হিসাবের প্রয়োজন থাকে না মানুষের। শুধু এগিয়ে চলাই এ পথের ধর্ম। এখানকার হিসাবে শুধু জমা, খরচ নেই কিছু। তবু মাঝে মাঝে বিমনা হয় সতী। সারা দিনের ক্লান্তিশেষে যখন কোন চটীতে গিয়ে আশ্রয় নেয় তখন এক একদিন হয়ত একটা অভাববোধ জেগে ওঠে মনের মধ্যে। মন চায় একটু আত্মীয়তার স্পর্শ। এমনি সময় চিঠি পেল সতী প্রভঞ্জনের। প্রভঞ্জন সেন চিঠি লিখেছে সতী লক্ষ্মীকে। সে চিঠি বহু জায়গায় ছাপ গায়ে মেখে প্রায় বার দিন পরে তার হাতে এসে পৌঁছেছে। সেদিন পথের কষ্টটা কম বোধ হয়েছিল সতীর। সেদিন পাথরের গায়ে গায়ে রঙ্গিন ফুলের সমারোহ তার চোখ আর মন দুটোকেই পরিতৃপ্ত করেছিল অনেক বেশী। কিন্তু কি ছিল সে চিঠির মধ্যে? যাতে সতীর মত নির্লিপ্ত মেয়েও একটা খুশীর আবেগে চমকে উঠেছিল? তারপর মাঝে মাঝে আসত সেই সাদা খামের চিঠি; নীল নয়, হলদে নয়, স্রেফ সাদা খামের। কেদার-বদ্রী থেকে ফিরে সতী সর্ব্বপ্রথম যে ঠিকানায় গিয়ে উঠল, সেটা প্রভঞ্জন সেনের বাড়ী। প্রভঞ্জনের বৌদিরা তাকে আগে থেকেই চিনতেন। খুশী হলেন তার আসাতে।

এর পর থেকে দেখা যেত মাঝে মাঝে প্রভঞ্জনের কুটিনের বেল্টটা ঢিলে হয়ে গেছে আর সাদা শাড়ী পরা চিরদিনের সতী মাঝে মাঝে রঙ্গিন শাড়িতে নিজেকে সাজিয়ে তুলছে। তারপর যা হয়ে থাকে—দাদাদের আপত্তি, দিদিদের বারণ সব কিছুকেই উপেক্ষা করে সে তুলে ধরল প্রভঞ্জনের নৌকার ভাঙ্গা হাল। জোর গলায় সে বলেছিল, এই ভাঙ্গা হাল নতুন করে গড়ে তুলব। প্রভঞ্জনের জীবনতরী এবার থেকে বয়ে যাবে নির্ভুল নিশ্চিত বৈঠার ঘায়ে। কোন অমঙ্গল ঘটবে না আর প্রভঞ্জনের জীবনে।

বিয়ের পর্ব্বটা সমাধান হল। ধূলোপায়ে নয় করতে গেল বিয়ের কোনে পুরণ বাড়ীতে। সেখান থেকে ভিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে বাড়ী ফিরল সতী। কিন্তু ভেঙ্গে পড়বার মেয়ে সে নয়, তাই অতীতটাকে চাপা দিয়ে বর্ত্তমানটাকেই ভরসা করে অগ্রসর হতে চেয়েছিল সে ভবিষ্যতের সম্ভাবনার দিকে।

শেষ পর্য্যন্ত বুঝি হেরে গেল সতী। প্রভঞ্জন সেনের জীবনে সতী সেন মুহূর্ত্তের একটা ঘটনা মাত্র। সেখানে তার স্বীকৃতি নেই, আছে শুধু অলস অবস্থিতি।

সারাদিনটা একা কাটে সতীর। বাড়ীর সব ক'টা কড়িকাঠ, সব ক'টা সিঁড়ির ধাপ তার গোণা হয়ে গেছে। গ্যালিক ষ্ট্রীটের এই বাড়ীটার নড়বড়ে আসবাবপত্রগুলোর সঙ্গে আর চুণবালি-খসা দেয়ালগুলোর মধ্যে সে যেন মিশে গেছে। সেও যেন ঐ রকমের একটা জড়পদার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়। কেঁদে ফেলে বড় জায়ের কাছে বলে— 'দিদি! এ কি হল? এমন হবে তা তো জানতাম না!'

বড়বৌ বলেন, 'চোখের জল ফেলিস না ছোটবৌ। এ বাড়ীর এই নিয়ম। এমনিভাবেই দিন কাটাতে হবে। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে উদ্গত নিশ্বাসটাকে চাপবার চেষ্টা করেন বড়বৌ। ছোটবৌ ভাবে, এ মানুষটা কি পাষাণ? কোন আঁচড় কাটে না এর বুকে? বড়বৌ চলে যান অন্য ঘরে কাজের ছুতো করে। নিজে অনেক কেঁদে আজ ছোট বৌয়ের কান্নার মানেটুকু তিনি বুঝেছেন। কিন্তু খুঁজে পান নি এখনও চোখের জলটুকু মুছিয়ে দেবার উপায়।

খালি বলেন—'হেরে যাস্‌নে সতী। পালিয়ে গিয়ে মনটাকে ভীতু প্রতিপন্ন করিস নে। তারপর একদিন চরমে উঠল। ইদানিং প্রত্যহ দুজনের চলাফেরার মধ্যে আগেকার সেই অসংযম খুবই ফুটে উঠত। ঘরে বাইরে তার নিন্দে সতীর প্রতি সহানুভূতির বাক্যবাণ সতীর পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। তাই জানতে চেয়েছিল প্রত্যহ দুজনের কাছ থেকে পরিবর্ত্তন হবে কিনা। এর উত্তরে স্পষ্টই বলল প্রত্যহ—মেনে নিতে না পারলে সরে যেতে হবে। হতভম্ব সতী বুঝে উঠতে পারে না কাঁদবে কি রাগ করবে। কোথায় গেল তার নীড় বাঁধার স্বপ্ন। ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল তার আদর্শ। নিতান্ত পরাজিতের মতই হার স্বীকার করে নিঃশব্দে চোখের জল মুছে সে চলে গেল ঐ ট্যাক্সিটায় করে। একটা হর্ণ না একটু ইঞ্জিনের শব্দ না। নিঃশব্দে ট্যাক্সিটা চলে গেল। বড়বৌ নির্জ্জন ঘরখানাতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

(২)

দীর্ঘ আঠার বছরের সব স্মৃতি ভীড় করে দাঁড়ায় বড় বৌয়ের মনের দোর গোড়ায়। আগল পড়েছে সে মনে। তাই আঠার বছরের স্মৃতিগুলো জমা হয়েছে বাইরের মনটাতে। ভেতরের মনটায় ধড়োপড়ো হয়ে রয়েছে আরো আগেকার স্মৃতিগুলো। এতদিন ঘরে যারা ঘুমিয়েই আছে ক্লান্ত হয়ে! আজকের এই ভীড়ের গোলমালে তাদেরও বুঝি ঘুম ভাঙ্গলো। তাদের জাগরণে যে কলরবের সৃষ্টি হল বড়বৌয়ের মনের মধ্যে তারই প্রবল ধাক্কায় চিরদিনের স্বল্পভাষী বড়বৌ আজ মুখরা হলেন। রক্তজবার মত চোখদুটো, চুলগুলো অসংবৃত, দেহের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন একে আর একজনের সঙ্গে বিদ্রোহের ঘোষণা করছে। এ মূর্ত্তি কারও পরিচিত নয়। এ বড়বৌকে কেউ চেনে না। প্রতিকার চাই। সেই দৃঢ়স্বরে চমকে তাকাল বড়কর্ত্তা।

'কি হয়েছে তোমার বড়বৌ?'—উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন।

'কিছু হয়নি, প্রতিকার চাই।'

বড়কর্ত্তা পিছিয়ে যান দু'পা। এই সেই বড়বৌ, যে নিজের জন্য অতি ক্ষুদ্র আবেদনও জানায় নি; শত অবিবেচনাতেও যার মুখে প্রতিবাদের একটা শব্দ কোনদিন শোনা যায় নি; সেই বড়বৌ কিসের দাবি নিয়ে এই ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে এল তার সামনে? সেদিন বড় মোক্ষম জায়গায় আঘাত দিলেন বড়বৌ। বড়কর্ত্তার প্রতিবাদে তিনি জানিয়েছেন তোমাদের নাস্তিকতার বিরুদ্ধেই এই আমার প্রতিবাদ।

'আমি নাস্তিক?' ফেটে পড়েন বড়কর্ত্তা।

শ্লেষের হাসি খেলে যায় তাঁর মুখে। ঐ বড়বৌ; যে কোনদিন পূজার আসনে বসে পরদের কাপড় পরে কোশাকুশিতে ঠোকরও তোলেনি, উপোসকাবাসের কঠোর ক্লেশ ভোগ করে দিনান্তে ফলের থালা আর মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে গর্ব্বের হাসি দিয়ে সারাদিনের ক্লান্তিটুকুকে ভরিয়ে তোলে নি, নাক টিপে আর আঙুলের ফর গুণতে গুণতে রাত্রির ব্যবস্থা করেনি যে বড়বৌ, সে আজ কোন্ সাহসে বড় কর্ত্তাকে নাস্তিক বলে? হাজার নাম জপ করে বড়কর্ত্তা সিদ্ধবাক হয়েছেন, লক্ষ নাম জপ করে বড়কর্ত্তা প্রচুর টাকার মালিক হয়েছেন; শত্রুকে কেমন করে বাগ মেরে প্রতিশোধ নিতে হয়, বহু আরাধনায় বড়কর্ত্তা সে ক্ষমতা অর্জ্জন করেছেন; তন্ত্রসাধনায় সমস্ত কাবুচুপি যার হাতের মুঠার মধ্যে, যাঁর মুখের কথায় বিপক্ষদলের জোয়ান ছেলে ধড়ফড়িয়ে মরে যায়, ফলন্ত গাছে পোকা লাগে, ঘরের আসবাবপত্রে আগুন লেগে ছাই হয়ে যায়, সেই নিষ্ঠাবান মানুষকে নাস্তিক বলা! সমস্ত শরীরটা রাগে কাঁপতে থাকে বড়কর্ত্তার, কিন্তু তবু মুখে কিছু প্রকাশ করেন না। কারণ মুখে কিছু বলবার দরকার হয় না এঁদের; এঁদের একটা নিশ্বাসেই ঠাণ্ডা হয়ে যায় সমস্ত বেয়াড়াপনা।

বড়বৌ জোর গলায় বলেন, 'ব্যাখ্যা কর সেই মন্ত্র—যা উচ্চারণ করে প্রতিজ্ঞা করেছ বিয়ের সময়। অগ্নি, নারায়ণ সাক্ষী করে যে মন্ত্র উচ্চারণ করে স্ত্রীকে এনেছ ঘরে কতখানি মর্য্যাদা দিয়েছ সে মন্ত্রের? এতে কি দেবতাকে অস্বীকার করা হয় না?—অপমান করা হয় না সে মন্ত্রের? নিজেকে সামাজিক বলে দাবী কর, কিন্তু সমাজ, আচার, নিষ্ঠা, বিধি মেনে চল কি তোমরা? নৈতিক অনুশাসন কি সমাজের পুরুষের জন্য নয়? স্ত্রীর কি সাংসারিক জীবনে কোন অধিকার নেই? সে কি শুধু তোমাদের বিলাসের ইন্ধন? শুধু তোমাদের সেবার দাসী? জবাব দাও, কেন চলে যেতে হল ছোটবৌকে? শোন, যদি সম্মানের সঙ্গে

ফিরিয়ে না আনা হয় ছোটবৌকে তাহলে তোমাদের সংসারের এই বিশ বছরের নিয়মে ব্যতিক্রম ঘটবে।'

একটু কি সঙ্কুচিত হলেন বড়কর্ত্তা ?

বড়বৌ যেমনভাবে এসেছিলেন তেমনিভাবেই চলে গেলেন নিজের সেই ছোট কুঠরিতে। যাবার সময় আর একবার বলে গেলেন—'জেনে রেখ, আমার আছে নিছক কর্ত্তব্য তার বেশী আর কিছু না।'

কিন্তু সত্যিই কি তাই ? তাই যদি হবে তবে কেন এত কথা তিনি বললেন ? আজও কেন নানান কথা এসে জমা হয় মনের মধ্যে ? এই প্রশ্ন ফুঁসিয়ে কেঁদে ওঠেন বড়বৌ। ছোট মেয়ের মত চল্লিশ বছরের প্রৌঢ়া বড়বৌ আছড়ে পড়ে কাঁদেন। এতদিন চোখের জল শুধু চোখের জলই পড়ত কিন্তু চোখের জল আর বুকের গুমরানি এক হয়ে একটা শব্দের সৃষ্টি করল, যে শব্দের তরঙ্গে তরঙ্গে বয়ে চলেছে কত নারী, কত মা, কত বন্ধ্যা, কত প্রিয়ার বুক ভাঙা আকুল কান্না—যে কান্নার প্রতিকার নেই, প্রতিবার নেই ; আছে শুধু উগ্র বুকফোড়া হাহাকার।

(৩)

তিনদিন তিনরাত্রি গত হয়েছে। তিন দিনেই বড় হয়ে গেছে বড়বৌয়ের শরীরের ও মনের ওপর দিয়ে। রান্নাঘরে সব কিছু অগোছালো। চাকরবাকর যা করছে তাই। ছোটকর্ত্তা আশ্রয় নিয়েছে হোটেলে। একটা অপরিসীম ক্লান্তি নিয়ে শুয়ে থেকে উঠেছেন বড়বৌ। শরীর যেন আর বইছে না। বিশ বছর আগেকার স্মৃতিগুলো তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সে ডাকে মনপ্রাণ উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে। মন চাইছে ছুটে যেতে সে দিন-গুলোর কাছে।

হঠাৎ সিঁড়িতে পায়ের শব্দ চিরপরিচিত সেই ডাক, 'দিদি!' ছোটবৌ ফিরে এল! ছোটকর্ত্তাই গিয়ে নিয়ে এসেছে তাকে। ছোটবৌ এল খুশীতে উপচে পড়ে তার সারা দেহ মন। ভরা হয়েছে তার সন্তান। সারা বাড়িটা খুশীতে টলমল করে ওঠে। বড়বৌ দেখে দেখেন ছোটবৌ চোখদুটোর দিকে আজ সে অন্ধ। কিন্তু আজ থেকে ছ'মাস আগে যে মন নিয়ে আর যে খুশীর উচ্ছলতায় জল জল করত এই মেয়ের আজও কি সেই উচ্ছলতা এ চোখে ? তিনি হলে কিন্তু পারতেন না এর পরে এ বাড়ীতে ফিরে আসতে এ বাড়ীতে দুরন্ত অভিমান তার। সে অভিমান মার খেয়েছে কিন্তু মার ফিরিয়ে দিতে পারেনি। শুধু সরে গেছেন তিনি অনেক দূরে। আত্মা যেখানে অপমানিত, মনুষ্যত্ব যেখানে সুপ্ত, সেখানে শুধু অধিকারটুকুকে মূলধন করে স্বাধিকার ঘোষণা করতে পারেন না বড়বৌ। তাই এদের কাছে কোন দাবী নেই। আছে শুধু এদের জন্য করুণা। কিন্তু সত্যিই কি তাই ? তবে কেন মনের ভেতরটাও অমন করে মোচড় দিল তার যখন প্রভঞ্জন না খেয়ে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। খেতে বসে বড়কর্ত্তা ঠিক মত খাবার না পেয়ে প্রায় না খেয়েই অফিসে চলে গেলেন। সংসারটা যখন ছুটো নৌকোর মত বানচাল হতে বসেছে তখন আবার কেন হাল ধরতে উঠে এলেন কেনই বা অত কথা বললেন ছোটবৌয়ের হয়ে।

আজ যখন অসহ্য বুকের যন্ত্রণায় ছটফট করছেন বড়বৌ ছেলেমেয়েগুলো একটু তদারকের অভাবে প্রায় না খেয়েই কলেজে গেল তখন এদের উপেক্ষা কেন তাঁকে কাতর করল ? ছোটবৌ ফিরে এসে আবার ডুবিয়ে দিয়েছে নিজেকে স্বামীর সেবায়। তিনি তো মনেপ্রাণেই চেয়ে-ছিলেন তারা দুটিতে এক হোক। একে অন্যের অবলম্বন হয়ে উঠুক। তবে কেন একটি পরিচিত হাতের স্পর্শের জন্য আকুল হয়ে ওঠে তাঁর অন্তরতম কল্পনাটা। একটু 'দিদি' ডাকের জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে কানদুটো। এক রোগশয্যায় আকুল হয়ে ওঠেন ছোট ছোট শাসন আর অভিমানের আঘাত পাবার জন্য। নাঃ এ হবার নয়। এ বাড়ীর এই নিয়ম। এখানে মনের খবর চাপা থাকে। বাইরের প্রকাশটাই একমাত্র।

পার্কসিক স্ট্রীটের চুপচাপ খসা এই বাড়ীটা বড় চাপা। এখানকার কান্না এক ঘর থেকে আর এক ঘরে পৌঁছায় না। এখানে পাওয়া নেই, শুধু দেওয়া আছে। এ বাড়ীর বড়-বড়ো আসবাবপত্রগুলোর সঙ্গে একাকার হয়ে যেতে হবে এ বাড়ীর এই নিয়ম। পার্কসিক স্ট্রীটের এই বাড়ীটা বড় চাপা। বিশ বছর আগেকার কোন কথা জানেন না বড় বৌ। বিশ বছর পরে কি হবে তাও জানেন বড়বৌ। এখানে মোরগোড়ায় মাঝে মাঝে বেবীটাক্সি এসে দাঁড়াবে, একটা হর্ণ না এঞ্জিনের একটু শব্দও না। নিঃশব্দে আসবে যাবে কতদিন হয়ত এর পরেও আরো কতদিন কে জানে!!

সমাজ সমস্যায় নারীর দায়িত্ব

শ্রীকণাদেবী ভারতী

পরিবর্তনশীল জগতে মানবসমাজও পরিবর্তনসাপেক্ষ; তাই শিক্ষায়, কর্মে ও জ্ঞানে ভারত আজ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সংগে যেমন পা মিলিয়ে চলতে সুরু করেছে, তেমনি ভারতের নারীও চলেছেন এদেশের পুরুষের আশেপাশে। চলার পথে বাধা থাকে; কিন্তু সে বাধাকে জয় করে চলাই জীবনধর্ম।—"না জাগিলে সব ভারত-ললনা"—কবির এই স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে, এ কথা বলতেই হবে। আজ দেখতে পাওয়া যায়—এ দেশের নারী শুধু উচ্চশিক্ষা লাভ করেন না, স্বদেশে ও বিদেশে দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করেও ভারতীয় নারী সমাজকে গৌরবান্বিত করে তুলেছেন। বিশ্বের দরবারেও আজ এ দেশের নারীর জন্য সম্মানের আসন পাতা হয়েছে। কিন্তু এও ধ্রুবসত্য যে, ভারতের শত শত নারীর মধ্যে ওই নারীদের সংখ্যা নগণ্য। বিরাট জমাট অন্ধকার ঢেকে রেখেছে ঐ আলোকচ্ছটা। আর সেই অন্ধ-সমাধির ওপর মলিন শতাব্দীর মত জেগে থাকে এক কঠোর প্রশ্ন—'এই নারীসমাজের ভবিষ্যৎ কি?' এ পর্যন্ত স্ত্রী-স্বাধীনতা, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি নারীপ্রগতি আন্দোলনে আমাদের দেশের সমাজসংস্কারকগণই প্রধান অংশ নিয়েছেন বা নিয়ে থাকেন। সংঘবদ্ধভাবে নারীদের দ্বারা তেমন কোন প্রবল আন্দোলন আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে হয়নি। বৃটেন, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে ব্যাপকভাবে যে সব নারীপ্রগতি-আন্দোলন হয়েছে, তা নারীরাই করেছেন এবং তাঁরা তাঁদের ন্যায্য দাবী আদায় করে ছেড়েছেন। এ দেশে ব্যাপক আন্দোলন চালানো তো দূরের কথা, নারীর অগ্রগতির পথে নারীরাই প্রবল বাধা সৃষ্টি করে থাকেন। সংকীর্ণচেতা পুরুষসমাজের দমনকার্যে তাঁরা নিয়োগ করেন বড় রকমেরই শক্তি। এ কি কম দুঃখের কথা? নারীর অগ্রগতির পথে নারীর এই প্রতিকূল আচরণ, নারীজাতির পক্ষে চরম অভিশাপই বলতে হবে। এই ব্যবহার নারী অশিক্ষাবশেই করেন না। দীর্ঘদিনের কুসংস্কার ও পুরুষের মনোরঞ্জনই এর জন্য বেশী দায়ী। কম কলেজে শিক্ষিতা কত নারীদেরও তো ঐ আত্মঘাতী দলে দেখা যায়। সাধারণ নারীদের জন্য সামান্য সাংসারিক সুখ বা সামাজিক সুবিধা ছেড়ে দিতে ঐ নারীদের সে কি কার্পণ্য! কিছুদিন আগে অপরিহার্য কারণে আনীত বিবাহ-বিচ্ছেদ ও সম্পত্তিতে নারীর অধিকার সম্বন্ধীয় বিলের বিপক্ষে প্রতিবাদকারী নারীদের জোরদার ঘোরণার সেই কথা এখনকার নারীসমাজ আজও ভুলে যান নি। তাঁদের কথা উপেক্ষা করাও চলে না; কারণ তাঁদের প্রভাবের প্রখরতা যথেষ্ট।

কিন্তু প্রশ্ন হল, নারী কেন চাইবেন না জীবনের মান-উন্নয়ন? কালচক্রের গতি পরিবর্তনের সংগে সবেরই যদি পরিবর্তন হয়, তবে কেন নারীজাতি পড়ে থাকবেন সেই অতীতের অকল্যাণকর পরিবেশের মধ্যে? এ হতেই পারে না। দু'হাজার বৎসরেরও আগেকার মনুস্মৃতিকে এখনও প্রতিষ্ঠা দিতে যাওয়া যে চরম মূর্খতার কাজ, তা এসব প্রাচীনপন্থীদের মাথায় ঢোকে না। ও সব মাথা কি সুস্থ? সন্দেহ হয়। নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ন্যায্য দাবী আদায় করতে হবে নারীকেই।

এ বিষয়ে বিশেষ দায়িত্ব আছে সমাজের শিক্ষিতা তরুণীদের। নানাভাবে নিপীড়িতা হচ্ছেন বাঙলার নারীসমাজ। সেই অবিচারজাত অত্যাচার দূর করা সচেতন তরুণীদেরই কাজ। আর বহুবিবাহ বন্ধ হয়েছে সত্য, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে বাল্যবিবাহ প্রথা আজও সজীব, সক্রিয়। এখনও পণপ্রথা মধ্যবিত্ত সমাজের গলায় ফাঁসীর দড়ি হয়ে নির্বাচিত কাজ করে যায়। আবার শত শত বালবিধবা, সমাজ-পরিত্যক্তা ও উপযুক্ত পণের অভাবে অবিবাহিতা অশিক্ষিতা নারী, যাঁরা দুর্ভাগ্যের অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে খালি চোখের জলই ফেলে যাচ্ছেন, তাঁদের মুক্তির পথই বা দেখাবেন কে? একটি কল্যাণপ্রসূ সুস্থ নারীসমাজ গড়তে হলে আজ সর্বাগ্রে প্রয়োজন ব্যাপক নারী আন্দো-

নেবে। সমবেত নারীচেতনার শ্রাব্য দাবীর কাছে সকলকেই মাথা নোয়াতে হবে; এ এক ঐতিহাসিক সত্য। বিপক্ষে কিছু মেয়ে থাকবেনই, চিরকালই থাকেন। কর্ম-ক্ষেত্রে নামতে হবে তাঁদের, যাঁদের মনে প্রকৃত সংস্কৃতির আলো পড়েছে। তাঁরাই হবেন পথ-পরিচায়িকা। এমনি কল্যাণচিন্তা থেকেই অতীতে এসেছিল কত অনুষ্ঠাপনা, গড়ে উঠেছিল—'সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি, ধাত্রী ভবন, পুরীর বিধবাশ্রম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান, যেখানে থেকে দুঃস্থা, অসহায়া ও বিশেষ শ্রেণীর কত মেয়ে অন্নসংস্থান পেয়েছেন এবং পাচ্ছেন। জাতীয় সরকারও এদিকে দৃষ্টি দিয়েছেন; তবে সেই দৃষ্টিতে উপযুক্ত সহানুভূতির অভাব। স্ত্রীশিক্ষার জন্য সরকার কত টাকা এ পর্যন্ত ব্যয় করেছেন, তা সেদিন সংবাদপত্রেই প্রকাশ করেছিলেন কোন দরদী মন। গাছের গোড়া কেটে সরকারও আগায় জল ঢালায় ব্যস্ত। অন্ধকার কুঁড়ের রাজ্যে ক'টা বিজলীবাতি জ্বালার সার্থকতাকতটুকু? অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতা ঘুরে থাক, নারীকে সমাজে যোগ্য মর্যাদা দেওয়ার কাজটাও এখনো ঠিক আরম্ভ হয়নি। ঘুঁটের গাঁট খুলতে কিছুতেই ভাগ্যবান ভাগ্যবতীদের প্রাণ চাইছে না। দুর্ভাগা দেশ! সংসারে থাকুন, আর আশ্রমেই থাকুন, যাঁরা সুস্থ মনের মালিক, তাঁদের সংঘবদ্ধ হতেই হবে। দেশ, ধর্ম ও নারীসমাজের স্বার্থে। মায়ের জাতিকে সত্যিকারের মুক্তি নিতে হবে। বাংলার ললনাকে জেগে উঠে দাঁড়াতে হবে। অসম্ভব নয় এ কাজ। দূরে থেকে কঠিন মনে হলেও, কাজে শুরু করলে কাজ সহজ হয়ে যাবে। উদারচেতা, দেশের কল্যাণকামী পুরুষরাও নিশ্চয়ই যোগ দেবেন তাঁদের সংগে, তাঁদের এগোনোর সাহস ও শক্তি দেবেন।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত—

কাঞ্চন জঙ্ঘা

শ্রীদুর্গাবতী ঘোষ

১

মেঘ গুণ্ঠন ছুঁড়তে সবারে কে তুমি গো বল রূপসী?
শুভ্র বরণে তনু উজলিয়া,
রয়েছ দাঁড়ায়ে নয়ন ধাঁধিয়া
হরিৎ-নীলাভ-বনরাজি রহে তোমার চরণ পরশি॥
কনক কিরণ অঙ্গে মাখিয়া
কভু বা দাঁড়াও রূপ প্রকাশিয়া
প্রত্যূষে, সাঁঝে, রক্তিম রাগে অরুণ বরণ অঙ্গ।
কভু দেখা যায় হীরকের জ্যোতি,
অপরূপ হেরি তোমার মূরতি
ধন্য হল যে ভারত মোদের লভিয়া তোমায় সাথ॥

২

তোমার পাষাণ কঠিন বক্ষে করুণার শতধারা,
অবিরাম গতি-পথে চলি চলি
নামিয়া আসিছে আকুলি ব্যাকুলি;
শেষে সবে মিলি সিন্ধু মাঝারে হয় যে আপনহারা॥
কখনও হেরি তুষারের স্তূপ,
না পারি বুঝিতে তোমার স্বরূপ।
কভু বা মাখিয়া তাপুর কিরণ দেহ উজলিয়া থাক।
পুনরায় হেরি ভ্রূকুটি করিয়া
কুহেলী বসনে সব আবরিয়া
মেঘে পর্বতে একাকার করি নিজেরে লুকায়ে রাখ॥
বার বার হেরি নাহি মিটে আশ,
কত রূপ মাঝে তোমার প্রকাশ,
তুষার হইতে নামে নবরূপে সিন্ধু যমুনা গঙ্গা।
সমীরণ তব তেজি তব শির,
অনন্তকাল দাঁড়াইয়া স্থির।
প্রকৃতি-পুরুষ লীলা নিকেতন তুমি কাঞ্চন জঙ্ঘা॥

কৃষ্ণকলি

(উপন্যাস)

শ্রীক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

বাংলাদেশের শরৎকাল। মাঠে-ঘাটে, আকাশে-প্রান্তরে তার অফুরন্ত শ্যামশ্রী উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। পল্লীর পথে পথে, ধানক্ষেতের স্বর্ণমঞ্জরীর শীর্ষে যখন প্রাতঃসূর্যের কণক-কিরণ প্রতিফলিত হয় তখন ঠিক যেন মনে হয়—সোনালী শাড়ীর আঁচল দুলিয়ে, হাতে ধানের ঝাঁপি নিয়ে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছেন হিরণ্ময়ী স্মিতবদনা স্বয়ং জননী শারদলক্ষ্মী। নদীর তীরে তাঁর আকুল চরণস্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে হিল্লোলিত দীঘির জলে থরে থরে ফুটে উঠছে শালুক-শাপলা আর শ্বেত ও রক্ত শতদল। গৃহস্থের কুটিরের অঙ্গনের ছায়ে ফুটে উঠেছে স্তবকে স্তবকে শেফালি আর অতসী, অপরাজিতা আর দোপাটী। আল-পথের মাঠের ধারে ধারে ফুটে উঠেছে অতি ক্ষুদ্রকায় দুগ্ধশুভ্র কাকিনী আর হলুদরঙের মধুকুল। লক্ষ্মী মায়ের সোনার হাসি ছড়িয়ে পড়ছে বহু-বেরঙের প্রজাপতিদের উড়ন্ত পাখনায়। উদার অনন্ত আকাশের নীলাভ পটের 'পরে তুলোর মত সুন্দর সাদা মেঘগুলি ভেসে চলেছে ঠিক যেন শারদলক্ষ্মীর ভাবনাশূন্য নির্মল দুলখানি গগনে বিতান করে বেড়াচ্ছে। নিত্য অভাবগ্রস্ত পল্লীর অঙ্গে ঝলমল করছে শরতের অফুরন্ত সম্পদশ্রী।

শুভ্র কৃষ্ণাকে নিয়ে সুদীর্ঘকাল পরে ফিরে এসেছেন তাঁর পরিত্যক্ত স্বামীর ভিটাতে। তাঁর মনে যেন আবার ফিরে এসেছে নববধূর উজ্জ্বল আনন্দ। বহু সুখদুঃখের স্মৃতিবিজড়িত নিজের জীর্ণ বাসভবনগুলির আশে পাশে ঘুরে বেড়িয়ে তিনি মনে প্রচুর আনন্দলাভ করতেন। তাঁর দেবর অমলবাবু নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদি বহুপূর্বেই পশ্চিম বাংলার কোনও ছোট শহরে স্থানান্তরিত করেছিলেন। সম্পত্তির বিলিব্যবস্থার জন্য এতদিন তিনি এখানে ছিলেন। এখন সে কাজ সম্পন্ন হওয়ায়, তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে চিরতরের বহুপুরুষের বাস্তুভিটা ত্যাগ করে চলে যাবেন, দূর দেশের এক অখ্যাত পল্লীতে, বেফিউজির কালো ছাপ কপালে মেরে, পরদেশীরূপে। বহুদিন পর ভ্রাতৃবধূকে দেখে খুশী হলেও কৃষ্ণাকে দেখে প্রীত হন নি। যদিও তাঁরা দেশে পূর্বের মতই স্বাধীনভাবে ও সসম্মানে বসবাস করছেন, তথাপি দৈবাতের কথা বলা যায় না একটা উড়ো খবরে বাহিরে থেকে হৈ হল্লা লাগিয়ে দিলেই হোল; তখন কে কার প্রাণ বাঁচায়? আর কে কার মান বাঁচায়? এই সব কারণেই তিনি পরিবারের মেয়েদের আগে থেকেই স্থানান্তরিত করেছেন। তিনি আশা করেছিলেন, ভ্রাতৃবধূ এলে তাকে তার বাড়ীঘর দেখিয়ে দিয়ে ভস্মের মত বাস্তু ত্যাগ করবেন। কিন্তু তিনি এলেন, সঙ্গে নিয়ে আবার সেই বড় মেয়ে কৃষ্ণাকে। অমলবাবু মনে মনে অপ্রসন্ন হলেও মুখে কিছু প্রকাশ করেন নি। গোপনে গোপনে তিনি বাস্তু ত্যাগের দিন আরও সন্নিকট করার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। কৃষ্ণার কিন্তু এ সব গ্রাম্য রীতিনীতির প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। সে সদাসর্বদা নিজের খেয়াল খুশীতে নিজেই বিভোর হয়ে থাকে। ইচ্ছামত সে মাঠে, বনে, নদীর ঘাটে ঘুরে বেড়ায়; আবার ইচ্ছামত যখন কাজ করে, পড়াশুনা করে, সবই করে।

বিকেলবেলা দাওয়ায় বসে শুভ্র কৃষ্ণার চুল বেঁধে দিচ্ছিলেন। অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মি উঠানে বাঁকাভাবে এসে পড়েছে। উঠানের মাঝখানের বাতাবিলেবুর গাছটি সাদা থোকা থোকা ফুলে আর ফলে ভরে গিয়েছে; বাতাবী ফুলের মিষ্টি গন্ধে স্থানটি মৌ মৌ করছে। লেবুগাছের অদূরে মেহেদিগাছের বেড়ার ধারে একটি বাঁধানো কুয়ো আছে। বেড়ার গায়ে বেগুনী রঙের মেহেদি ফুল, আর কমলা রঙের গুটি গুটি ফল ধরে কুয়োর পাড়টীকে ঠিক কুঞ্জবনের মত করে তুলেছে। পাড়ার মেয়ে ও বউরা দলে দলে কলসী কাঁখে নিয়ে জল নিতে আসছে। কুয়ো থেকে বড়িবাঁধা বালতি ডুবিয়ে জল তুলে আবার তারা ঘটে ঘরে ফিরে যাচ্ছে। প্রত্যেকেই হয় যাওয়ার সময়, না হয়

আসার সময় দাওয়ার ধারে একটু দাঁড়িয়ে তরুর সঙ্গে দুটো কথা বলে যাচ্ছে। কিছুই না—অতি সাধারণ, অতি ঘরোয়া দুই একটি কথা; তবু মনে হয় এ কথা যেন চির নূতন, এ কথা যেন চির মধুক্ষরা। সেই জোলাবাড়ীর মোটা খাটো করে কাপড় পরা, তেল-চুকচুকে চুলে টেনে খোঁপা বাঁধা নিতান্ত গ্রাম্য মেয়ে বন্ধুগুলির সঙ্গে তরুকে এত অন্তরঙ্গ হয়ে কথা বলতে দেখে কৃষ্ণার বিস্ময় বোধ হয়। তরুর গায়ের ঘামের গন্ধ চুলের তেলের গন্ধ কৃষ্ণার নাকে এসে কটুভাবে আঘাত করে, সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে তরু অনর্গল বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করেন; হঠাৎ যেন তিনি ফিরে পেয়েছেন তাঁর বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া বন্ধুজীবনের দিনগুলি ও সেদিনের সঙ্গীগুলি।

ধীরে ধীরে বেলা পড়ে আসে। সন্ধ্যার সাঁচ ছায়া নেমে আসে, কুয়োর পাড়ের বাতাবিগাছের মাথায়; আর চৌকিখানার, তমুর বংশের কিংবদন্তী কোটা খড়ের চালার উপরে। জলাধিনী মেয়েরা যে যার ঘরে ফিরে যায়। গ্রাম গ্রামান্তর হতে ভেসে আসে শঙ্খধ্বনি; জঙ্গলের মধ্যে এক টানা সুরে ডেকে ওঠে ঝিঁঝিপোকার দল। তরু ধীরে ধীরে উঠে বসেন, কৃষ্ণা, তুই ঘরে যা; আমি কাপড় ছেড়ে জপটা সেরে নিই। টীনের করগেটের ঘর, আর কাঁচা মাটির মেঝে; ঘরের চতুর্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক জানালা, তাই দিয়ে সব সময় ঝির ঝির করে বাতাস আসে ঘরের মধ্যে। ঘরের মধ্যে দুটি চৌকি পাতা; একটিতে শোয় কৃষ্ণা, অন্যটিতে তরু। কৃষ্ণার বেশ ভাল লাগে এই রকম ঘরে থাকতে, বেশ নতুন নতুন লাগে। মস্ত বড় ঘরখানির মধ্যে সে অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ায়; তারপর কেরোসিনের আলোর সামনে গিয়ে পড়তে বসে। ধীরে ধীরে তার চঞ্চল মন ডুবে যায় প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের গভীর রস সমুদ্রে। তারপর এক সময় তরুর আহ্বানে সে রান্নাঘরে গিয়ে পিঁড়ি পেতে খেতে বসে। খাওয়ার আগেই সে চক চক করে খানিকটা জল খেয়ে ফেলে। কেননা তাদের কুয়োর জল এমন মিষ্টি ও ঠাণ্ডা যে তার খেয়ে মনে হয় যেন মিছরির সরবৎ খাচ্ছে।

চৌকিছাটা চালের গরম ভাত; কাঁঠালবীচি না হয় আলুসেদ্ধ, পাবদামাছের ঝোল, আর দুধের মধ্যে আমসত্ত্ব দিয়ে মেখে ভাত খেতে কৃষ্ণার বেশ ভাল লাগে। নিত্য নতুন রকমের মাছের তরকারী, নানারকম ভাজা আর চচ্চড়ী পরটা না খাওয়ার জন্য তার কোনও অসুবিধা ছিল না। আহারাদির পর পুবদিকের খোলা জানালার পাশে চেয়ে সে শয্যার উপর চুপ করে বসে থাকে। কখন চাঁদ উঠিবে? শারদরাত্রির যুঁইফুলের মত সাদা জ্যোৎস্নারেখা আধভাঙা চাঁদ কখন উঠবে, ঘুরে সুপারীবাগানের পিছনে রাঙচড়ামাখা প্রকাণ্ড জিওলগাছটার মাথায়। তারী ভাল লাগে তার এই নিস্তব্ধ পল্লীর চন্দ্রোদয় দেখতে। এক সময় নিজের শয্যা থেকে তরু ডাকেন, 'কৃষ্ণা?'

সচকিত হয়ে কৃষ্ণা জবাব দেয়, কি বলছ পিসিমা?

তরু বলেন, আর কতক্ষণ বসে থাকবি, এইবার শুয়ে পড়—

আর দেরী নেই পিসীমা, কৃষ্ণা বললে, ওই কালো মেঘটা সুপুরীগাছের মাথা থেকে সরে গেলেই চাঁদ দেখা যাবে।

মেঘ যদি নাই সরে, তরু বললেন, তাই বলে তুই সারা রাত্রি বসে থাকবি?

কেন সরবে না পিসীমা? এই দেখ মেঘও সরেছে, চাঁদও উঠেছে,—বলে কৃষ্ণা আনন্দে হেসে উঠল। তরু দেখলেন সারা জ্যোৎস্নায় তাঁদের ঘর ভরে গেছে।

এক সময় কৃষ্ণা নিজের শয্যা ছেড়ে এসে তরুর পাশে শুয়ে বললে, পিসিমা, কি ভাবছ?

তরু বললেন, ভাবছি সুধার কথা। অনেকদিন হোল তার কোন খবর পাই না, কি জানি কেমন আছে?

কৃষ্ণা বললে সত্যিই ত, ছিদি কি শঙ্কর, কারুরই ত চিঠি আসে না।

কাল তুই একখানা টেলিগ্রাম লিখে দে বাপু, আমি ঠাকুরপোকে বলে ডাকঘরে পাঠিয়ে দেব, তরু উদ্বিগ্নকণ্ঠে বললেন।

এটা কি তোমার কলকাতা শহর, পিসীমা, যে তার করার পিঠে পিঠেই তুমি জবাব পাবে? কৃষ্ণা বললে, এখানে তারের জবাব আসতেও যা, চিঠির জবাব আসতেও

সেই একই সময় লাগবে। তবে তুমি বলছ যখন কাল ভোরেই টেলিগ্রাম লিখে দোব।

তাই দিস বাপু; গুরু বললেন, আমার মনটা বড় ব্যাকুল হয়েছে ওদের জন্য। কৃষ্ণা তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বললে, ওরা ভালো আছে পিসীমা, তুমি মিছিমিছি ভেব না বুঝলে?'

গুরু নীরবে তার মাথায় হাত রাখলেন, কোনও কথা বললেন না। অদূরে ছেলেপাড়ায় হরিসংকীর্তন হচ্ছিল, তিনি বোধ হয় তাই শুনছিলেন।

কৃষ্ণা চুপ করে শুয়ে থেকে নিজের কথা অনেকক্ষণ ধ'রে ভাবল, তারপর ধীরে ধীরে ডাকল 'পিসীমা'—সঙ্গে সঙ্গে গুরু জবাব দিলেন 'উঁ'।

আমি ভেবেছিলুম তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ,—কৃষ্ণা বললে।

না রে ঘুম কি আর এত সহজে চোখে আসে? গুরু বললে।

"একটা কথা ভাবছিলুম পিসীমা" কৃষ্ণা বললে।

"কি কথা বল, শুনি?"

আমি ভাবছিলুম পিসীমা, একটু থেমে কৃষ্ণা বলতে সুরু করল, আমরা যদি এখান থেকে আর কিছু না দিয়ে তোমার এই ভিটেয় থাকি তাহলে কি হয়?

গুরু মনে মনে কৌতুক অনুভব করে বললেন 'এখানে তুই কি করবি ঠিক করেছিস? নতুন করে ঘরসংসার পাতবি, না বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়িয়ে দিন কাটাবি?'

না তা করব কেন; কৃষ্ণা বললে, মনসাদীঘিতে যে মেয়েদের পাঠশালা আছে, তাতে যদি আমি পড়াতে চাই, ওরা কি দেবে না? এখনও এখানে অনেক অনেক হিন্দু রয়েছে।

গুরু বললেন, হিন্দু রয়েছে এবং থাকবেও একথা ঠিক; আর ঠাকুরপো যদি বলেন তোকে মুসলমান কর্তারা চাকরী খুশী হয়েই দেবে; কিন্তু কথা হচ্ছে চাকরী করবার জন্য তোর এখানে থাকার কি প্রয়োজন? তুই চেষ্টা করলে কলকাতায় ত অনেক ভাল চাকরী জোগাড় করে নিতে পারবি।

'না পিসীমা, ভাল মন্দর কথা নয়' কৃষ্ণা বলে।

নয়ই বা কেন? গুরু বললেন, সব দিক বিবেচনা করে ত একটা কাজ করতে হয়।

তা ঠিক, কৃষ্ণা বললে, আমার কিন্তু কলকাতার চাইতে এখানে থাকতেই বেশী ভাল লাগছে। সত্যি করে বল ত পিসীমা, তোমারও কি লাগছে না?

তা যেন লাগল, গুরু বিস্মিত হয়ে বললেন—তাতে তোর কি লাভ হল?

বাঃ লাভ নয়ত কি; কৃষ্ণা বললে, তাই তো বলছি আমাতে তোমাতে মনের শান্তিতে এখানে বাস করি। তুমি ঘরের কাজ করবে, আমি বাইরের কাজ করব; আমি টাকা এনে দেব, তুমি গুছিয়ে তা খরচ করবে। কেমন ভাল হবে না?

মেয়েটা বলে কি! গুরুর বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না। তিনি বললেন, হ্যাঁ রে তুই কি শেষকালে আমার সঙ্গে সমান করে নিজেকে বিচার করলি? তুই আর আমি সমান? তোর ভবিষ্যৎ আর আমার ভবিষ্যৎ এক? একটু থেমে আবার বললেন, সেই একমাসের মেয়েকে বুকে করে এত বড়টি করে তুললাম, এত লেখাপড়া শেখালাম, শেষে সে কিনা একটা পাগল হল?'

রাগ করলে পিসীমা? গুরুর কথায় কৃষ্ণা মনে মনে যেন একটু ভয় পেয়ে গেল।

গুরু বললেন, 'না কৃষ্ণা এ রাগের কথা নয়। আমি তোমার আর কোনও কথা শুনব না; কলকাতায় বিয়ের সম্বন্ধ করে মাঘ মাসের মধ্যে বিয়ে দিয়ে দেব।

তোমার দুটী পায়ে পড়ি পিসীমা, কৃষ্ণা অনুতপ্ত হয়ে বললে, আমার বিয়ে তুমি দিও না।

না তোমার কোনও কথা আমি আর শুনব না; গুরু রাগতস্বরে বললেন, ছিঃ ছিঃ আমি কি ভুলই না করেছি! ওই পাগলের কথায় ভুলে রঞ্জনের সঙ্গে অমন সম্বন্ধটা হাত ছাড়া করে ফেললুম? ও রকম পাত্র আমি আর কি খুঁজে পাব?

কৃষ্ণা অভিমানে গুম হয়ে নাক মেরে নিজের শয্যায় চলে গেল। তারপর সেখানথেকে অস্ফুট স্বরে বললে, আমিও সকাল সন্ধ্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব, তুমি যেন পাত্র খুঁজে আর না পাও।

হুঁ!—ভগবান তোমার মত পাগলের প্রার্থনা যদি শুনতেন—গুরু বললেন, তাহলে এতদিনে তাঁর সৃষ্টি ওলট পালট হয়ে যেত। নে—এখন শুয়ে ঘুমো।

কৃষ্ণার চোখ দুটো তখন গভীর আক্রোশে জ্বলছিল। সেখানে ঘুম আসবে কোত্থেকে? তথাপি সে চোখে হাত চাপা দিয়ে শুয়ে রইল। একান্ত নিরুপায় হয়ে মনে মনে সে যেন কাকে অন্বেষণ করতে লাগল; কিন্তু মনের পটে যে মূর্তি উদ্ভাসিত হয়েউঠতেই সে সভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করল। মনে মনে ব্যাকুল হয়ে বললে, আমি তোমায় ডাকিনি শঙ্কর; না না আমি তোমায় ডাকিনি; তুমি যাও, তুমি যাও'—কিন্তু কে কার কথা শোনে! তার চোখের জল, অনাহার, উপেক্ষা, সমস্ত ব্যর্থ করে মনের পটে সত্য হয়ে ভেসে রইল শঙ্করের একান্ত প্রিয় পরিচিত মুখখানি।

নিতান্ত আড়ম্বরহীনভাবে অমলবাবু তাঁর ভিটের সেবা পূজা সমাধা করলেন। কৃষ্ণা বিস্মিত হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখল এখানে দুর্গাপূজোয় নতুন জামাকাপড় পরে নানা বয়সের মানুষ ফুলমনে দেবীদর্শন করতে আসে না। যারা এল, তাদের নতুন বসন ত নেইই, উপরন্তু তাদের মুখে এই শুভ দিনেও গভীর হতাশা কালো হয়ে ফুটে রইল। দেবীদর্শন করে নীরবে হাত পেতে দাঁড়িয়ে রইল একটু মায়ের প্রসাদী নির্মাল্য নেবার জন্য। অন্ত দরিদ্র দেশবাসীর কাছে আজ এই নির্মাল্যটুকুই তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পরম সহায় ও সম্বল। তাদের ভবিষ্যৎ নেই, অতীতও নেই, শুধু বর্তমান আছে, তাও আবার ঘোর অন্ধকারে ভরা। যারা দেশ ছেড়ে চলে গেছে, তারাই তাদের মনে জ্বেলে দিয়ে গেছে এই নিরুৎসাহের বহ্নিশিখা। ভগ্নোৎসাহ মুসলিম হিন্দু দুঃস্থ পরিবারদের পানে চেয়ে কৃষ্ণার বক্ষ ভেদ করে একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। সে শূন্যমনে ভাবে, হায়! কালে কালে আমাদের দেশের এ কি অবস্থা হল? মানুষ আজ মনুষ্যত্ব ভুলে জাতিতত্ত্বটাই বড় করে দেখছে। জাতিতে জাতিতে না মিলে কুকুর বিড়ালের মত নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে। যে মাটির জন্য এত মারামারি কাটাকাটি, সেই পবিত্র দেশের মাটি নিজের রক্তে লাল করে তুলছে। এর জন্য অন্নদাত্রী, জীবদাত্রী মাতা বসুন্ধরা যে অহরহ কি নিদারুণ কষ্টভোগ করছেন সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। তার পরিবর্তে এরা বসুমতী মাকে রক্ত করবার জন্য কাতারে কাতারে আমদানী করছে সৈন্য আর অস্ত্র, গোলা আর বারুদ। অবোধ অজ্ঞ, অসহায় সম্বলহীন দরিদ্র দেশবাসীর পায়ের নীচে থেকে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে আত্মস্খলিত রক্তের স্রোতে বাঁধা তাদের দেশের মাটি।

গুরু শূন্যমনে একাকিনী বসে ছিলেন। অমলবাবু ধীরে ধীরে তাঁর পাশে এসে বসে বললেন, 'বৌদি এবার ত যেতে হয়, গোছগাছ কর।'

গুরু একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে বললেন—"ঠাকুরপো, আমায় তুমি এখানে রেখে যাও।'

অমলবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি যাবে না? কিন্তু কৃষ্ণা? অত বড় মেয়ে নিয়ে তুমি একা থাকবে কি করে এখানে?

গুরু একটু চিন্তা করে বললেন, না ঠাকুরপো, কৃষ্ণাকে আমি এখানে রাখব না। তুমি যাবার সময় ওকে যদি কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে যাও তবে ও সেখানে গিয়ে নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নিতে পারবে।

অমলবাবু বললেন—সেটা কি ভাল হবে বৌদি? ওকে নিজহাতে এত বড়টি করে শেষে এমনভাবে অকূলে ভাসিয়ে দেওয়া কি তোমার উচিত হবে?"

উচিত যে নয় সে কথা গুরু ভালভাবেই জানেন, কিন্তু তাঁর অবাধ্য মন যে মানে না কোনও কথা। সুধীর মৃত্যু সংবাদ তাঁর বুকে এমন শেল হয়ে বাজবে, এ কথা তিনি জানতেন কি? সুধীর কথা তিনি যে কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। কলকাতায় গেলে আবার সেই শঙ্করের সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু তিনি তার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাবেন কি করে? আহা! যাছার প্রাণে না জানি কি গভীর দুঃখই বেজেছে! গুরুর মাতৃহৃদয় সন্তানবিয়োগ বেদনায় গভীরভাবে হাহাকার করে ওঠে: অমলবাবু তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—'বুঝি বৌদি, তোমার মনের দুঃখ আমি খুবই বুঝতে পারছি। যার সন্তান আছে সেই বুঝবে; কিন্তু তোমার দুটী পায়ে পড়ি বৌদি, কৃষ্ণার মুখের দিকে তুমি একবার তাকিয়ে দেখ। সেই দুঃসংবাদ নিয়ে চিঠিখানা আসার পর থেকে মেয়েটা যেন কি রকম হয়ে গেছে; সারাদিন যে মেয়ে অত বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়াত এখন সে আর ঘর থেকে মোটেই বেরোয় না। সেদিন খেতে ডাকতে গিয়ে দেখি শুয়ে শুয়ে কাঁদছে। আমায় দেখে 'কাকাবাবু আমার দিদি কোথায় গেল' বলে আরও

কেঁদে উঠল। বলতে বলতে অমলবাবুর চোখদুটি সজল হয়ে উঠল, তিনি অন্যদিকে মুখ ফেরালেন।

গুরু বললেন, বুঝি ঠাকুরপো, আমিও সবই বুঝি। আমি ইচ্ছে করেই তার মুখের দিকে তাকাই না, ওঁর চোখের জল আমি কিছুতে সহ্য করতে পারি না তাই।

অমলবাবু তাঁর দিকে চোখ তুলে বললেন, ভগবান যে আমাদের দুঃখ দূর করবার জন্যই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন বৌদি। তুমি ভেবে দেখ একবার আমার অবস্থা। জন্মাবধি এই বাড়ীঘর, বাগান, পুকুর, জমিজমা নিয়ে জীবন কাটিয়ে শেষে কিনা এই বুড়ো বয়সে নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে অন্যের এক টুকরো জমিতে ঘরভাড়া করে থাকতে হবে! ছেলের চাকরির সেই গোণা কটি টাকায় গ্রাসাচ্ছাদন করতে হবে, অথচ স্বেচ্ছায় আমি দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি—এটাই বুকে শেল হয়ে বিঁধছে।

অমলবাবুর কাতরোক্তি গুরুর হৃদয় স্পর্শ করল। তিনি বললেন, ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়। ঠাকুরপো তুমি বিচলিত হয়ো না। যাঁর সংসার চালানোর ভার, তিনিই তোমার সংসার চালিয়ে নেবেন, আমরা মিছে ভেবে মরি মিছে কেঁদে মরি।

অমলবাবু বললেন—'ঠিক বলেছ বৌদি। আমরা হরি একান্তভাবে তাঁর প্রতি নির্ভরশীল হই তবে দুঃখের সময় মনে অনেক সান্ত্বনা পেতে পারি। কিন্তু তা তো করি না। আমাদের পাপ মন শুধু বিষয়-আশয়ের বেড়াজালের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। তাই আমাদের এত দুঃখ।

কিছুক্ষণ নীরবে অতিবাহিত হবার পর গুরু বললেন, যাবার আগে আমায় একবার মায়ের মন্দিরে নিয়ে যাবে ঠাকুরপো?

অমলবাবু বললেন—'কোথায়, ঘোষগাঁও কামাখ্যাদেবীর মন্দিরে?'

গুরু বললেন, হ্যাঁ ভাই কতদিন দেখিনি; আর হয়ত জীবনে কখনও দেখতেও পাব না।

সে কথা ঠিক, অমলবাবু বললেন। আচ্ছা দাঁড়াও দেখি, একটা ভাল নৌকার ব্যবস্থা করতে পারি কিনা?'

সুরমদুর্গাপুরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে, পূর্ব বাংলা ও আসামের একেবারে শেষ সীমান্তে, গারো পর্বতের পাদদেশে একটি অতি প্রাচীন মন্দির আছে। মন্দিরের মধ্যে দেবী কামাখ্যা অধিষ্ঠিত আছেন এবং ওই স্থানটির নাম ঘোষগাঁও। সেজন্য নাম হয়েছে ঘোষগাঁওর কামাখ্যা দেবী। এই দেবী অত্যন্ত জাগ্রত। বহু দূর দূরান্তর থেকে ভীষযাত্রীরা আসে দেবীদর্শন করতে। আগে মায়ের পূজায় এখানে মহিষ বলি পড়ত, এখন রোজ বলি পড়ে পাঁঠা। এখানকার মাহাত্ম্য হোল এই যে, বলির পাঁঠা আপনিই গিয়ে হাড়িকাঠে মাথা রাখে; যে পাঁঠা নিজে থেকে হাড়িকাঠে মাথা না রাখে, বুঝতে হবে সে পাঁঠা যার মানসিক ছিল, তার মনে কোন পাপ আছে এবং তার মানসিক পূজা শুদ্ধ হয় না।—এমনই জাগ্রত দেবতা।

খরস্রোতা পার্বত্য নদী 'নিতাই' বিপুল বেগে ছুটে চলেছে, ঘুরে—বহুদূরে কংস নদীতে মিলিত হবার উদ্দেশ্যে। তার দুই ধারে গারো পাহাড়ে উত্তুঙ্গ খাড়া প্রাচীর, ভীষণ আকৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্য দিয়ে উজানের টানে নৌকা বয়ে চলেছে; নৌকার মধ্যে স্থির হয়ে বসে আছেন গুরু আর অমলবাবু। কৃষ্ণাও চুপ করে বসে আছে, তবে মাঝে মাঝে সে শীতল জলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে সেই জল নিয়ে নিজের মাথায় মুখে দিচ্ছিল। এই শীতল জলের স্পর্শ তার বেশ ভাল লাগছিল। পরের দিন ভোরে যখন মন্দিরের ঘাটে গিয়ে নৌকা ভিড়ল তখনও দিনের আলো স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। পাখীরা সবেমাত্র জেগে উঠে গাছে গাছে কলরব করে বেড়াচ্ছে। একটি দুটি করে লোক আসছে ঘাটে জল নেওয়ার জন্য। গভীর শুব্ধতায় গারো পাহাড়ের অরণ্য প্রকৃতি থম থম করছে। গুরু, কৃষ্ণা এবং অমলবাবু নদীতে স্নানাদি সেরে যখন মন্দিরে গেলেন তখন সবেমাত্র মন্দিরের দুয়ার খোলা হয়েছে। পূজার উপচারাদি যথাস্থানে রেখে তারা দেবীর পদতলে ভক্তিভরে প্রণাম করল। কৃষ্ণার চোখের জলে পাষাণ-বেদী ভিজে উঠল। গুরু ও অমলবাবু অনুচ্চস্বরে প্রার্থনা করলেন: 'মা গো! এবারের মত বিদায় দে, মা!'　　(ক্রমশঃ)

কাদম্বরী

শ্রীমমিতা রায় চৌধুরী, এম-এ, বি-টি,

সংস্কৃত সাহিত্যে গদ্যে যে দুই-তিনখানি উপন্যাস আছে তার মধ্যে 'কাদম্বরী' সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। মহাকবি বানভট্ট বিরচিত এই 'কাদম্বরী' গ্রন্থ যেমন রমণীয় তেমনি মনোরম। ঐই গ্রন্থ অবলম্বন করে তারাশঙ্কর তর্করত্ন ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বাংলায় উহা অনুবাদ করেন। এই 'কাদম্বরী'ই তারাশঙ্কর তর্করত্নের সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত গ্রন্থ। তাঁর "কাদম্বিরী" তদানীন্তন পণ্ডিতসমাজে আদৃত হয়েছিল। গ্রন্থটি পাঠ্যপুস্তকরূপে ছাত্রদের নিকট এবং উপভোগ্য কাহিনী হিসাবে সাধারণের নিকটও বিশেষ সমাদর লাভ করে। তারাশঙ্করের 'কাদম্বরী' বানভট্টের অনুবাদ নহে, ভাবানুবাদ। তারাশঙ্কর নিজে এ সম্বন্ধে বলেছেন—'ইহা ঐ গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে, গল্পটি মাত্র অবিকল পরিগৃহীত হইয়াছে।' কিন্তু তিনি একটির পর একটি কল্পচিত্র যে সৌন্দর্য্যের তিলক দিয়ে অঙ্কিত করেছেন তাতে প্রতিটি চিত্রই উজ্জ্বল। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'সমস্ত কাদম্বরী কাব্য একটি চিত্রশালা।' আরম্ভ হতে শেষ পর্য্যন্তই এর প্রমাণ আছে। অতিশয় বৈশম্পায়নের শুকতন্ত্র লাভ করার পর বিদিশারাজ শূদ্রকের রাজসভায় আত্মজীবনী বর্ণনার মাধ্যমেই সম্পূর্ণ গল্পটি রূপায়িত হয়েছে

শ্বেতকেতু নামে মহাতপা এক মহর্ষি দিব্যলোকে বাস করতেন। তাঁর রূপ জগদ্বিখ্যাত। তিনি একদা কেশার্চ্চনার নিমিত্ত কমলকুসুম তুলতে মন্দাকিনীপ্রবাহে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কমলাসনা লক্ষ্মী তাঁর রূপলাবণ্য দেখে মোহিত হন। শ্বেতকেতু ও লক্ষ্মীর এক পুত্র হয়; তার নাম পুণ্ডরীক। এই পুণ্ডরীক একদা হিমালয় প্রদেশে অচ্ছোদ সরোবরতীরে এক অপ্সরা-যুবতীর সাক্ষাৎ লাভ করেন। অপ্সরা অপূর্ব্ব সুন্দরী, তার নাম মহাশ্বেতা। পুণ্ডরীক ও মহাশ্বেতা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হলেন। কিন্তু মহাশ্বেতার সঙ্গে মিলিত হওয়ার পূর্ব্বেই আত্মীয়ের অবিনয়ের জন্য পুণ্ডরীক মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। মহাশ্বেতা শোকে মুহ্যমান হয়ে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হলেন। এমনসময় দৈববাণী হল— "বৎস মহাশ্বেতে! প্রাণত্যাগ করিও না, পুনর্ব্বার পুণ্ডরিকের সহিত তোমার সমাগম সম্পন্ন হইবেক।' মহাশ্বেতা আত্মহত্যা হতে প্রতিনিবৃত্ত হলেন এবং সেই হতে প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হবার আশায় অচ্ছোদ সরোবরতটে তপস্যায় আত্মনিয়োগ করে দিনাতিপাত করছেন।

ইতিমধ্যে পুণ্ডরীকের পুনর্জন্ম হল। নবজন্মে এর নাম হল বৈশম্পায়ন। বৈশম্পায়ন উজ্জয়িনীরাজ তারাপীড়ের মন্ত্রী শুকনাসের পুত্র; রাজা তারাপীড়ের পুত্রের নাম চন্দ্রাপীড়। চন্দ্রাপীড়ের অঙ্গসৌষ্ঠব ও রূপলাবণ্য সকলকে মুগ্ধ করত। চন্দ্রাপীড় সমস্ত শাস্ত্র, রাজনীতি, ব্যায়ামকৌশল সঙ্গীত, কাব্য, নাটক, ইতিহাস, সমুদায় অধ্যয়ন করে সর্ব্ব গুণান্বিত হলেন। তার মধ্যে সকল বিদ্যা ও সকল গুণের একত্র সমাগম হয়েছিল চন্দ্রাপীড়ের সঙ্গে একত্র বাস হেতু বৈশম্পায়নও সকল বিদ্যায় পারদর্শী হলেন এবং ক্রমে চন্দ্রাপীড়ের অকৃত্রিম বন্ধু হলেন।

যথাসময়ে চন্দ্রাপীড় যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হলেন এবং বৈশম্পায়নও সৈন্যসামন্ত সহ দিগ্বিজয় করতে বাহির হলেন। একদা চন্দ্রাপীড় মৃগয়াকালে এক কিন্নরমিথুনের পশ্চাদ্ধাবন করে সেই অচ্ছোদ সরোবরতীরে এসে উপস্থিত হলেন এবং সেখানে মহাশ্বেতার সাক্ষাৎ লাভ করলেন। মহাশ্বেতা চন্দ্রাপীড়ের সুন্দর ব্যবহারে প্রীত হয়ে অকপটে পুণ্ডরীকের সঙ্গে তার প্রণয়বৃত্তান্ত ব্যক্ত করলেন। নিজের জীবন-বৃত্তান্ত বলবার পর মহাশ্বেতা চন্দ্রাপীড়কে গন্ধর্বরাজ চিত্ররথের কন্যা কাদম্বরী সকাশে নিয়ে গেলেন। কাদম্বরী অপূর্ব্বসুন্দরী, মহানুভবা ও গুণবতী, মহাশ্বেতার সহোদরা স্বরূপা। অবিলম্বে কাদম্বরীর সঙ্গে চন্দ্রাপীড়ের প্রণয়-সংঘটন হল। উভয়ের প্রণয় এতই সুন্দর ও সংসারের অনুকূল হল যে তা ছোট, বড়, আত্মীয় এবং পর কাউকেও

P30216

তুলনা; তা প্রিয়জনকে কেন্দ্রস্থলে রেখে সকলের মধ্যে নিজের মাধুর্য্য বিস্তার করল। বর্ষা এই দুটী হৃদয়কে একত্রিত করল সেখানে আর মদনের সঙ্গে বিরোধ হল না।

এমন সময় রাজা তারাপীড়ের পত্র নিয়ে বর্ত্তাবাহক সেখানে আবির্ভূত হল। পিতার নির্দ্দেশে চন্দ্রাপীড় বৈশম্পায়নকে ফিরিয়ে নিয়ে রাজধানীতে আসতে বলে নিজে অগ্রে উজ্জয়িনীতে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন। গুরুজনের আজ্ঞার অধীন হয়ে চন্দ্রাপীড় উজ্জয়িনীতে গেলেন বটে কিন্তু তার অন্তঃকরণ পত্রলেখনগরেই রইল। উজ্জয়িনীতে প্রত্যাবর্ত্তন করবার কিছুদিন পর তিনি জানতে পারলেন কাদম্বরী তার বিরহে মৃতপ্রায় হয়েছেন।

এদিকে বৈশম্পায়নও দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করবার পূর্ব্বে ঘুরতে ঘুরতে অচ্ছোদ সরোবরতটে মহাশ্বেতাকে দেখতে পেলেন এবং মহাশ্বেতাকে পরিচিতের ন্যায় জ্ঞান করলেন। ক্রমে তিনি মহাশ্বেতার প্রতি আসক্ত হলেন এবং যথারীতি প্রেম নিবেদন করলেন। মহাশ্বেতা বৈশম্পায়নকে পুণ্ডরীকরূপে চিনতে না পেরে অভিশাপ দিলেন। ফলে বৈশম্পায়ন শুকজন্ম লাভ করলেন।

বৈশম্পায়নের রাজধানীতে ফিরতে বিলম্ব দেখে আশঙ্কিত হয়ে চন্দ্রাপীড় তার অন্বেষণে অচ্ছোদসরোবর তীরে এসে উপস্থিত হলেন এবং মহাশ্বেতার কাছে বন্ধুর শোচনীয় পরিণাম জানতে পারলেন; ঐ নিদারুণ সংবাদ শ্রবণমাত্র বন্ধুশোকে চন্দ্রাপীড় প্রাণত্যাগ করলেন।

এদিকে কাদম্বরী চন্দ্রাপীড়ের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করে প্রিয়তমের প্রত্যুদ্গমন করবার মানসে উজ্জ্বল বেশ ধারণ করলেন এবং সুসজ্জিত হয়ে মহাশ্বেতার আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু সেখানে প্রাণশূন্য চন্দ্রাপীড়ের দেহ পতিত আছে দেখে নিজে চন্দ্রাপীড়ের সঙ্গে উজ্জ্বলিত চিতানলে শরীর নির্ব্বাপিত করতে প্রয়াসী হলেন। সেই মুহূর্ত্তে অন্তরীক্ষে বাণী বিনির্গত হল যে চন্দ্রাপীড়ের এই দেহ মন্ত্রৌষধির অবিনাশি, বিশেষতঃ কাদম্বরীর করস্পর্শ হওয়াতে এতে আর ক্ষয় নেই। শাপদোষে এই দেহ জীবনশূন্য হয়েছে। যোগীশরীরের ন্যায় পুনর্ব্বার জীবাত্মা সংযুক্ত হবে। ততদিন পুনর্জীবিত না হয় সময়ে এই দেহ রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। দৈবাদনুগ্রহে চন্দ্রাপীড়ের দেহ অবিকৃত রইল। যতদিন চন্দ্রাপীড়ের দেহ অবিকৃত থাকল ততদিন এর রক্ষণাবেক্ষণে কাদম্বরী দিনরাত্রি অতিবাহিত করতে লাগলেন। যিনি নানা বেশভূষায় ভূষিত হয়ে হর্ষোৎফুল্লনোচনে প্রিয়তমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন তিনি এক্ষণে দীন বেশে দুঃখিত চিত্তে তপস্বিনীর আকার ধারণ করলেন। বিকসিত কুসুম, সুগন্ধি চন্দন, সুরভি ধূপ বা উপভোগের প্রধান সামগ্রী ছিল, তা এক্ষণে চন্দ্রাপীড়ের অর্চ্চনায় নিযুক্ত হল। এই ভাবে কাদম্বরী—চন্দ্রাপীড়ের পুনঃপ্রাপ্তি বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধচিত্ত হয়ে তার দেহ যত্নপূর্ব্বক রক্ষা ও ভক্তিভাবে পরিচর্য্যা করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে শাপের ফলে ঐ শুক পক্ষী বিন্ধ্যাচলের কোন এক শাল্মলী তরুতে জন্মগ্রহণ করল। সেখানে এক ব্যাধের হস্তে তার পিতামাতা নিহত হওয়াতে এই পক্ষীশাবক কোনও প্রকারে ব্যাধের হাত হতে আত্মরক্ষা করে হারীতের পিতা মহর্ষিজাবালির আশ্রমে পালিত পালিত হতে লাগল। মহর্ষি জাবালি শুকশিশুর জন্মান্তরের সমস্ত কাহিনী জানতেন এবং তাহার পুত্র ও শিষ্যমুনিকুমারদের কাছে এর শুকে পরিণত হওয়ার সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন: মহর্ষির কথাবসানে জন্মান্তরীণ সমুদায় কর্ম্ম শুকের স্মরণ হল এবং তদবধি মনুষ্যের ন্যায় স্পষ্ট কথা বলতে লাগল।

পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ হওয়ায় শুকপক্ষী একদা মহাশ্বেতাকে দেখবার মানসে তার আশ্রম অভিমুখে যাত্রা করল কিন্তু পথিমধ্যে জালবদ্ধ হয়ে নানা ঘটনা বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়ে অবশেষে এক চণ্ডালকন্যার হস্তগত হল। চণ্ডালকন্যা শুকপক্ষীটিকে বিদিশানৃপতি শূদ্রককে উপহার দিবার জন্য রাজসভায় এল। শুক পক্ষীটি মনুষ্যের ন্যায় কথা বলতে পারে এবং নানাবিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন দেখে রাজা শূদ্রক এতে পরমকৌতূহলী হয়ে শুকের জন্মবৃত্তান্ত শুনতে ইচ্ছা করলেন। তখন শুকরূপী বৈশম্পায়ন উপরোক্ত আত্মকথা বিবৃত করলেন। রাজা শূদ্রক কর্ত্তৃক আহূত হয়ে চণ্ডালকন্যা জানালেন যে তিনিই লক্ষ্মী—এই শুকপক্ষীর জননী। যাতে কর্ম্মদোষে পক্ষীজাতি অপেক্ষাও অন্য

কোন নীচ জাতিতে পুনঃপতিত না হয় সেই জন্যই তিনি মহর্ষি শ্বেতকেতুর বচনানুসারে একে বন্ধ করে রেখেছিলেন। এতদিনে এর আয়ুষ্ক কর্ম শেষ হয়েছে এবং শাপমুক্ত হয়েছে। এক্ষণে এই পক্ষী দেহ ত্যাগ করে নিজ অভিষ্ট বস্তু লাভ করতে পারবে—এই বলে চণ্ডালকন্যারূপিনী লক্ষ্মী দেবী অন্তর্হিতা হলেন।

লক্ষ্মীর বাক্যে রাজাশূদ্রকের ও পুণ্ডরীকের কথা স্মরণ হল। চন্দ্রের অবতার হয়ে তিনি রাজা তারাপীড়ের ঘরে চন্দ্রাপীড় নামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এতদিন শাপগ্রস্ত হয়ে বিদিশানগরীতে শূদ্রক নামে নরপতি ছিলেন। এখন শাপ অবসান হওয়াতে এই দেহ পরিত্যাগ করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে মহাশ্বেতার আশ্রমে রক্ষিত চন্দ্রাপীড়ের মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার হল। চন্দ্রাপীড় পুনর্জীবিত হয়ে কাদম্বরীকে প্রেম সম্ভাষণ করলেন।

চন্দ্রাপীড় পুনর্জীবিত হলেন। বিগতশাপ পুণ্ডরীক ও শুকরূপী বৈশম্পায়ন দেহ ত্যাগ করে স্বর্গলোকে চন্দ্রাপীড়ের পার্শ্বে উপস্থিত হলেন এবং বন্ধুর সাথে মিলিত হয়ে আনন্দসাগরে নিমগ্ন হলেন।

এইরূপে চন্দ্রাপীড় ও পুণ্ডরীক কাদম্বরী ও মহাশ্বেতাকে গ্রহণ করে পরমসুখে রাজ্যভোগ করতে লাগলেন।

(বেতারে পঠিত)

নাচের পুতুল

(গল্প)

শ্রীমতী অম্বুজ বালা দেবী

'—মিঃ চন্দ্রনাথ—'

কথাটা বেয়ারার হাতের অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছু

অংশুর কথায় মৃণালিনী অন্তরে আঘাত পেলো, চেয়ে রইলো ওর মুখের দিকে।

দেহের শিরায় শিরায় ফুটে উঠছে সদ্য জাগ্রত যৌবনের যৌন ঝিনতি। বালোর বন্ধুসহচরীর মনে হয়তো সাধ আছে ওর চির সহচরী হোতে—সাধ্য আছে কিনা ভেবে দেখ্‌বার অবকাশ কোথায়?

অংশুর বন্ধু বা মহেশ মজুমদারের পরিবারের কেউ এই দুইটি হৃদয়ের কোন সংবাদ পেয়েছে কিনা, বলা বড় শক্ত। ভবিষ্যতের পথে অংশু মৃণালিনীর মনের ওপর আশার রশ্মিপাত করে রেখেছে মাত্র।

বিদায় নেবার মুহূর্তে মৃণালিনী বল্‌লে—'চলে যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে কি?—একটা সামান্য কথা শুনে যদি'—অংশু বল্‌লে—'না, অনেক সয়েছি—বউদির কথাগুলো ঝড়ো মর্মান্তিক—আর—তোমার দাদা কি রকম—বউকে এত ভয়?—'

—'সব বরাতে করে, বুঝ্‌লি—তোর দাদার চিঠিখানি এখন আমার সম্বল, যাচ্ছি তো কল্‌কাতায়'—অংশু আর বল্‌তে পার্‌লে না। ওর চোখ দুটি জল-ছল-ছল কর্‌ছিল।

আঁচল থেকে মৃণালিনী দশ টাকার একখানা নোট বের করে অংশুর হাতে দিল,—দেবার আগে একবার চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌লো।

তারপর বল্‌লে—'এটা কাছে রাখো—টিকিট কেনার পয়সা আছে তো?'—

—হরিশ যা দিয়েছে, তা'তে অভাব হবে না—

মিত্তিরদের দোলমঞ্চ, এর কাছে কদম গাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে দুজনের কথা হোলো—কথার ফাঁকে ফাঁকে পড়্‌লো ক্ষণিক বিরতি—অংশু বল্‌লে—'আর দেরী করা যায় না ট্রেণের সময় হোলো'—

মৃণালিনীর সুন্দর মুখখানি ফ্যাকাসে হয়ে গেল হঠাৎ। অংশুকে প্রণাম করে বল্‌লে—'মাঝে মাঝে এসো অভিমান

করে ঘুরে বেড়োনা—কার ওপর অভিমান করবে? মা বাবা বেঁচে থাকতেন, তা হোলে ও যা কথা ছিল—'

কখন গাড়িটা পেরিয়ে অংশু ধীরে ধীরে চলে এলো ইউনিভর্সিটি বোর্ডের রাস্তার ওপর, এখান থেকে ট্রেণ এক কার্লং ঘুরেই হবে, যেতে যেতে পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লো দাঁড়িয়ে আছে তরুণী মৃণালিনী। তার যৌবন স্ফীত দেহের রূপলাবণ্য প্রভাতী সূর্যের আলোক রেখাকেও যেন ম্লান করে দিচ্ছিল।

মৃণালিনীর দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়্‌ছিল প্রভাতের নীহার বিন্দুর মত।

আরো পথটা বহু স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে চলেছে অংশু।

কৈশোরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মা ও বাবাকে হারিয়েছে সে,—চরম বেদনা বুকে নিয়ে বইয়ের পাতার পাতায় মনকে ফেলে রেখে দিতে হয়েছে, আর অবসর মত ওর মনের সুরে সুর মিলিয়েছে ঐ মহেশ মজুমদারের মেয়েটি। সময় মত দাদার কাছ থেকে না পেয়েছে কাপড় চোপড়, না পেয়েছে ইস্কুলের মাইনে, এর ওপর আছে বউদির লাঞ্ছনা গঞ্জনা। স্কুলে পড়েছে আর ছেলে পড়িয়েছে, তা ছাড়া উপায় কি? যে দিন থেকে বুঝি পেতে লাগলো, সেদিন থেকে স্কুলের কর্তৃপক্ষরা ওর অবলম্বন হোলেন, ফলে আর মাইনে দিতে হোতো না ওকে।

গাঁয়ের কলেজে ও এসে ভাই—কর্তৃপক্ষের পেয়েছে করুণা, কিন্তু ছেলে পড়ানো ছাড়েনি, পাছে সম্পূর্ণভাবে অন্নবিদ্যায় পড়তে হয়।

শান্তি যেখানে থাকে না, সেখানে মানুষ হবার পথও কণ্টকাকীর্ণ হয়ে পড়ে, ওর পথ তাই কুসুমাস্তীর্ণ নয়

ভাইপো ভাইঝিদের কাছ থেকে ও যেটুকু স্নেহ মমতা আশা করেছিল, সেটুকু না পাওয়াতে ওর মন উঠেছে বিষিয়ে। ওর অন্তরে ধীরে ধীরে যুথিত ক্ষত বেড়ে উঠেছে, এ ক্ষতের জ্বালা ওকে করেছে কাতর—এই ক্ষত হয়তো বৃদ্ধি পেয়ে পেয়ে ওর জীবনকে বিড়ম্বিত করে তুল্‌তো যদি না ঐ তরুণী মৃণালিনী এসে দাঁড়াতো ওর কাছে; ঐ মৃণালিনীই দিয়ে এসেছে সান্ত্বনা যেন্‌না দিনের মুহূর্তগুলিকে।

ওদের বাড়ীটা পাশাপাশি না হোলেও এক পাড়ায়ই ছেলেবেলার সহপাঠী;—অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাই মজুমদার পরিবারের সঙ্গে অংশুর নিবিড় আত্মীয়তার যোগ সূত্র রেখা গেছে। ফলে মৃণালিনীও পেয়েছে ওকে ছেলেবেলাকার সাথী। অন্য কোন দিক থেকে অসুবিধা ছিল না, তবে আশঙ্কা ছিল বড়লোকের সঙ্গে মেলামিশি করাটার পরিণতি হয়তো মর্মপীড়াদায়ক ও হয়ে উঠ্‌তে পারে।

অংশু নীচের তলার মানুষ উপর তলার হরিশের সঙ্গে মিশে কৈশোরে পেয়েছে হরিশের মায়ের অকৃত্রিম স্নেহ, মা-হারানো ছেলের পক্ষে এটুকু কম লাভ নয়? অধিকাংশ দিনই হরিশের মা নমিতা অংশুকে খাওয়াতেন, আর সময়ে সময়ে ওর ছেঁড়া কাপড় চোপড় বদলে দিতেন নতুন পোষাক পরিয়ে দিয়ে, ওর আপত্তি হরিশের মা শুনতেন না।

মজুমদার গৃহিণীর এরূপ ব্যবহার ওর দাদা হিমাংশু বা বউদিদি প্রভাবাণীও পছন্দ করতেন না। এজন্যে ওকে অনেক কটুকাটব্য উক্তি শুনতে হয়েছে।

ওর দাদা ডাক্তার, কিন্তু তাঁর নিজের মধ্যে হয়ে গেছে প্রকৃত শিক্ষার অভাব। ছোট ভাইয়ের ওপর নৃশংস ব্যবহার দেখিয়ে হিমাংশু হয়তো বেশ তৃপ্তি পেতেন কিন্তু সুখী যে হোতেন তা ঠিক বলা যায় না। কারণ যখন অংশুকে কেন্দ্র করে পারিবারিক কলহ সৃষ্টি হোতো আর মুখরা প্রভার মুখ থেকে অনেক অশ্রাব্য কথা বেরিয়ে আস্‌তো তখন তাঁকে দেখা গেছে সময়ে সময়ে ভাইয়ের পক্ষ নিয়ে স্ত্রীকে বেশ দু'কথা শুনিয়ে দিতে। হরিশ হিমাংশুকে বল্‌তো—'দুঃখ করিস্ নে, আমরা আছি—তোর ভাবনা নেই—কেন যে ছেলে পড়াস্'—অংশু এ কথার ওপর কোন কথা বলেনা। এমি করে অনেকখানি পথ এগিয়ে এসে কৈশোরোত্তর দিনে এমন পরিস্থিতি ঘটেছে যার জন্যে চলে যেতে হচ্ছে দেশ ছেড়ে।

ট্রেণে উঠে হরিশের দেওয়া ঠিকানাটী একবার দেখে নিয়ে আবার পকেটে রাখলো অংশু। নিজের মনে বল্‌ল—

'ভাবণা পাবো তো? আজকের মানুষ অন্য রকমের—দেখা করতে হয়!

কলকাতায় এসে বালিগঞ্জের লাম্বি পার্কের ভেতর ঢুকে অন্তু দু'পাশের বাড়ীগুলোর নম্বরের দিকে দিকে চেয়ে দেখে—পাঁচিল ঘেরা এক একটি বাড়ীর ফটকের পাশে বুদ্ধি তুলে আবার চলতে থাকে। এদিকটায় সমাজের অভিজাত ব্যক্তিরাই বাস করে বারা বৈশবচক্রে কাঞ্চন কৌলিন্য লাভ করেছে। ট্রাম বাস আর পথ চলাচলের শব্দ এদিকে পৌঁছায় না—বেশ শান্ত পরিবেশ।

শীতের সন্ধ্যা। ঝন্‌ঝনে ঠাণ্ডা হাওয়া। একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে গেছে। শীতার্ত পল্লবের মত কাঁপতে কাঁপতে চলেছে অন্তু—হাতে একটি সুটকেশ। নিজের মনে বলতে থাকে—'ট্রেনটা আসতে দেরী না করলে সন্ধ্যের আগেই এসে পড়তাম, তাহোলে এতটা ঘুরতে হোতো না'—

ওর দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে দার্শনিকের চিন্তাশীলতা,—ওর সারা মুখে ছুটে উঠেছে অসংখ্য রেখার চিহ্ন। ও খুঁজে বেড়াচ্ছিল সন্তু সেনের আবাস।

লাম্বিপার্কের ভেতর অনেকখানি গিয়ে বাড়ীর নম্বর ঢালো করে মিলিয়ে দেখে অন্তু, হ্যাঁ—এই বাড়ীটাই তো? প্রাচীর-ঘেরা একখানা প্রাসাদ-অনুপম অট্টালিকার সামনে ফটকের কাছে এসে দাঁড়ায়। ফটক দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই দরোয়ান যুবকের দিকে দৃষ্টিপাত করে জিজ্ঞাসা করলো—'কাকে চাই'—

অন্তু বললে—'সন্তু বাবুকে'—

দরোয়ান অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে দেখিয়ে দিল বাড়ী-বারান্দাটা। ওখান দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় গিয়ে কলিং বেল টিপলেই ওঁকে পাওয়া যাবে এই কথা বলে দরোয়ান ফটকের ধারে ঘটনি টিপতে লাগলো। ফটকের সামনে দিয়ে রাস্তাটা গোল হয়ে গেছে বাড়ীটার দিকে সামনে রেখে একটা কৃত্রিম ফোয়ারা সঞ্চলিত জলাধার।

অন্তু ওপরে উঠে কলিং বেল টিপতেই একটি উর্দ্দি পরা বেয়ারা দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। বললে—'হ্যাঁ' সাহেব আছেন'—প্রশ্নের উত্তরটা পেয়ে সঙ্কুচিত হয়ে অন্তু বললে—'ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই'—

—'কি বলবো সাহেব কে?'

অন্তু একখানি চিঠি বেয়ারার হাতে দিয়ে বললে—'সাহেবকে এই চিঠিখানা দেখাওগে, তা হোলেই হবে'—

বেয়ারা চলে গেল। অন্তু ভাবতে থাকে হরিপদর পত্রখানি যদি অনাদৃত হয়, তাহোলে তো ওর পক্ষে কোন অবলম্বনের আশাই থাকবে না। মনে পড়ে কোন অতীতের এক বিষণ্ণ সন্ধ্যায় পিতার শেষ কৃত্য সম্পন্ন করে বাড়ী ফিরে এসে প্রথম অনুভূত হয়েছিল এই পৃথিবীতে ও যেন একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছে, হয়তো এতটা অসহায়তা বোধ হোতো না যদি ওর মা বেঁচে থাকতেন আর বড় ভাই ও বড় বউদি দিনে দিনে কটু কাটব্য উক্তি করে ওর জীবনটাকে বিষিয়ে না তুলতেন। ও নিজের মনে আলোচনা করে দেখেছে অনাথ আশ্রমে যারা প্রতিপালিত হয়, তাদেরও একটা ভবিষ্যৎ আছে—জীবন যুদ্ধে তারাও বাঁচবার রাস্তা পায় বহুজনের আনুকূল্যে কিন্তু ওর তো কোন সম্ভাবনাই নেই। পাড়া গাঁয়ের ছেলে—গাঁয়ের কলেজেই পড়েছে, সহরের আবহাওয়ার সঙ্গে পরিচয় থাকলে হয়তো একটা পথ করে নেওয়া সম্ভব হোতো।

ওর চিন্তার সূত্রগুলি সরে গেল বেয়ারার ডাকে ওকে একখানি বড় ঘরে নিয়ে গিয়ে বেয়ারা বসালো। মূল্যবান আসবাব পত্রে ঘরখানি সুসজ্জিত। একটি সোফায় ও বসলো—প্রথম দর্শনের বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠতে ওর বেশ সময় নিল। ওর কাছে মনে হোলো বাড়ীটা যেন তন্দ্রাতুর হয়ে রয়েছে। ধনীদের স্বভাবই হোলো আগন্তুককে বেশ কিছুক্ষণ বসিয়ে রেখে আর ভাবিয়ে তুলে শেষে দেখা দেওয়া—যারা ধনীর দুয়ারে ধর্না দেয়, তারাই জানে কি রকম দুর্গতি ভোগ করতে হয়।

ওর পক্ষে এরূপ অভিজ্ঞতা তো নেই—ও বসে থাকে অনেকক্ষণ তবু গৃহস্বামীর আসবার অবকাশ হয় না। অনেকক্ষণ পরে সন্তু সোম এসে বললেন—'তুমি হরিপদর সহপাঠী!'

'—আজ্ঞে হ্যাঁ—'

'—চাকুরীর ব্যবস্থা করবার মত শক্তি আমার নেই, আর আজকের দিনে শুধু বি-এ, বি-এস্‌সি পাশ করলেই যে সামান্য একটা চাকুরী জুটে যাবে এরূপ সম্ভাবনা ও কম—তুমি বরং অন্য কোথাও দেখো—'

অংশুর চোখ দুটি অশ্রু সজল হয়ে উঠ্‌লো। বল্‌লে—'আমি একেবারেই নিঃসম্বল, আশ্রয়হীন—আমাকে আপনি দয়া না করলে—'

ও আর বল্‌তে পার্‌লো না। ও সজলের মনে সহানুভূতি উদ্রেক করাবার জন্যে আর তাঁর করুণা পাবার জন্যে নিজের জীবনের দুঃখের পাঁচালী একটু তুলে ধরলো, এতে সজল বুঝ্‌লেন যে সদ্য কৈশোরোত্তর ছেলেটি পরিবারবর্গের লাঞ্ছনা গঞ্জনা পেয়ে পেয়ে বিরূপ ভাগ্যের জলন্ত হাপরে পড়ে কাহিল হয়ে গেছে। ও বল্‌তে থাকে পারিবারিক সূত্রে যাঁদের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে, অসহায় কপর্দকশূন্য আত্মীয়কে দেখে তাঁরা সদর দরজা বন্ধ করে দেন,—বড় ভাই গাঁয়ে ডাক্তারী করেন, বেশ সঙ্গতিপন্ন অথচ ছোট ভায়ের ওপর যে কর্ত্তব্যবোধ থাকা উচিত সে বিষয়ে উদাসীনই ওকে গৃহ ত্যাগ করাতে বাধ্য করেছে। অংশুর পৌনঃপুনিক কাতরোক্তি সজলের মনে বেদনাপাত করলো।

বল্‌লেন—'পড়্‌তে চাও তো পড়ানোর ব্যবস্থা করতে পারি, তবে আমার ছেলেমেয়েদের পড়াতে হবে—এখানে খাওয়া থাকা আর মাসে কিছু হাত খরচা, এরকম হোলে যদি চলে তো মন্দ কি! কি বলো! তোমার চাকুরির জন্যে আমি কাউকে সুপারিশ করতে পার্‌বো না, আর আমার কার্শে ও সে রকম চাকুরি খালি নেই—'

'—আপনি আমার আশ্রয়দাতা, যেটা ভালো বুঝ্‌বেন, সেইটেই করলে আমার পক্ষে যথেষ্ট উপকার হবে—'

'—বি-এস্‌সি পাশ করেছ যখন, তোমার পক্ষে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াই ভালো—পাশ করতে পার্‌লে আমার কার্শে ঢুকতে পার্‌বে, পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে পার্‌লে তোমাকে সাগর পার থেকেও ছাপ দিয়ে আনা যাবে—কি বলো?—তোমার দাদা ডাক্তার, ও দিকটায় নাই বা গেলে—'

এরপর আর কথা থাকতে পারে কি?

হরিণ সজল সোমের নিকট আত্মীয়। ওর বাবা মহেশ মজুমদার বিশেষ সঙ্গতিপন্ন—চাউলের কারবার সামান্য অবস্থা থেকে বহু উর্দ্ধে উঠেছেন। তাঁর পরিবারও বড় নয়—দুই ছেলে আর এক মেয়ে হরিণ তাঁর সন্তানদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। অংশুর মা বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন মজুমদার বাড়ীতে অংশুর আনাগোনা তত বেশী ছিল না। পরে ঘনিষ্ঠতা নিবিড় হয়ে উঠ্‌লো কারণ অংশুর কাছে বাড়ীটা ফাঁকা ফাঁকা ঠেক্‌তো—ও অনুভব করতো জীবনটা মরুভূমি হয়ে গেছে। এসব বুঝ্‌তে পেরেই হরিণের মা সুনন্দা অংশুকে নিজের ছেলের মতই কাছে কাছে রাখ্‌তেন আর বল্‌তেন—'ছিঃ মন খারাপ করতে নেই—পুরুষ মানুষ, তোমার আবার ভাবনা কি!—লেখাপড়া কর মন দিয়ে—মানুষের একজন হয়ে ওঠো—'

অংশু বল্‌তো—'মাকে যে কোন মতেই ভুল্‌তে পার্‌ছিনে—

সুনন্দা বল্‌তেন—'কোলের সন্তান ছোলে ঐরকমই হয়, এই দেখ না কেন আমার শ্রীমান—যত আব্‌দার আমার কাছে,—ওর যত ঝামট আমাকেই সহ্য করতে হয়, হরিণ আর মিনু ওদের বাপকে পেলে আর কাউকে চায়না—শ্রীমান কলেজ থেকে পাস করে বেরোলে আর কি গাঁয়ে থাকবে, তখনই হবে আমার মুস্কিল—

এম্নিভাবে কথা চল্‌তে থাকে সুনন্দার সঙ্গে অংশুর—মাতৃস্নেহের কিছু স্পর্শ ও পায়—হরিণের মায়ের কাছ থেকে। মজুমদার বাড়ীতে ও প্রায়ই থাকে আর খাওয়া দাওয়া করে, এ নিয়েও অংশুর বউদি বাপী কত কথাই না বলেছে, আর মিথ্যাপবাদ দিয়েছে!

যাই হোক মজুমদার পরিবারের স্নেহের আনুকূল্য না পেলে অংশুর পক্ষে কল্‌কাতায় এসে আশ্রয় পাওয়ার পথ হোতো না। আশ্রয় পেয়েও ও অনুভব করতে হচ্ছে নানারকম অসুবিধা। রমা, রঙ্গীন আর রবেশকে রোজ সকাল সন্ধ্যায় পড়াতে হয়। রঙ্গীন আর রবেন ইস্কুলে পড়ে নেহাৎ নাবালক কিন্তু নাবালিকা রমা একেবারে আধুনিকা মেয়ে,—কলেজের ছাত্রী—দু'বার আই-এস্‌-সি ফেল করেছে তবু অধ্যয়ন করতে ছাড়ে না,—পড়ায় উৎসাহ যে তা বড় একটা দেখা যায় না, অংশুর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে

যেটা ওর কাছে ভালো লাগে না, পাছে গৃহস্বামী ওকে অন্য ভাবে দেখেন।

রমার বিলাসবিহ্বল হাবভাব ফুটে ওঠে কামনার উষ্ণতা, বলবার ভঙ্গীতে থাকে বৈশিষ্ট্য যা লক্ষ্য করলে মনে হয় মেয়েটার সর্ব্বাঙ্গে যেন জন্মছে যৌবনের লেলিহান শিখা, এ শিখায় বহু পুরুষের হৃদয় পতঙ্গ পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে। বিদ্যুল্লতার মত মোহিনী মূর্ত্তি—ঠিক গৌরবর্ণ বলা চলে না, প্রায় তুষার শুভ্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওপর এক একটা জায়গায় রক্ত-সঞ্চালনের ক্রিয়া এরূপ ভাবে চলেছে যাতে স্থানে স্থানে শুভ্রতার ওপর রাঙা ছাপ পড়ে গেছে।

মহিলা সমাচার

শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ

কংগ্রেসের মহিলা সভানেত্রী

বর্ত্তমান বর্ষে কংগ্রেস পরিচালনায় এক অভিনব পরিস্থিতি উদ্ভব হয়। নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত ঢেবর কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করিবেন না বলিয়া পদত্যাগ করেন। তাই ভারতের বহু জনপ্রিয় এবং সর্ব্বাধিক কালের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করা বড় দায়িত্ব পূর্ণ কাজ। নিজেদের মধ্যে বিপরীত মতাবলম্বী নেতা থাকাতে—এক নারীর উপর সেই গুরুভার অর্পিত করিয়া পুরুষগণ নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। জনপ্রিয় জহরলালজীর প্রিয় আত্মজা শ্রীমতী ইন্দিরা সেই গুরুভার সহাস্যে মস্তক পাতিয়া লইয়াছেন। তাঁহারকল্যাণ হস্তের প্রশ্রয়ে কংগ্রেসের ও ভারতের মঙ্গল হউক। ইন্দিরা দেবী বাংলার ঐতিহ্য ও সাহিত্য-রস শান্তিনিকেতনে আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন—বাঙ্গলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বাঙ্গালী তাঁহার স্নেহ-মমতাময়ী কৃপায় বঞ্চিত হইবে না।

রাণী তীর্থময়ী চৌধুরাণী যক্ষ্মা হাসপাতাল ওয়ার্ড

চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে ১০৫ কাউন্ট, বাংলার রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু শ্রীহস্তে রাণী তীর্থময়ী চৌধুরাণী ওয়ার্ড উদ্বোধন করেন। এই আরোগ্যশালায় যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসার জন্য ৬০টি শয্যার ব্যবস্থা হইয়াছে। ২ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা ব্যয়ের মধ্যে রানীর স্বামীর স্মরণার্থ প্রথম নাথ রায় তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ রক্ষার উদ্দেশ্যে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। অবশিষ্ট ৫ হাজার টাকা অন্যান্য

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তনে মহিলাদের সম্মান

এই বৎসর শ্রীমতী লীলা মজুমদারকে শ্রেষ্ঠ বাঙ্গলা লেখিকা হিসাবে বিখ্যাত "লীলা পুরস্কার" প্রদান করা হইয়াছে।

ডি, লিট, (অনার্স) উপাধি ধৃষিকা ঘোষ সাবিত্রী সারিন, বাসন্তী দত্ত (শ্রীমতী চৌধুরী), রাণী ঘোষ (মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল), বাসনা সেন, নীহারকণা মুখোপাধ্যায়কে প্রদত্ত হইয়াছে।

ডি, লিট, (বিজ্ঞান) উপাধি পাইলেন—রমা ঘোষ ও ও মাধুরী দত্ত, কৃষ্ণা সেনগুপ্ত ও মাধুরী পুরকায়স্থ।

লেডী নীলিমা ঘোষের শোক

ডাঃ জ্ঞান চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যুতে যে বিশাল ক্ষতি হইয়াছে তাহার বিষয় মনে করিলে লেডী নীলিমা দেবী তাঁহার শোক সম্বরণ করিবেন।

সূচী শিল্পী মনোরমা

শ্রীমতী মনোরমা সাহা রঙ্গিন সুতার সাহায্যে চিত্র অঙ্কনে পরম নিপুণ। তাঁহার বুনন একটী রঙ্গিন সুতার সীবন করা এক মহিলার প্রতিচ্ছবি ঠিক ফটোর অনুকরণে প্রস্তুত করিয়া বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। পশ্চিম বঙ্গ সরকার আয়োজিত সূক্ষ্ম সূচী শিল্প প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার পাইয়াছেন। তাঁহার এই দক্ষতা বাংলার সেকালে "কাঁথা শিল্প" ঐতিহ্য বহন করিয়া আসিয়াছে।

অতসী বড়ুয়ার চিত্র প্রদর্শনী

সম্প্রতি আর্টিষ্ট হাউসে বহুসংখ্যক দুই শতাধিক চিত্রের এক মনোরম প্রদর্শনী হইয়াছিল। তাহার চরিত্রগুলি যেমন সহজ সরল রেখাঙ্কিত তেমনই অভিব্যক্তি পূর্ণ। তাহার বৃদ্ধের জীবন আলেখ্যগুলি একাধারে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। অতসী দেবী ভাতশিল্পী, শিল্পী অসিত হালদারের কন্যা। তাহার হাত চিত্রাঙ্কণে অতি সহজ গতিতে চলে ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। কীর্তি অক্ষয় হউক।

লণ্ডনের মহিলা পি, এইচ, ডি

শ্রীমতী আভা মিত্র এম-এ, বি-এল, (কলিকাতা) সম্প্রতি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি, এইচ, ডি ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন। তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্রী :

বর্ত্তমান বর্ষে সমাবর্ত্তন উৎসবে লেক মহাশয়ে রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু সভানেত্রীত্ব করেন। কেতকী কুশারী (প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রী) বি-এ পরীক্ষায় সর্ব্বাধিক শ্রেষ্ঠ পদক পদ্মাবতী পদক প্রভৃতি ৪টী স্বর্ণ, ৩টী রৌপ্য পদক পাইয়াছেন।

এম-এ, পরীক্ষায় প্রথমা বন্দনা সেনিমা গুহ পদক, স্বর্ণা সাধু সরোজিনী পদক, মনিকা রায় ইউনিভার্সিটী পদক, কৃষ্ণ সেন, প্রতিমা চট্টোপাধ্যায় বি, এস-সি-তে সৌরী দাস (বাসন্তী পদক) বাসন্তী অধিকারী (ছটিনী স্বর্ণ পদক) নির্মেহ বালা বেগার (ইউনিভার্সিটী) পদক পাইয়াছেন।

এম, বি, এস্ অপর্ণা বসু রমা স্বর্ণপদক পাইয়াছেন। সুস্তপা ভৌমিক সাংবাদিক বিষয়ে ডিপ্লোমা পান।

সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতি

৩৪শ বার্ষিক উৎসব

১৮ই জানুয়ারী ১৯৫৯ রবিবার অপরাহ্ণ ৪॥০ ঘটিকায় সমিতির ৩৪শ বার্ষিক উৎসবের ১ম দিনের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বিচারপতি শ্রী পি বি মুখার্জি সভাপতিত্ব, ডাঃ শ্রীমতী সরলা ঘোষ "বার্ষিক সরোজ নলিনী বক্তৃতা এবং মহারাণী সুনীতি ঠাকুর শিল্প প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। ব্রতচারী সঙ্গীত সহযোগে মাননীয় অতিথিবর্গকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন ও মাল্যভূষিত করা হয়। সমিতির সভাপতি শ্রীনিবারণ চন্দ্র ঘোষ উপস্থিত সকলকে সাদর সম্ভাষণ জানান। সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতে উঠিয়া সমিতির সভাপতি শ্রীনিবারণ চন্দ্র ঘোষ সানন্দে ঘোষণা করেন যে স্বর্গত গুরুসদয় দত্তের উইলের ব্যবস্থানুযায়ী সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতির প্রাপ্য টাকার মধ্যে ১ম কিস্তি বাবদ ১০,০০০; দশ সহস্র টাকার চেক্ এই শুভ অনুষ্ঠানের দিন পাওয়া গিয়াছে।

সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা মণিকা গুপ্তা সংক্ষিপ্ত বিবরণী পাঠের মাধ্যমে সমিতির বহুবিধ কর্ম্মধারার সহিত উপস্থিত সকলকে পরিচিত করান।

ডঃ শ্রীমতী সরলা ঘোষ বার্ষিক সরোজ নলিনী বক্তৃতায় "এ যুগের নারীদের সমস্যা" বিষয়ে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন, তাঁহার ভাষণটি প্রবন্ধাকারে স্থানান্তরে প্রকাশ করা হইল।

অনুষ্ঠানের সভাপতি বিচারপতি শ্রী পি, বি, মুখার্জি তাঁহার ভাষণে বলেন,—সমগ্র জাতি দ্রুত আগাইয়া চলিতেছে এবং ভারতকেও ইহার সহিত সমতা রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। শুধু সহরকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের উন্নতি সাধন সম্ভবপর হইবে না। প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে হইলে পল্লী অঞ্চলে ইহার সুপ্রসার করিতে হইবে, সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতির কার্য্যধারা এই দিক হইতে আদর্শ স্থানীয়।

সমিতির কোষাধ্যক্ষ শ্রীজ্যোতি প্রসাদ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

১২শে জানুয়ারী সোমবার সকাল ৯।০ ঘটিকায় স্বর্গীয়া সরোজ নলিনী দত্তের মৃত্যু বার্ষিকী দিবস উপলক্ষে সমিতি ভবনে এক প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্তা পুণ্যপ্রভা বসু প্রার্থনা পরিচালনা করেন। বেলা ৪ ঘটিকায় ছাত্রী সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে অনেক প্রাক্তন ছাত্রী যোগদান করিয়া ভাববিনিময় ও মতামতের উৎসাহিত করেন।

অপরাহ্ণ ৫।০ ঘটিকায় "পুরস্কার বিতরণ" অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার স্পীকার শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্ব, মাননীয় বিচারপতি শ্রী বি, কে, বসু প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদান করেন এবং পুরস্কার বিতরণ করেন। সভাপতি এবং প্রধান অতিথি উভয়েই সরোজনলিনী সমিতির জনহিতকর কাজের জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেন।

মহিলা সমিতি প্রতিনিধি সম্মেলন

২০শে জানুয়ারী মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীযুক্তা বিভা ঘোষের সভানেত্রীত্বে মহিলা সমিতি প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২১টি মহিলা সমিতি হইতে প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন এবং সমিতির কার্যপ্রণালী ও কাজের সুবিধা অসুবিধার বিষয়ে আলোচনা করেন।

চলচ্চিত্র প্রদর্শন

২৪শে জানুয়ারী রবিবার সন্ধ্যা ৬টায় পশ্চিমবঙ্গ প্রচার বিভাগ কর্তৃক শিক্ষামূলক ছায়াচিত্র প্রদর্শন করেন। তাঁহাদের এই দান স্বীকারের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

শিল্প প্রদর্শনী

বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সমিতি ভবনে এক শিল্প-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। সরোজ নলিনী শিল্প বিদ্যালয় ও মফঃস্বলস্থ ২১টি মহিলা সমিতি এই শিল্প প্রদর্শনীতে যোগদান করেন। মহিলা সমিতি ২১টি :—১। চাঙড়া রেলওয়ে, ২। কাঁচড়াপাড়া রেলওয়ে, ৩। ডাকাপাড়া রেলওয়ে, ৪। নৈহাটী রেলওয়ে, ৫। সেন্ট্রাল জুট, নৈহাটী, ৬। সেনহিয়া (বর্দ্ধমান), ৭। শ্রীরামপুর, ৮। বসন্তকুমারী বিধবা আশ্রম, পুরী, ৯। যতীনবাগ নগর, বেলঘরিয়া, ১০। ব্যারাকপুর, ১১। চাঁদপুর, ১২। গোবিন্দনগর, ১৩। মদনপুর, ১৪ মনোহারপোতা, (শিমুরালী) ১৫। বাকইপুর, ১৬। লালাবাগান, ১৭। হালতু, ১৮। আগরপাড়া গড, ১৯। ব্যাটরা, ২০। গান্ধী কলোনী, ২১। রাহুতা, ২২। মহুস্রী স্মৃতি, মিরতা।

প্রদর্শনীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্প কাজের জন্য সরোজ নলিনী শিল্প বিদ্যালয়ের তাঁত বিভাগ, উৎকৃষ্টতর কাজের জন্য ক্যালিকো প্রিন্টিং বিভাগ এবং আগত মহিলা সমিতি সমূহের শিল্প দ্রব্যের ভিতরে শ্রীরামপুর মহিলা সমিতি সর্বোৎকৃষ্ট কাজের জন্য পুরস্কৃত হয়।

মহিলা সমিতির বার্ষিক শিল্প পরীক্ষা

অন্তর্ভুক্ত মহিলা সমিতিসমূহের ১৯৫৮ সালের বার্ষিক শিল্প পরীক্ষা গৃহীত হয়. ২১টি মহিলা সমিতি হইতে জুনিয়ার কোর্সে ৮০জন ও সিনিয়র কোর্সে ৪০ জন পরীক্ষা দিয়াছে। তন্মধ্যে যথাক্রমে ৩২ ও ২৮ জন পাশ করিয়াছে।

জুনিয়ার কোর্সে নৈহাটী রেলওয়ে মহিলা সমিতির ছাত্রী শ্রীমতী ১ম স্থান অধিকার করিয়াছে। নৈহাটী রেলওয়ে মহিলা সমিতির ছাত্রী শ্রীমতী নিলীমা দাস এবং বাইমন্দির মহিলা সমিতির (বিজয়নগর) ছাত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মী বিশ্বাস ২য় স্থান অধিকার করিয়াছে।

পরীক্ষা নিম্নলিখিত কেন্দ্রসমূহে গৃহীত হয়—

১। কলিকাতা কেন্দ্র সরোজনলিনী সমিতি ভবন,
২। নৈহাটী কেন্দ্র নৈহাটী রেলওয়ে মহিলা সমিতি
৩। মদনপুর কেন্দ্র ২নং গবিন্দনগর কলোনী।
৪। ব্যাটরা কেন্দ্র তারা সুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়।
৫। কাটিহার কেন্দ্র রকারাম রেলওয়ে ইন্‌স্টিটিউট।
৬। পুরী কেন্দ্র বসন্তকুমারী বিধবা আশ্রম।

সরোজ নলিনী শিল্প বিদ্যালয়

সরোজ নলিনী শিল্প বিদ্যালয়ের ৪৬ জন শিক্ষার্থী ১৯৫৮ সনের গৃহীত শিল্প পরীক্ষায় পরীক্ষা দেয়। তন্মধ্যে ৩৮ জন উত্তীর্ণ হয়। শ্রীযুক্তা সত্যবতী কাউর বাদেরা

সর্ব্বাধিক নম্বর পাইয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। ১৯৫৭ সালের মেট্রোপলিটন প্রাথমিক পরীক্ষায়ও শ্রীমতী সত্যবন্ধু ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিল। শ্রীমতী সত্যবন্ধু কাউর বালেয়া একজন অসহায়া ছাত্রী।

সরোজ নলিনী টিচার্স ট্রেনীং কলেজ

১৯৫৮ সালের টিচার্স ট্রেনীংএর গৃহীত পরীক্ষায় সরোজ নলিনী টিচার্স ট্রেনীং বিভাগের নিয়মিত ছাত্রী ৩২ জন এবং পূর্ব্ববৎসরের অনুত্তীর্ণ ছাত্রী ৬জন মোট ৩৮জন ছাত্রী পরীক্ষা দেয়। তন্মধ্যে নিয়মিত ছাত্রীদের মধ্যে ৪জন ১ম বিভাগ, ১৯জন ২য় বিভাগ ও ৪জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়, এবং পূর্ব্ব বৎসরের অনুত্তীর্ণ ছাত্রী ৬ জনই উত্তীর্ণ হয়। মোট উত্তীর্ণ হয় ৩৩জন।

প্রজাতন্ত্র দিবস পালন

গত ২৬শে জানুয়ারী সমিতি ভবনে সাধারণ-প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপিত হয়। সরোজনলিনী সমিতির কার্য্যকরী সভার সদস্যদের ভিতরে শ্রীমতী প্রীতি সেন ও শ্রীমতী সাবিত্রী সেন বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীগণ ও ছাত্রীবৃন্দ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। শ্রীমতী প্রীতি সেন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। ছাত্রীবৃন্দ কর্ত্তৃক জাতীয় সঙ্গীত-গীত হয়। ভাবোদ্দীপক পরিবেশের মধ্যে অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়।

সামাজিক (বয়স্কা) শিক্ষা দিবস পালন
সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতি

১লা ডিসেম্বর ১৯৫৮ সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতি পরিচালিত সামাজিক (বয়স্কা) শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে সমিতি ভবনে "সামাজিক (বয়স্কা) শিক্ষা দিবস" পালন উপলক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিনে শিক্ষার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া সভায় বক্তৃতা ও আলোচনা করা হয়।

কাঁচড়াপাড়া মহিলা সমিতি

বয়স্কা দিবস পালন উপলক্ষে ২রা ডিসেম্বর (১৯৫৮) তারিখে সমিতির সদস্যা ও ছাত্রীবৃন্দ প্রভাতফেরী বাহির করে, অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় সমিতির শিক্ষার্থীগণ নৃত্য, গীত ও আবৃত্তি এবং "জাগরণ" নাটিকা অভিনয় করে, তৎপরে সকলের ভিতরে লেবু ও মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়।

ভাঙ্গাপাড়া মহিলা সমিতি

বয়স্কা দিবস পালন উপলক্ষে ১লা ডিসেম্বর (১৯৫৮) তারিখে সমিতিতে শিক্ষার্থীবৃন্দ "হাসী" নাট অভিনয় করে। ঐ দিনে সমিতির সদস্যাদের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া জনৈকা বন্ধ্যা রোগিনীকে অর্থ সাহায্য করা হয়।

সেণ্ট্রাল ক্লাব মহিলা সমিতি নৈহাটী

৪ই ডিসেম্বর (১৯৫৮) শ্রীমতী প্রীতিপ্রভা সেনের সভানেত্রীত্বে মহিলা সভা অনুষ্ঠিত হয়, সভায় স্থানীয় বহু মহিলা যোগ দেন ও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

নোনাকুড় মহিলা সমিতি

১লা ডিসেম্বর (১৯৫৮) সমাজ শিক্ষা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। প্রভাতফেরী, জাতীয় পতাকা উত্তোলন, রাস্তা ও পুকুর সংস্কারমূলক কাজ প্রভৃতি একযোগেই করা হয়। অপরাহ্ণে সভার আয়োজন করা হয়। সভায় জন শিক্ষার বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়। নিরক্ষরতার অভিশাপ হইতে দেশ ও সমাজকে মুক্ত করিবার প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হয়। রাত্রিতে সংকীর্ত্তন করা হয়।

ভাটপাড়া মহিলা সমিতি

৭ই ডিসেম্বর বয়স্কা শিক্ষা দিবস পালন উপলক্ষে এক বিশেষ সভার ব্যবস্থা করা হয়। সভায় প্রায় ২০০ শত মহিলা যোগদান করেন। স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতির কর্ম্মী শ্রীজিতেন্দ্র ঘোষ মহাশয় ছায়াচিত্র সাহায্যে বয়স্কা ও সামাজিক শিক্ষা এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। জন শিক্ষা বিষয়ে স্থানীয় মহিলাদের ভিতরে বেশ সাড়া পাওয়া যায়।

নারী কল্যাণ বয়ন সমিতি, বেলঘরিয়া

৭ই ডিসেম্বর ১৯৫৮, বয়স্কা শিক্ষা দিবস পালন উপলক্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও মহিলাদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত বালিকাদের ভিতরে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। সভায় বয়স্কা ও সামাজিক শিক্ষার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করা হয়। ৭জন মহিলা ঐ দিনে বয়স্কা শিক্ষা বিভাগে যোগদান করেন।

গান্ধী কলোনী নারী কল্যাণ সমিতি

১লা ডিসেম্বর ১৯৫৮ বয়স্কা শিক্ষা দিবস পালন উপলক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়, সভায় স্পাহিকা সমিতির কার্যবিবরণী পাঠ করেন এবং বয়স্কা ও সামাজিক শিক্ষার তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করা হয়। উপস্থিত সকলের ভিতরে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। মাননীয় বিচারপতি শ্রী বি, বি, মুখার্জীর পত্নী শ্রীমতী গীতা মুখার্জী প্রায় ১০০৲ টাকা মূল্যের পোষাক পরিচ্ছদ বিতরণের জন্য সমিতিকে দেন। ঐ সমস্ত পোষাক পরিচ্ছদ সমিতির কর্মী ও ছাত্রীদের ভিতরে বিতরণ করা হয়।

চাঁদপুর মহিলা মঙ্গল সমিতি

বয়স্কা শিক্ষা দিবস পালন উপলক্ষে ১লা ডিসেম্বর, ১৯৫৮ সকাল ৭ টায় প্রভাতফেরী বাহির করা হয়। প্রায় ৩৫ জন ছাত্রী শঙ্খধ্বনি সহকারে পল্লী প্রদক্ষিণ করে। সমিতিগৃহে ফিরিয়া আসিয়া সমবেত সকলে সঙ্কল্প গ্রহণ করে যে, গ্রামে বয়স্কা আরও যাহারা আছেন, লজ্জা ও সঙ্কোচ বশতঃ এখনও এখানে লেখাপড়া শিখিতে আসেন না তাঁহাদের বুঝাইয়া আনিতে হইবে। দুপুরে ছাত্রীগণ পরস্পরকে প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করেন। তারপর হাতের কাজে যথা বাঁশের ও নারকেল কাঠির কাজ হয়।

বৈকালে ছাত্রীগণ তিনটী দলে বিভক্ত হইয়া গ্রামে গ্রামে যায় এবং বয়স্কা শিক্ষা বিভাগে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ জানায়। ইহাতে গ্রামবাসীদের ভিতরে সাড়া পাওয়া যায়। সন্ধ্যায় মহিলাদের দ্বারা রামায়ণ পাঠ হয়, গ্রামের অনেকেই ইহাতে যোগদান করে।

বিবেকনগর মহিলা সমিতি

১লা ডিসেম্বর ১৯৫৮ তারিখে বয়স্কা শিক্ষা দিবস পালন উপলক্ষে এক সভার ব্যবস্থা করা হয়, সভায় বয়স্কা ও সামাজিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

লালাবাগান মহিলা সমিতি

বয়স্কা শিক্ষা দিবস পালন উপলক্ষে প্রাক্তন ও বর্ত্তমান ছাত্রীরা সমবেত হয় এবং দলে দলে বিভক্ত হইয়া অনগ্রসর ও নিরক্ষরদের ভিতরে বয়স্কা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আলোচনা করে। শিক্ষার আগ্রহ অনেকের ভিতরেই পরিলক্ষিত হয় কিন্তু আর্থিক অভাবের জন্য তাহারা অগ্রসর হইতে পারিতেছে না বলিয়া জানায়।

বাণীমন্দির মহিলা সমিতি, নৈহাটী

১লা ডিসেম্বর, ১৯৫৮, বয়স্কা শিক্ষা দিবস পালন উপলক্ষে ভোর ৬ টায় এক শোভাযাত্রা বাহির করা হয়। বেলা ৮টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। বৈকাল ৪ ঘটিকায় এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রায় ৫০০ শত মহিলা যোগদান করেন। বয়স্কা শিক্ষার বিষয়ে সভায় শ্রীযুক্ত সুবোধ বাগচী মহাশয় প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা করেন।

CALCUTTA
CENTRAL
LIBRARY
UNIVERSITY

৩৪শ বর্ষ] বৈশাখ—১৩৬৬ [২য় সংখ্যা

উপনিষদ্‌মালা

(অনুবাদ)

শ্রীপুষ্প দেবী

কঠ—৬।৯।১২

যদি বা তোমারে দেখিতে না পাই
নাই শুনি তব বাণী
তবুও পরাণে পাই যে তোমার
অজর পরশখানি।
সংসারমাঝে থাকি নানা কাজে
তবু কার ডাক শ্রবণে যে বাজে
অধীর এ মন করে পরশন কার হরষিত পাণি ?
সুখ ও দুখের বন্ধু আমার আমি ত তোমায় জানি।
নারীজীবনের ব্যর্থতারাশি যখন দহন করে
শেষের পথেতে চলিতে চরণ বারে বারে ভেঙে পড়ে
কত ব্যর্থতা রিক্ততা শত
আঘাত সে দেহ মনে অবিরত
তখন মুছায়ে আঁখিজল মোর কে ডাকে আপন ক'রে
শান্তি প্রলেপ বুলায়ে বক্ষে টেনে নেয় স্নেহ ভরে।

'পূরবী' ও 'মহুয়া' ঋতু

শ্রীনন্দিতা গঙ্গোপাধ্যায়

রবি-কবির মনোভূমিতে বার বার নব নব ঋতুর আবির্ভাব ঘটিয়াছে। এই আবির্ভাবের মধ্যে নব নব সুরের চেতনা আসিয়াছে, প্রতিসৃষ্টির মধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে নবতর রূপ। তাঁহার প্রথম সৃষ্টি হইতে নবীন সৃষ্টি পর্যন্ত, ইহাদের মধ্যে যোগসূত্র যেটুকু আছে তাহা কেবল একই কবির সৃষ্টি বলিয়া ; নহিলে আর কোন মিলই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। "সন্ধ্যাসংগীত" আরম্ভ করিয়া "মহুয়া" পর্যন্ত যত প্রেমকাব্য তিনি রচনা করিয়াছেন তাহাদের সবগুলির মধ্যে একটি প্রধান সুর আছে বটে এবং তাহা হইল সামান্যের মধ্যে অসামান্যের পরিকল্পনা, মানবীর মধ্যে মানসীর আবিষ্কার। কিন্তু প্রকাশ ভঙ্গীর বিভিন্নতায় তাহা বিভিন্নকাব্যে বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। তাহা ছাড়া কবি নিজেই বলিতেছেন, "আমার বিশ্বাস, আমার মন থেকে যে ঋতু যায় সে আর এক অপরিচিত ঋতুর জন্যে জায়গা করে বিদায় গ্রহণ করে। পূর্ব্বকালের সঙ্গে কিছু মেলেনা এ হতেই পারেনা, কিন্তু সে যেন শরতের সঙ্গে শীতের মিলের মত।" বাস্তবিকই "পূরবী"র পূর্ব্বে "বলাকার"ও দেখি চলার বেগ, পূরবীতেও সেই গতিবেগ আছে, কিন্তু যে চলার বেগ তিনি "বলাকা"য় অনুভব করিয়াছিলেন তাহা পূরবীতে একটু শমিত হইয়া আসিয়াছে। অবশ্য 'পথিক' পর্যায়ে আবার তাহার চলা সুরু হইয়াছে পূর্ববেগে,—তবু ঠিক যেন আগের সুরটি তাহাতে বাজে নাই।

সৃষ্টি ও মানুষের মধ্যে একটি পরিবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের ধারা বহিয়া চলিয়াছে রবীন্দ্রনাথ। তাহা তাঁহার সুতীব্র অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মানুষ যে চিরন্তন পথিক—যাত্রাপথ যে তাহার অনন্ত ও অসীম একথা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি চিরকালের যৌবনধর্ম্মের গান ধরিয়াছেন "পূরবী"তে। ইহার সঙ্গে মিশিয়া আছে কবির কয়েকটি বিশেষ প্রবণতা—এক,বিরাশক্ত মন লইয়া মর্ত্ত্যের প্রেম ও সৌন্দর্য্যের আস্বাদন, দ্বিতীয়তঃ রূপ-রূপান্তর, জন্ম জন্মান্তরের মধ্য দিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে এই কাব্যরসাস্বাদনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ, তৃতীয়তঃ মর্ত্ত্যের দৃশ্য সৌন্দর্য্যের অন্তরালে তথা কবির অন্তরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটি ঐক্যসত্ত্বাকে উপলব্ধি করিবার ব্যাকুলতা ও অসম্পূর্ণতা বোধে হতাশ্বাস। এগুলির সহিত কোথাও কোথাও অতি ক্ষীণভাবে বিজড়িত রহিয়াছে কবির পূর্ব্বজীবনের বেদনা মধুরস্মৃতি

কিন্তু "মহুয়া"র আবির্ভাব একান্ত আকস্মিক। যদিও কবি এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "সব কবিতাই যখনি লেখা যায় তখনি আকস্মিক।" কয়মাসের ধারা ছিল, তবু "মহুয়া"র কবিতাগুলি তাহা নিঃসন্দেহেই ভুলিয়াছে। তিনিও বলিয়াছেন, "মনের যে ঋতুতে 'মহুয়া' লেখা সে আকস্মিক ঋতুই, কয়মাসের ধারায় আকস্মিক নয়, স্বভাবই আকস্মিক।" এই কাব্যে প্রেমের নিছক প্রসাধন কলা ও সাধন বেশ প্রকাশ পাইয়াছে।

"পূরবী"তে দেখি যে মহাযাত্রার জন্য অনন্ত" দেখিয়া কবি বলিতেছেন —

দেখ না কি হায় বেলা চলে যায়—
সারা হয়ে এলো দিন।
বাজে পূরবীর ছন্দে রবির
শেষ রাগিনীর বীণ।

এই যে বেদনা—ইহা তাহার কাব্যকে অপূর্ব্ব এবং গাম্ভীর্য্যপূর্ণ কাব্যসুষমা দান করিয়াছে। চলার অনুভূতি এবং উপলব্ধির অসম্পূর্ণতার বেদনার সঙ্গে বয়ঃসুলভ বিষাদের মনোভাব মিশ্রিত হইয়া করুণরসের সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু "মহুয়া" এই কাব্যের পরবর্ত্তী হইলেও ইহার মধ্যে এইরূপ করুণ রসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। "মহুয়া" কাব্যে কবি জীবনের এমন একটি স্থানে আসিয়া

পৌঁছিয়াছেন যে, যেন বলিতেছেন,—"ধরিলে ত ধরা যায় না, দাও ছেড়ে দাও ছেড়ে।" যাহা যাইতেছে তাহাকে যাইতে দাও। তাহার জন্য বৃথা আক্ষেপের প্রয়োজন নাই। যাহা আসিতেছে তাহাকে বরণ করিয়া লওয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়াই উচিত। কেননা পরিবর্ত্তনশীল জগতে সকল কিছুরই পরিবর্ত্তন ঘটিবে; কিন্তু অপরিবর্ত্তনীয় হইল মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেম, আর এই প্রেম মুক্তির মধ্যেই স্থায়িত্ব লাভ করে। প্রেম যে একদিন জীবনে আসিয়াছিল—সেই প্রেমের স্মৃতি তো অক্ষয়, জ্যোতির্ময়, সে তো স্বপ্ন নয়, সে যে চরম সত্য। জীবনের সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে সেই সে অপরিবর্ত্তনীয়। "মহুয়া"র মধ্যে এই প্রেম সত্যের চরমরূপটি প্রকাশ পাইয়াছে।

"মহুয়া" কবির অপরূপ সৃষ্টি! প্রেম বা ভালোবাসা সম্পর্কে কবির সমগ্র চেতনাটুকু মহুয়ায় বর্ত্তমান। ইহাতে উৎকৃষ্ট প্রেমের কবিতা অসংখ্য। এখানে কবি প্রতিভার আর একটি সুরের কথা উল্লেখ করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতার একটি প্রধান লক্ষণ তাহার কমনীয়তা, তাহার স্নিগ্ধ নম্রতা। কবির কাব্যে বীররসের অভাব আছে এই অনুযোগ অনেকদিন ধরিয়া করা হইয়াছে; কিন্তু 'মহুয়া'র অনেকগুলি কবিতায় যে প্রেমের পরিচয় পাই, তাহা বীরের প্রেম, তাহা শৌর্য্যের দ্বারা মহিমান্বিত। এখানে প্রেমের মধ্যে আর্ত্তনাদ নাই, কিন্তু বজ্রনাদ রহিয়াছে। এখানে প্রেম বীররসাশ্রিত না হইলেও এই প্রেমের অধিকার একমাত্র বীর্য্যবানেরই আছে। কারণ "দুর্ব্বল সে গ্লানি করে নিজ অধিকার বরমাল্যের অপমানে।" যৌবনের নব উদ্বোধন হইয়াছে এই প্রেম কাব্যে। এক মহা শক্তিশালী প্রেমকে কবি আহ্বান করিলেন কাব্যের প্রথম কবিতাতেই। হর হইবার পূর্ব্বে মদনদেব পঞ্চশর লইয়া আসিতেন কুসুমবনে, অবহেলে উড়াইয়া, কিন্তু মহুয়ার কবি যখন তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিলেন তখন তিনি বলিলেন :

তব অপমান শয্যা ছাড়ো, পুষ্পধনু
রুদ্র-বহ্নি হতে লহো অনঘচ্ছি তনু

• • •

যে অতনু বীরের তনুতে লহো তনু

তাঁর মন কখনও প্রেমের মর্য্যাদা দিতে পারে না। তাইত কবি প্রেমকে বীরের অন্তরে আশ্রয় লইতে বলেন।

যে যৌবনকে তিনি উদ্বোধিত করিলেন, সে এই বলিয়া আক্ষেপ করিল না: "আজি যে রজনী যায়, ফিরাইব তায় কেমনে?" এই যৌবন নির্ভয়, এ আসিল তাণ্ডবের মহারথে। যে বসন্তকে কবি আহ্বান করিলেন, সেও আসিল যুদ্ধের বাদ্য বিস্তারিয়া সিন্ধুর তটে। এই নির্ভয় যৌবনের প্রতীক যে রমণী সে "লজ্জিতা" নহে, সে "সবলা" তাহার বাণীতে নূতন ভেরী:

পথ প্রান্তে কেন রব আসি
ক্লান্ত ধৈর্য্য প্রত্যাশায় পুরণের লাগি
ধৈর্য্যাগত দিনে?

এই যে বীর্য্যবান প্রেম, ইহার বরণেও বৈশিষ্ট্য আছে। "চিত্রা"র নায়ক স্বর্গ হইতে সানন্দে বিদায় লইয়াছিল ও লোকান্তরে পৃথিবীতে জীবনতম ঘরে প্রেয়সীকে লইয়া সুখই থাকিবে এই আশ্বাস দিয়াছিল। "মহুয়া"র সবলা নায়িকার আশা উচ্চতর। সে দময়ন্তীকে অনুসরণ করিয়া দেব হইতে মানুষকে বাছিবে না, সে বরণ করিবে তাহাকেই "যে ফেলে নাই ছায়া ছায়ার আকারে"

এই নূতন প্রেরণায় কবির পূর্ব্বশ্রী তো হারায় নাই-ই; বরং এই নব অনুভূতিতে, বীর্য্যের সঙ্গে নম্রতার, উদ্দীপনার সঙ্গে সাধনার সম্মিলন হইয়াছে। এই যে প্রেম, ইহা তপস্যার অঙ্গ, ইহাতে কঠোর ও কোমলের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে।

"পূরবী"র মধ্যে স্থানে স্থানে ব্যক্তিগত ভাব আসিয়া পড়িয়াছে কিন্তু "মহুয়া"র কবিতাগুলি ব্যক্তি অনুরোধে লিখিত হইলেও তাহা নৈর্ব্যক্তিক মহিমালাভ করিয়াছে।

"পূরবী"র সহিত মহুয়ার যে মিল তাহা শরৎ-এর সঙ্গে বসন্তের মিলের মত। "পূরবী"কে আমরা আকাশে গোধূলির রক্তরাগ বলিতে পারি, আর "মহুয়া"কে বলি মধ্যগগনের পূর্ণদীপ্ত সূর্য্য। •

• কয়েকটি বিশেষ পুস্তকের সাহায্যে লিখিত।

প্রতিবেশী

শ্রীঊর্ম্মিলা দেবী

দক্ষিণ কলিকাতার অভিজাত পল্লীতে বাড়ী পেলাম বরাত জোরে। বরাত জোরেই বলতে হবে—আজকালকার বাজারে পছন্দসই বাড়ী পছন্দ মত ভাড়ায় পাওয়া ভাগ্যের কথা—

নতুন বাড়ীতে এসে গোছ গাছ করতেই তো বেশ কদিন কেটে গেলো তারপর ভাবলাম পাড়া প্রতিবেশীদের সঙ্গে একটু আলাপ করা দরকার বিপদে আপদে সময় অসময়ে ওরাই তো ভরসা। ওঁকে বললাম "চলনা পাশের বাড়ীতে আলাপ করে আসি।" সব বিষয়েই আমরা বিপরীত হলেও এ বিষয়ে দেখলাম একমত। প্রথমেই গেলাম পাশের নবীবাবুর বাড়ী ভদ্রলোকের বাজারে মনিহারী দোকান আছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই এক স্থূলকায়া গৃহিণী একমুখ হাসি দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন—কর্ত্তা বাড়ী নেই—গিন্নি বল্লেন "জানেন তো ব্যবসাদারে মানুষ সময়ই নেই সেই সেই কোন ভোরে বেরিয়ে যান আর রাত্রে নটায় টাকা নিয়ে ফেরেন তা টাকা গুণতে গুণতেই ১২টা বেজে যায়। আচ্ছা আপনাদের রাস্তার ধারের ঘরটায় কে থাকেন?" বললাম—"আমাদের বাজার সরকার থাকে।" শুনে বললেন—"আমাদেরও সরকার আছে—তবে উনি নিজেই সব দেখা শোনা করেন—সরকার মশাই শুধু হিসেব লেখে।" তারপর একগাল হেঁসে বললেন—"যাই হোক আপনারা এলেন একজন কথা কইবার মত লোক পেলাম"। আমি অবাক হয়ে বললাম, কেন আপনার এদিকে ওদিকে তো অনেক বাড়ী আছে—। আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে গিন্নি বলেন—"আছে তো অনেকেই তারা কি আমাদের যুগ্যি? এই ধরুন রাস্তার ওপারে যাদের বাড়ী তাদের পয়সা থাকলে কি হবে—জাতে সোনারবেনে ওদের চাল চলনই আলাদা তারপর ধরুন ও পাশের বাড়ীর গিন্নি—আচার বড়ি করে আমা সেলাই করে বিক্রী করে সংসার চালায়—আমরা বাবা ওরকম ছোটো কাজ করে রোজগার করতে পারবো না, না খেয়ে মরি সেও ভালো—তারপরে ধরুন"—বলে আরম্ভ করতেই আমি "তাতো বটেই" বলে থামিয়ে দিই। মনে মনে ভাবি বাবা এ রকম টিকুজী কুষ্টি দেখে আলাপ করতে হলেই তো গেছি আর কি।

এমন সময় কর্ত্তা এলেন বিনয়ের অবতার—"হেঁ হেঁ আপনারা আমাদের বাড়ী পায়ের ধুলো দিয়েছেন এতো আমাদের পরম ভাগ্য হেঁ হেঁ—কি বলে?" গিন্নির দিকে চেয়ে—"এদের অলটেল কিছু দাওনি কি তুমি? জানো না এরা কত বড় বনেদী বংশের"—বলে আবার আমার দিকে চেয়ে "হেঁ হেঁ আপনাদের কে না চেনে কুসুমঘাটির রায়রা মস্ত বংশ—আমাদের সঙ্গে কুটুম্বিতাও আছে—কি বলে?" গিন্নির দিকে চেয়ে "বলনা গো? আমাদের কমলীর পিসশাশুড়ীর ভাসুর পো বৌ হলেন—কি বলে?" গিন্নি ঘরিয়ে দেন "কুসুম ঘাটির রায়দের দৌহিত্রী।" কর্ত্তা একগাল হেসে বলেন—"হেঁ হেঁ আমার আবার সম্পর্কগুলো সব সময় মনে থাকেনা।"

যাই হোক ভদ্রলোক মিষ্টিমুখ না করিয়ে ছাড়লেন না—জলযোগের উৎকৃষ্ট সন্দেশ এবং দামী কাপে ভালো চা খাওয়ালেন—এবং বার বার কিছুই যত্ন করতে পারলেন না বলে আক্ষেপ করতে লাগলেন—আমরা ওঁদের আমাদের বাড়ী মাঝে মাঝে যাবেন খোঁজ খবর নেবেন ইত্যাদি বলে বিদায় নিলাম।

পরদিন গেলাম—রাস্তার ওপারে সোনার বেনেদের বাড়ী এখানে আমি গেছি একজন কি সঙ্গে নিয়ে—প্রথমে সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই দেখি এক ভদ্রলোক (?) গামছা পরে উবু হয়ে বসে মুখ ধুচ্ছেন—দৃশ্যটি মোটেই মনোহর নয় লজ্জিত হয়ে দুচার ধাপ সিঁড়ি নেমে দাঁড়ালাম—ভদ্রলোক কিন্তু দেখলাম মোটেই লজ্জিত নন—সেখানে দাঁড়িয়েই

ডাকতে লাগলেন—"ক্যান্তি অ—ক্যান্তি!" নেপথ্যে সাড়া এলো "কি কন?" "তোমার বৌদিকে ডেকে দাও রায় বাবুদের বৌ এসেছেন।" আমরা দাঁড়িয়েই আছি। মিনিট পাঁচ দশ বাদে চলে যাবো কিনা ভাবছি এমন সময়—একটি শ্যামবর্ণ বৌ একগা গয়না পরে খালি পায়ে শান্তিপুরি শাড়ী পরে ছোতলার তার ঘরে নিয়ে বসালো। "আপনারাই বুঝি নতুন এলেন সানের বাড়ীতে?" আমাদের সব পরিচয় জিজ্ঞাসা করে যখন জানতে পারলো আমরা ব্রাহ্মণ তখন গলায় আঁচল দিয়ে এক প্রণাম—আমি ব্যস্ত হয়ে ওর হাতটা ধরে ফেললাম—"একি ভাই বন্ধুর ঘরে আবার জাত কি হবে? বন্ধু বন্ধু সব সমান।'

তারপর বউটি বললো আপনার সঙ্গে কদিন ধরেই আলাপ করবো ভাবছি। উনি বললেন, কি জানি বড়লোক আলাপ করবেন কিনা—তাছাড়া তাই আমার শ্বশুর কারুর বাড়ী যাওয়া পছন্দ করেন না। তারপর একটু থেমে বললো "কাল চৌধুরী বাড়ী গিছলেন বুঝি?" আমি বললাম "হ্যাঁ ভাই নতুন এলাম পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে রাখা ভালো কি বলুন?" বউটি "সেতো বটেই" বলে সমর্থন করলো—তারপর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললো "আমি তো ভাই একলা একলা হাঁফিয়ে উঠছি।" এর মুখেও চৌধুরী গিন্নির পুনরুক্তি শুনে আশ্চর্য্য হলাম—বললাম "কেন ভাই কারুর বাড়ী গেলে যদি আপনার শ্বশুর রাগ করেন এখানে তো দেখি সব গায়ে গায়ে বাড়ী—জানলা দিয়ে বারান্দা থেকে তো অনায়াসেই বেশ গল্প করা যায়।" তাতে বউটি বললো "তাতে যায় তাই কিন্তু আলাপ করবো করে সঙ্গে বলুন? এখন আপনি এলেন বাঁচলুম—একজন কথা কইবার মত লোক পেলুম—"শুনে আরও অবাক হয়ে যাই" কেন? আশে পাশে তো অনেকেই আছেন "তাতে বউটি একটু মুচকি হেসে বললেন" কিন্তু আশে পাশে যারা আছেন তারা তো আমাদের সমশ্রেণি নয়। মনে করুন ঐ চৌধুরীরা ওদের বাজারে মনিহারী দোকান তা আপনিই বলুন দোকানদারের বৌয়ের সঙ্গে আমি আলাপ করতে পারি না। মনে করুন আমার শ্বশুর বীরভূমের···কুন্তলা গ্রামের নাম শুনেছেন? সেখানকার পঞ্চায়েতের মোড়ল আমাদের পঁচিশ বিঘে ধানী জমী বাদেখানা লাঙ্গল ও আটটা বলদ আছে। আর উনিও তো যার তার সঙ্গে আলাপ করতে পারেন না কলকাতায় যে সবচেয়ে বড় অফিস আছেনা? রাইটার্স বিল্ডিং না কি বলে উনি সেখানকার হেড ক্লার্ক—কত সম্মান।" আমি যথা রীতি 'তাতো বটেই' বলে সায় দিলাম।

মনে মনে ভাবলাম মহা মুস্কিল আমি তাহলে কার সঙ্গে আলাপ করি? আমার কিন্তু দুজনেই আলাপের যোগ্য মনে করেন। মনিহারী দোকানের মালিক নন্দীবাবুরাও ব্রাহ্মণ আমরাও ব্রাহ্মণ আর সোনার বেনে ভদ্রলোকের দেশে জমিজমা আছে এবং বড় অফিসের হেড ক্লার্ক—আমাদেরও দেশে জমিদারী আছে—আর আমার স্বামী ঐ অফিসেরই উচ্চপদে অধিষ্ঠান করেন—যথেষ্ট মিল আছে সন্দেহ নেই।

অন্তরালে

শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহ

মনের খবর একটা এমনই গোপন বস্তু যে তার ইয়ত্তা পাওয়া ভার। মনের গভীরে যে সব কথা লুকিয়ে থাকে, তার যেটুকু সে প্রকাশ করে, সেইটুকু নিয়েই আমাদের চলতে হয় সংসারের পথে। এই পথ চলা অনেক সময় চমকে দেয়—থামিয়ে দেয় মনের গোপনে লুকিয়ে থাকা কথার হঠাৎ প্রকাশে, তা সে ইঙ্গিতেই হোক আর প্রকাশ্যেই হোক। কিন্তু এই চমকে যাওয়া বা থেমে যাওয়াতে আনন্দ নেই। চলার পথের আনন্দকে পেতে হলে, চলতেই হবে, থামলে চলবে না, চমকালেও চলবে না, এটা অবশ্য আমার নিজের মত।

স্বপ্নাকে নিয়ে চলেছি দেওঘর। পূজার ছুটিটা কাটবে ভাল। অবশ্যই মধুচন্দ্র করার সময় অতীত হয়েছে চার বছর। বিয়ের পর এই চার বছর স্বপ্নাকে নিয়ে স্বপ্নের মতই কাটছে আমার।

• • •

কলকাতার যে অঞ্চলে থাকি, তা আর প্রকাশ না-ই বা করলাম। তবে অঞ্চলটা সৌখীন তাতে ভুল নেই। কাটছিল বেশ। এটর্নী সেরেস্তার একজন পার্টনার হিসাবে দু'পয়সা পেয়ে থাকি,—এটা বলবার তাৎপর্য্য শুধু এইটুকু যে, স্বপ্নার স্বপ্নরাজ্যের চাহিদা যোগান দিতে কষ্ট হয়নি কোন দিনই।

ওয়ালটেয়ার, দার্জিলিং-কালিম্পং, রামেশ্বর কিংবা হরিদ্বার-মথুরা বছর বছর ছুটির ভ্রমণে কাটালেও দেওঘর কখনো যাইনি। অথচ স্বপ্নার জন্ম আর বাল্য কেটেছে ঐ দেওঘরেই।

স্বপ্নাকে বলি—আচ্ছা, জন্মভিটার দিকে তো মানুষের একটা বিশেষ আকর্ষণ থেকেই থাকে। আর তুমি কেন যেতে চাও না দেওঘরে?

স্বপ্না একমুখ হেসে উত্তর দেয়—সে একটা জাড়াটে বাড়ীতে জন্মেছিলাম। তার আবার হয়ত কি? নিজেদের ভিটে হলে বরং টান থাকত। বিশ্রী লাগে আমার ওই পাশাপাড়া আর দীনাবাজার।

—তা ওই বিশ্রী জায়গায় জীবনের প্রথম পনের ষোল বছর তো কাটিয়েছ। তাতেও জায়গাটা তোমার মনকে বাঁধতে পারেনি, আশ্চর্য্য!

একটা চাপা নিঃশ্বাস, লক্ষ্য করেছি, বেরিয়ে আসে স্বপ্নার বুক থেকে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—নাঃ, বাঁধতে আর পারল কই? জন্মভিটের ওপর একটা টান তো থাকাই উচিত ছিল। কিন্তু আমার ও দেশটা, কি জানি কেন ভালই লাগে না।

প্রসঙ্গ থেমে যায়। অন্য কথা এসে পড়ে। কবি ইলিয়টের বাস্তব জীবনদর্শন আর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রেমের বৈঠকী আলোচনায় ভুলিয়ে দেয় দেওঘর-বনীদি, মধুপুর।

• •

নিজেই ড্রাইভিং ধরে স্বপ্না গিয়েছে মার্কেটিং করতে রোজই যায়। ওটা ওর একটা বিলাস। কপি, সীম, লাউ কিংবা চিংড়ী, পাবদা, ভিম—ওসব ওর নিজে না দেখে চলে না, পছন্দ হয় না। আমার আনন্দ যে সংসারের কথা আমাকে ভাবতেই দেয় না স্বপ্না। আমার প্রয়োজন যা কিছু, চাইবার আগেই কেমন করে সে গুছিয়ে রাখে, আমিই অবাক হয়ে যাই। মনে মনে আমার মনটাকে ও ম্যাগনিফায়িং গ্লাস দিয়ে ভাল ভাল করে দেখে রেখেছে। শুধু কি তাই! নিজেকে এমন করে প্রাণ খুলে বিলিয়ে দিতে পারা—এ বুঝি ওই স্বপ্নার পক্ষেই সম্ভব।

একটা চেয়ারে বসে সামনে এক কাপ কফি রেখে মনে মনে ভাবি: আমি যেন একটি মহীরুহ, আর স্বপ্না যেন তাতে জড়িয়ে উঠেছে একটা মাধবীলতা। চমৎকার! কফির পেয়ালা তুলে নিয়ে চুমুক দিই। হঠাৎ মনটা হ্যাৎ করে ওঠে। কিন্তু নির্ভরশীলা ওই মাধবীলতা ছাড়া আর

কি কোন লতা কোনদিন এই বনীরুহকে জড়িয়ে ধরেনি? কেন? ঝিরঝিরে ক্ষীণজীবি পাতায় ভরা টুকটুকে ফুল ফুটিয়ে তরুলতাও তো একদিন— কিন্তু সে তো অনেক দিনের কথা। সে লতা আজ আর নেই। তবু তার কথা তো জানে না মাধবী। মাধবীলতা ভাবে— আমিই প্রথম এলাম এই সবল আশ্রয়কে জড়িয়ে।

আর এক চুমুক কফি গিলে ফেলে হেসে উঠি মনে মনে—স্বপ্নার ম্যাগনিফায়িং গ্লাস এখানে কেল করেছে।

• •

একগোছা চিঠি দিয়ে গেল পিওন, ডাকের চিঠি। একে একে দেখতে থাকি। একখানা খামে স্বপ্নার নাম, স্বপ্নার চিঠি। কে দিল? খামের উপরে পোষ্টাফিসের সীল-মোহর—'বৈদ্যনাথধাম'। অ্যাঁ, দেওঘর। কখনো তো আসে না কোন চিঠি দেওঘর হতে। ওর দাদারা আজ পাঁচ-ছয় বছর কলকাতায়; সেখানকার সম্বন্ধ তো আর রাখে না তারা। বোধ হয় কোন বান্ধবীর লেখা।

চুরি করার ইচ্ছেয় মনটা দুলে উঠলো। স্বপ্না আমার, আমি স্বপ্নার। খুলতে দোষ কি? খুলে ফেলি পত্র।—

"প্রণাম জানাই,

দিদি, তুমি আমায় চিনতে পারবে না। চেনা দিচ্ছি, শোন। আমায় বিবাহ করেছেন মধুবাবু। আমায় তিনি খুব ভালবাসেন। সব কথা আমায় বলেছেন তিনি। তুমিই যে তাঁর প্রথম জীবনের আনন্দ, সে কথাও বলেছেন। আমার তাতে একটুও দুঃখ নেই। কেননা, তখন তো আমি ছিলাম না। তুমি ছিলে আর ছিলেন উনি। থাক সে কথা। স্বামীর খুব অসুখ। ভগবান করুন তিনি বেঁচে উঠুন কিন্তু বিকারের মধ্যে মাঝে মাঝে তোমার নাম করছেন। তাই এই পত্র দিচ্ছি। একবার আসতে পারবে না, দিদি? তোমায় দেখে হয়ত মন ভাল হলে রোগও সারতে পারে আমার অনুরোধ— একবার এস! আমার প্রণাম নাও দিদি। ইতি—

ছোট বোন 'সুধা'

অনেকক্ষণ ভাবতে থাকি। দুঃখ হয় না, রাগও হয় না। মনে হয় এতো স্বাভাবিক। কুড়ি বৎসর বয়স পর্য্যন্তের খবরে আমার কি অধিকার? আমি যেদিন তাকে পেয়েছি, সেইদিন হতে আমার কাছে তার জীবনের আরম্ভ। আমাকে ঘিরে তার নব পরিচয়ের নূতন দিক বুঝতে পারি তার দেওঘর না যেতে চাওয়ার দিকটা

প্রায় ফুড়িয়ে যাওয়া কফিটুকু এক চুমুকে শেষ করার আগে চিঠিটা পকেটে পুরে ফেলি।

• •

হর্ণ বেজে ওঠে। বেবী অষ্টিনটা চোকে গেটের পাশে দাঁড়ায়ে। হাসিমুখে এগিয়ে আসে স্বপ্না।

—দেখ, দেখ কি চমৎকার বড় বড় কাঁকড়া।

—চমৎকার ওগুলো নিয়ে থাক তজুয়া। তুমি বস। স্বপ্না বসে।

আমি হাসিমুখে বলি—দেখ একটা চিঠি পেলাম বিশেষ কাজে দেওঘর যেতে হবে।

—অ্যাঁ, কবে?

—আজই। তোমাকেও সঙ্গে যেতে হবে

—কেন?

—তুমি গেলে হয়তো তিনি বাঁচতে পারেন।

—কে বাঁচতে পারেন?

—মধুবাবু। খুব অসুখ। চিঠি দিয়েছেন তাঁর স্ত্রী।

হঠাৎ একটা কালো মেঘ স্বপ্নাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। সে চোখ তুলে তাকাতে পারে না।

আমি হো হো করে হেসে সেই কালো মেঘখানা সরিয়ে দিতে চেষ্টা করে, তাকে জড়িয়ে ধরে বলি—

স্বপ্না, আমি একটুও বিচলিত হইনি। তুমিও হবে না নিশ্চয়ই। কেননা, এটা কিছুতেই ভুলবো না যে কুড়ি বছর বয়স পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে আমার হয়নি পরিচয়। আর সে সময় পর্য্যন্ত তোমার যে একটা সত্তা ছিল, অস্তিত্ব ছিল, সেটাতে তো কোন ভুল নেই। তাতে প্রাণ ছিল, প্রেম ছিল, ভালবাসাও ছিল। এ কথা অস্বীকার করব কেমন করে। তোমাকে নিয়ে আমায় আজই দেওঘর যেতে হবে। তোমার যে প্রিয় তাকে আমারও দেখা উচিত বৈ কি স্বপ্না।

———

সাহিত্যে শাশ্বত ত্রয়ী ও শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ

শ্রীউপতী চট্টোপাধ্যায়, বি-এ, (অনার্স)

সাহিত্য জীবন দর্পণ বলিলেও বিশেষত্বহীন যাওয়া আসা হাসির কাহিনীর প্রতিফলনে সার্থক সাহিত্য হয় না প্রত্যেক মানুষের জীবনে এমন অনেক কিছু ঘটন হয় যাহা তাহার আপন অন্তরে নাড়া দেওয়ার সীমা ছাড়াইয়া বৃহত্তর গোষ্ঠীর হৃদয়ে আসন পাতিবার যোগ্যতার দাবী রাখিতে পারে এই ক্ষুদ্র ঘটনা ছোটগল্প বা Lyricকবিতার অবলম্বন হইয়া সাহিত্যে স্থান লইতে পারে কিন্তু অপেক্ষাকৃত বড় কাব্যে—যেখানে জীবনের সুরু হইতে সারা দেখানো হয় সেখানে এমন জীবন গড়িতে হয় যাহার দ্বারা জীবনেই এই বৃহত্তর গোষ্ঠীর হৃদয় গ্রাহিতার ক্ষমতা আছে, আছে গতি। নায়ক নায়িকার অন্তরের দ্বন্দ্বেই আসে গতি শীলতা। নায়ক নায়িকার মিলন বা দ্বন্দ্বের কোনও এক প্রকার মিমাংসা হইলেই উপন্যাসের আর প্রয়োজনীয়তা থাকে না। এই মিমাংসাকে দূরে সরাইয়া রাখিবার জন্য দুইটি চরিত্রের মধ্যে একটি তৃতীয় চরিত্রের অবতারণা করা হয় তাহার প্রভাবে প্রথমোক্ত চরিত্র দুইটির কোনও একটি প্রভাবিত হয়। সুখনিশ্চল মিলনে যাহা দিয়াছে আনে গতি। এই ত্রয়ী লইয়াই গড়িয়া উঠে সাহিত্য। কোনও বিশেষ সাহিত্য নহে পৃথিবীর সকল সাহিত্যেই এই এয়ীর খেলা।

ভ্রমর রোহিণী গোবিন্দলালের দ্বন্দ্বেই কৃষ্ণকান্তের উইল। ভ্রমর ও গোবিন্দলালের শান্ত জীবন বর্ণনায় উপন্যাস লেখা যাইত না। বড় জোর এক পরিচ্ছেদ বর্ণনার উপযোগী হওয়া ছাড়া কোনও বৃহৎ আলোড়ন সৃষ্টি কারী ক্ষমতাই তাহার নাই। আবার গোবিন্দলাল ও রোহিণীর সম্পর্ক এমন জটিল হইয়া উঠিত না ভ্রমরের অস্তিত্ব ব্যতীত—প্রায় সকল সাহিত্যেই এই এয়ীর খেলা। কিন্তু এয়ীর খেলায় প্রত্যেকটি চরিত্র সমভাবে সার্থক হইয়া উঠেনা সকল ক্ষেত্রে অনেক সময় সমগ্র উপন্যাসে তিনজনের সমান গতিবিধি বা দায়ীত্ব থাকে। যেমন চোখের বালি উপন্যাস প্রথমদিকে বিহারীর কোনও স্থানই নাই না ঘটনার বহিরাঙ্গে না বিনোদিনীর মনে কিন্তু গৃহদাহ উপন্যাসে এই এয়ীর সার্থক সমতা দেখা যায়। অচলা মহিম ও সুরেশ উপন্যাসের সুরু হইতে তিলার্দ্ধ দূরে থাকিতে পারে নাই।

সুরেশ মহিমকে ব্রাহ্ম মহিলার হাত হইতে উদ্ধার করিতে আসিয়া আপনি ধরা পড়িল আপন চরিত্রের বিরূপতায়। যে উগ্র আবেগময় ভালবাসার ভার মহিমের প্রতি সীমাহীন কর্ত্তব্যের অনুভব তাহাই পথ পরিবর্ত্তন করিল আপনি অন্তরের দুর্নিবার গতি ও অচলার পিতার বিষয়বুদ্ধির মিলনে তাহার অচলার সহিত ঘনিষ্ঠতা সুরু হইল। ঠিক যেদিন অচলার আচরণে পিতার আবেশে ভদ্রতার সহিত কিছু আন্তরিকতার প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যাইল তখনই পথপ্রান্তে মহিম আসিয়া দেখা দিল। আবার সুরেশের কর্ত্তৃত্ব শিথিল হইয়া গেল। মহিম ও অচলার বিবাহ হইয়া গেল। অচলা আসিল রাজপুর গ্রামে। অচলার অনভ্যস্ত গ্রাম্য জীবনকে গ্রহণ করা তখনও সম্ভব হইয়া উঠে নাই। এই সংগ্রাম গ্লানির ভস্ম যখন প্রচুর উদ্গীর্ণ হইতেছে তখনই আসিল সুরেশ। নূতন জীবনে আপনাকে খাপ খাওয়াইতে যে সামন্ত্রিক ক্ষোভ, পুরাতন অভ্যাসে যে টান ধরা কালের হস্তে সহজেই ছাড়িয়া যাইত তাহাতে বাধ সাধিল সুরেশের আগমন। ঘরে তালাচাবি দিয়া মন ফিরাইবার নীতি যতই অবাঞ্ছনীয় হউক না কেন উত্তেজিত অবস্থাকে সাময়িক বন্ধনে কিছুটা স্থির হইবার সুযোগ দিলে অনেক ক্ষেত্রেই সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা। সুরেশের আগমনে তাহা হইল না। অচলা সুরেশের সহিত চলিয়া গেল। আবার মহিমকে ফিরিয়া পাইল সেবার মধ্য দিয়া। যে মহিম আপন দুশ্ছেদ্য আবরণে আপনি চির আবৃত সে যেদিন বলিল অচলার কাছে তাহার চাওয়ার অনেক আছে। দুজনের মধ্যে কুয়াশা ফিকা হইয়া আসিল তৎক্ষণাৎ তাহার মধ্যে আসিয়া দাড়ায় সুরেশ ধূমকেতুর মত। কার জন্য সে কথা এখানে

অবান্তর কিন্তু তাহার আগমনে প্রলয় ঘটিল। তাহার তমসা অচলার জীবনকে সীমাহীন অন্ধকারের দিকে ঠেলিয়া দিল। চলিল এক বোঝা স্বরূপ জীবন বহিয়া যাহার তিক্ততার ভার এবার কেবল অচলার জীবনে নহে সুরেশের প্রবল প্রাণাবেগে বৈরাগ্যের জড়তা আনিয়া দিল। এই বোঝা বহিয়া চলিতেছিল দুইজন ইহাতে আনন্দ ছিল না তবে বাহ্যিক সম্ভ্রমটুকু বাঁচিয়া ছিল। বাস্তব জগতে ইহার মূল্য কম নহে বলে হইতেছিল বাকি জীবনটি কাটিবে নিশ্চল হতাশায়। এমন সময় সহসা উষর হইল মুহিম অভাবনীয় পথে। বাহ্য সম্ভ্রমের আবরণটুকুও রহিল না। সুরেশ লইল চির বিদায়—সীমাহীন শুষ্ক নিরালার নিবিড় অন্ধকারে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটিল। সে তমসায় তিনটি চরিত্রই সমভাবে লিপ্ত। উপন্যাসের গতি ও পরিণতির দিক দিয়া তিনটি চরিত্রের নিয়ন্ত্রনাধিকার অস্তিত্ব ও ক্রীয়াশীলিতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে এবং ঘটনা বিপর্য্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষণে যুগযুগ উপন্যাস শাশ্বত ক্রীয়ার সার্থক প্রকাশ দেখা যায়।

রাণীক্ষেত

শ্রীদুর্গাবতী ঘোষ

পাহাড় বনে ঘেরা নামটি রাণীক্ষেত,
আসতে পার আপেল খাবার থাকলে অভিপ্রেত।
লাল টুকটুক মনোহরা সুগন্ধে মন মাতে,
হাঁকছে পথে ফেরিওয়ালা ওজন-বাঁড়ি হাতে।
সুবাসে আকুল হয়ে ভ্রমর মধু মাছি,
কাঁকার সাথে পাহাড়-পথে উঠছে নাচি নাচি।

নাই যে হেথায় জলের কল ইলেকট্রিসিটি আলো,
সন্ধ্যা হলেই কেরোসিনের বাতি ঘরে জ্বালো।
নাইকো হেথায় ঘোড়ায় গাড়ী মোটর কিংবা ট্রাম,
মিলবে না তাই রিক্সাগাড়ী, মানুষ বওয়া কাম।
চলতি বাসের পাবে দেখা পথ চলতে গিয়ে,
চড়লে তাতে যাবে তোমায় অনেক দূরে নিয়ে।
খুচ্‌ পয়সার পোড়া বিড়ি ছড়িয়ে আছে তাতে,
উঠতে গেলেই চটাং করে লেগে যাবে হাতে।

ঝিঁঝি ডাকে দিনে রাতে পাহাড় বনের মাঝে
সর্‌ সর্‌ সর্‌ আওয়াজ ওঠে হাওয়ায় পাইন গাছে।
বাঁদরের দল হুড়মুড়িয়ে এ-গাছ সে-গাছ করে,
সব জিনিষই লক্ষ্য করি বসে কোণের ঘরে।
সকেতিয়া বাঁশি বাজে তোর হল রে ওঠ—
এ পাহাড়ের আস্তানা ছাড়্‌ ও পাহাড়ে ছোট্‌।
সৈন্যদলে যায় রে চলে ছাউনি ঘরের দিকে,
জুতোর সাড়া পাই যে তাদের অনেক দূরের থেকে।
বনের ভিতর গভীর রাতে নাম-না-জানা পাখি,
একই সুরে খোঁজে কারে? চেঁচায় থাকি থাকি।
আঁধার রাতে নেকড়ে বাঘ পথের মাঝে চলে,
দেখলে শিকার আহ্লাদে তার চক্ষুদুটি জ্বলে।

কাউ-এর পাখি আছে ঢেকে উত্তরের দিক,
'নন্দাদেবী' 'ত্রিশূল' 'কামেট' পিছে আছে ঠিক।
গায়ে তাদের তুষার পোষাক দেখতে যদি চাও
দেড়টি মাইল এখান হতে পোষ্টাপিসে যাও।
দেখবে তুমি লম্বা সারি দাঁড়িয়ে আছে তারা।
আনন্দে মন উঠবে ভরে হবে আপন হারা।
সেইখানেতেই বক্সীনাথ আছেন আসন পেতে,
অনেক দিনের পুণ্য জমা থাকলে পাবে যেতে।

সুবোধবালা ঘোষ স্মরণে

শ্রীজিতেন্দ্র লাল ঘোষ

প্রায় ২৭ বৎসর পূর্ব্বের কথা। নারী-সমাজের উন্নতির সঙ্কল্প নিয়ে সরোজ নলিনীসমিতি কাজে ব্রতী হয়েছে। দেশের অনেক গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের কাজে অনুপ্রেরণা ও সক্রিয় সহযোগিতা করতে এগিয়ে এসেছেন। শ্রদ্ধেয়া বড়মা শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুর তখন সরোজ নলিনী প্রতিষ্ঠানের লেডী সেক্রেটারী। তাঁর নিকট এলেন ২৮।৩০ বৎসরের মধ্যবিত্ত ঘরের এক হিন্দু বিধবা; শিক্ষা অতি সামান্য, জ্ঞানও সীমাবদ্ধ। বড়মার নিকট বিধবাটী চাইলেন কাজ।

যাঁর শিক্ষা নেই, নেই কর্ম্মের কোন অভিজ্ঞতা, তাঁকে বড়মা কি কাজে নিয়োগ করতে পারেন? তাঁকে প্রত্যাখ্যান করাও ত সম্ভব নয়। নারী জানে নারীর অন্তরের ক্ষতের সন্ধান আর নারীই দিতে পারে সেই ক্ষতে শান্তির প্রলেপ।

অকাল-বৈধব্য যাঁর সংসার বন্ধন-ছিন্ন করে দিয়েছে তিনি চাইছেন কর্ম্মের বন্ধনে যাঁরা পড়তে। তাঁকে ত প্রত্যাখ্যান করা যায় না। বড়মাও তাঁকে প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। বড়মা বিধবাটীকে কর্ম্মের আশ্বাস দিলেন আর সেই সাথে দিলেন উপদেশ—আদর্শ কর্ম্মী হবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণের। সেই সময় থেকে শুরু হয় তাঁর শিক্ষালাভের সাধনা, যে সাধনার ফলে সমাজ-নীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি সকল ক্ষেত্রেই জ্ঞানে তিনি গভীর জ্ঞানার্জ্জন করতে পেরেছিলেন।

এই বিধবাটীই হচ্ছেন সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির মহিলা কর্ম্মী স্বর্গতাঃ সুবোধবালা ঘোষ, যিনি ২৬ বৎসর কাল নারী সমাজের সেবা করে গত ১৯শে মার্চ্চ (১৯৫৯) তারিখে পরলোক গমন করেন।

মহিলা সমিতি সংগঠন ও পরিচালন করাই ছিল তাঁর প্রধান কাজ। এ কাজ আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে করে গেছেন। এ কাজ তিনি শুধু কাজ হিসেবেই গ্রহণ করেন নি—এ কাজের ভিতর ছিল তাঁর মাতৃ-হৃদয়ের স্পর্শ।

মাতৃত্ব নারী ধর্ম্ম। নারী আর সব কিছু হারাতে পারে, কিন্তু মাতৃত্ব হারাতে পারে না। মাতৃহৃদয়ের দরদ দিয়ে তিনি মহিলা সমিতিকে দেখে গেছেন। সমিতির উন্নতিতে তিনি গর্ব্ববোধ করেছেন, অবনতিতে দুঃখ পেয়েছেন। বাৎসরিক উৎসব বা অন্য কোন উপলক্ষে মহিলা সমিতির প্রতিনিধিরা যখন কেন্দ্র-সমিতিতে এসেছেন তখন সুবোধ বালা ঘোষ উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন, যেন তাঁর নিজের মেয়েরাই এসেছে উৎসব উপলক্ষে তাঁর গৃহে।

দুঃখী জানে দুঃখীর মনের গোপন ব্যথা। সুবোধবালা ঘোষের জীবন ছিল বাল-বিধবার অভিশপ্ত জীবন। তাই বিধবা ছাত্রী কাউকে দেখলেই তাঁর অন্তর কেঁদে উঠত। অসহায় বিধবাদের শিক্ষার জন্য তিনি তাঁর সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন এবং শিক্ষান্তে তাদেরকে কাজে নিয়োগ না করতে পারা পর্য্যন্ত মনে শান্তি পেতেন না। তাঁর চেষ্টায় অনেক বিধবাই যোগ্য কাজে নিযুক্ত রয়েছে। বিধাতা তাঁকে 'মা' হতে দেন নি, কিন্তু তাঁর স্নেহ-ধন্য মেয়েরা তাঁকে অধিষ্ঠিত করেছিল "মাসীমার" আসনে। "ঘোষ মাসীমার" মৃত্যু মাতৃহারার বেদনার মত সকলের অন্তরে বিঁধেছিল। আজও মনে পড়ে সে দৃশ্য! শুভ্র বস্ত্রে আচ্ছাদিত শায়িত তাঁর প্রাণহীন দেহ। মেয়েরা আসছে দলে দলে, চক্ষে অশ্রুধারা। কৃতাঞ্জলিপুটে নত মস্তকে জানাচ্ছে তারা মৃতার প্রতি তাদের শ্রদ্ধার শেষ নিবেদন। তাদের নির্ম্মল অশ্রুধারায় অবগাহিত হচ্ছে তাদের প্রিয় "ঘোষ মাসীমার" প্রাণহীন দেহ।

সরোজনলিনী প্রতিষ্ঠানের পুরাণো কর্ম্মী হিসেবে যাঁদের এ পর্য্যন্ত দেখেছি তাঁদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধার সঙ্গে একটি

বিষয় উল্লেখ করতে হয় যে, কাজ করতে এসে প্রতিষ্ঠানের অন্তরাত্মার সাথে অলক্ষ্যে তাঁদের অন্তরের নিবিড় যোগ-স্থাপন হয়ে গেছে। প্রতিষ্ঠানের স্বার্থই তাঁদের নিকট মুখ্য, ব্যক্তিগত স্বার্থ গৌণ। সুবোধবালা ঘোষের তিরোধানেও এ প্রকৃতিটি দেখা গেছে। তিনি প্রতিষ্ঠানের এক কক্ষে বাস করতেন। প্রতিষ্ঠানের বাড়ী, বৃক্ষ-লতা, ধূলিকণা পর্য্যন্ত তাঁর অতি প্রিয় ছিল। কর্ম্মী, ছাত্রী সকলের প্রতি ছিল তাঁর সজাগ স্নেহ দৃষ্টি। বিপদাপদে পাশে দাঁড়িয়েছেন করুণার দৃষ্টি মিয়ে, ভ্রূকুটিবিচ্ছুরিতে উদ্যত করেছেন রোষকষায়িত নেত্র। গাছের একটি পাতা, ফুলের একটি পাঁপড়ি কেউ যদি ছিড়তো তাহলে তিনি অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করতেন। তাঁকে এ সম্বন্ধে বিদ্রূপ ঠাট্টাও করেছি। কিন্তু আজ মর্ম্মে মর্ম্মেই উপলব্ধি করছি যে, তাঁর অন্তরে প্রতিটি জিনিষের প্রতি যে অকৃত্রিম স্নেহ লক্ষিত ছিল, তা তখন বুঝিনি।

অন্তের পীড়ায় সুবোধবালা ঘোষ দীর্ঘদিন যাবৎ ভুগছিলেন। তাঁর বিশেষ আশঙ্কা হয়েছিল শেষ বয়সে বুঝি তাঁকে কারো গলগ্রহ হতে হবে। এ চিন্তায় মাঝে মাঝে তাঁকে ভেঙে পড়তে দেখেছি। পীড়া হেতু তাঁর স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়ছিল। সংসার-জীবন হতে আসাহত হয়ে সরোজনলিনী প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মধারায় তাঁর জীবনের গতি প্রবিত করে দিয়েছিল। এ প্রতিষ্ঠান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াও তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে ভীষণ আঘাতের কারণ হত। সে দিক থেকেও তাঁর মুখে চিন্তার বজ্ররেখা প্রকাশ পেত। অন্তর্যামী তাঁর অন্তরের কামনা বোধ করি অলক্ষ্যে শুনলেন। কারো গলগ্রহ তাকে হতে হল না, প্রিয় প্রতিষ্ঠান ছেড়ে যাওয়ার মর্ম্মবেদনাও ভোগ করতে হল না, প্রতিষ্ঠানের ভিতরে নিজ শয্যায় একপ্রকার সুস্থ দেহেই ভগবান তাঁকে তুলে নিলেন। মৃত্যু অন্ধকারে পদবিক্ষেপ যে নয়, মৃত্যু যে মুক্তির দ্বার স্বরূপ তা সুবোধবালা ঘোষের মৃত্যু থেকে বুঝতে পারা যায়। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

আশাদির মহিলা সমিতি

শ্রীঅন্নপূর্ণা রায়

আশাদির অনেক দিন থেকেই মনের মধ্যে সাধছিল যে একটা কিছু মেয়েদের জন্য কর্ব্বেন। কিন্তু তা আর তাঁর জীবনের এতগুলি বছরের মধ্যে ঘটে ওঠেনি। নানা বাধা পান উৎসাহ পান না। যাদের জন্য কর্ব্বেন প্রথমটা তারা শুনে খুবই লম্ফ ঝম্ফ করেন, কিন্তু তারপর? তারপর আর কোন কাজে তাদের উৎসাহ নেই। তাঁরা মুখে অবশ্য বলেন যে, করুন না দিদি! বেশ হয় তাহলে। কিন্তু এগিয়ে কেউ আসেন না। কারও কোনরূপ উৎসাহ পর্য্যন্ত দেখা যায় না। আশাদি দুপুরে বিশ্রামটুকু পর্য্যন্ত না নিয়ে, একলাই, একটা রিকসা ভাড়া করে বাড়ী, বাড়ী, বলে এলেন যে, তোমরা কাল বেলা ১১০ নাগাদ আমার বাড়ীতে সবাই জড় হবে, একটা মিটিং ডাকা হবে। আমার একজন বান্ধবী খুব শিক্ষিতা এবং তিনি সাহিত্যিকা নামেও খ্যাত, এসেছেন তোমাদের মাঝে। তোমাদের উপকারের জন্য কিছু বলতে চান। তাই তোমরা যাবে ও একটু মন দিয়ে শুনবে। এইভাবে রোদে রোদে ঘুরে গ্রীষ্মের প্রবল গরম, হরদম ঘামের ধারায় ঘামে ভিজেও, আশাদির কর্ম্মের উৎসাহের অন্ত নাই! মহিলা সমিতি একটা গঠন কর্ব্বেন স্থির সংকল্প তাঁর।

আশাদির স্বামী উপার্জ্জন ভালই করেন। সংসারে অভাব অনটন ও নাই, আছে যথেষ্ট পূর্ণ কৃপা দৃষ্টি! লোকজন গাড়ী বাড়ী পুত্র, পুত্রবধূ সবাই আছে তাঁর তবু তিনি সুখী নন্! একটু কাজ না করে ঘরে বসে আছি আজ কাল করে দিনে! তাঁর নিজের মনই অশান্তি যুক্ত সেজন্য। বেচারী আশাদি! আমি তাঁর প্রতিবেশী। তাঁকে বলি, আচ্ছা দিদি কেন

এত কনফাটে থাকা? তিনি তা বুঝতেন ওঁকে কত বারই বলেছি, আছা আশাদি কি প্রয়োজন এ ভাবে অর্থ ব্যয় করার? এভাবে নিজের অর্থব্যয় করে কি কেউ সমিতি গঠন করেছে? তাও যদি মেয়েদের উৎসাহ থাকতো, কই উৎসাহ তাদের? কিন্তু তিনি বেশ অভিজ্ঞের মতনই ঘাড় নেড়ে বলেন নারে মণিকা প্রথমটাতে উৎসাহ আসে না, পরে পরে সব ঠিক হয়ে যাবে দেখিস্; মহৎ কার্য্যের ও বিনাশ নেই, ঠিকই হবে। এই দেখ না, আমাদের বাপুজী, তিনিও ভারতবর্ষকে স্বাধীন করলেন! হায়, গান্ধিজীর দেশ স্বাধীন করার সঙ্গে একটা মহিলা টাউন এ, মেয়েদের সমিতির পার্থক্যটা কে তাকে বোঝাবে! তিনি তাঁর সমিতির কাজে সর্ব্বদাই ভাবে বিভোর। অবশ্য আশাদির বলে আসাটা সার্থক হল। বিকালের দিকে মেয়েরা সব তাঁর বাটীতে জড় হন। তবে যতটা তিনি আশা করেছিলেন তাও হচ্ছে না মণিকা একটী গাড়ী নিয়ে যা তাই শিগ্‌গির বাড়ী, বাড়ী, ওদের ডেকে আন তাই। ওরা কি অত বোঝে? পুরুষরা যে ওদের সে স্বাধীনতা দেয়নি। কটা মেয়ে আর পেয়েছে সে স্বাধীনতা, বলনা মণিকা? অধিকাংশ মেয়ে ত সাধারণের পর্য্যায়! কটা এম-এ, বি-এ, হন! আমরা ত মাকামারিতেই ভুবে গেলাম, মণিকা। মণিকা মনে মনে আশ্চর্য্য হয়, কিন্তু মুখে বলতে পারে না, কারণ আশাদির কাছে সে নিজে বহু উপকৃত। আশাদি বলেন, মেয়েরা যে চিরদিন পরাধীন হয়েই আছে, পশু হয়ে আছে, বন্দিনী জীবনই যেন তাদের আধা বেচারা!

কিন্তু যে বেচারাদের জন্য আশাদির এত আক্ষেপ, তারা কিন্তু তা ভাবে না। এটা যে তাদের জীবন যাত্রার একটী অঙ্গ এ তারা বেশ জানে। যাই হোক কয়েকটী মেয়ে জড় হল আশাদির সুসজ্জিত হলে কোলে ছোট ছেলে নিয়ে নাকে পোঁটা পড়া, কারও অতি দুর্গন্ধযুক্ত আসা, একপা ধুলা নিয়ে সব বসলেন দামী গালিচার উপর পাদুটী তুলে, আরাম করেই বসেন সব। এটাওটা প্রশ্ন বাণেও আশাদির প্রাণ ওষ্ঠাগত। কিন্তু তিনি যে দেশের কাজে নেমেছেন। বিরক্তি প্রকাশ ত তাঁর সাজে না! তিনি যে, দেশের মাকে একটা মেয়েদের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন! তাদের শিক্ষা দেবেন স্বাবলম্বি করে তুলবেন, এ যেন তাঁর স্বপ্ন চির দিনের। কিন্তু সত্যকার প্রাণ দিয়ে মন দিয়ে শোনে কয় জন?

আরতি সেন শিক্ষিতা এবং করেন্ ঘোরা মেয়ে, কিন্তু তিনি অনেক কথা বলে গেলেন কিছুটা কেউ কানে নিল, কেউ তা কানে তুলল না। গল্প করে চলে পাড়া প্রতিবেশীনীরা সঙ্গে বেশ মুখরোচক পরনিন্দা। মিটিং শেষ হল। তাদেরকে আশাদি মিষ্টিমুখও করালেন। চা, পান, ইত্যাদির কোন ত্রুটি নেই। পুত্রবধূরা একটু আড়ালে হাসে বলে পরম্পরায়, যার এটী কদিন চলে দেখব। বাবা কোর্ট থেকে এলে গল্প হবে। তারপর সন্ধ্যার খাতা নিয়ে এগিয়ে এলেন শেফালী ব্যানার্জি। চাঁদার কথা ওঠে মাসে ।০ করে দিতে হবে। এ্যাঁ কি বললেন দিদি, আট আনা। এ ত, কথা ছিল না, চলবাবু বাড়ীতে রান্নাবান্না আছে ত। ওঁর আফিস ফেরার সময়ও হল। এতক্ষণ মণিও গৃহের টানটা এতটা টন্‌টনে ছিল না চাঁদার মাঝে হঠাৎ সেটা সজাগ হয়ে ওঠে। মহিলারা ব্যস্ত হন্ বাটী ফেরার জন্য। আশাদি যাই ভাই, আপনি একটী ধনী লোকের পরিবার হয়ে বাড়ী বাড়ী যান্, সেজন্য এলাম মান রাখতে আপনার দিদি। তবে ডাকবেন, আপনার অন্তরঙ্গতেও প্রস্তুত আছি ভাই; কি মানুষ আহা ভগবান ও কৃপা এদের করেছেন। স্বামীও আপনার একটী মহাদেব বলা যেতে পারে। আমাদের দিদির কি ভাগ্যি গো, ছেলে-বৌ, মেয়ে, জামাই, নাতি, নাতনী ভর্ত্তি ঘরকন্না আহা মনও তেমনি সাদাসাটা; তবে ঐযে দিদি রিক্সা ভাড়াটী দিন্ এলাম ।০ যাব আও ঐ আট আনা এক টাকা লাগবে। কি করে অতটা হাঁটা হেটে আসি বলুন ত দিদি? আশাদি ঘাড় নাড়েন। এরপর, এক এক করে সব মহিলারা এগিয়ে আসেন। আশাদি ব্যাগ খুলে ভাড়া দেন। মোট ৩৲ এক হতে গেল, রিক্সা ভাড়াতেই। কি করি বলুন অত হেটে আর কি অতটা হেটে আসা যায় দিদি? আহা কি মানুষ যেন দেবী! আশাদি তাদের কাদাধূলা মাখা শিশু কোলে নিলেন আদর করেন

ছোট হাতে এক মুঠি লঙ্গেন্স তুলে দিলেন। শিশুর সঙ্গে শিশুর মায়েও আনন্দের হাসি দেখা দেয়। মহিলাটী নত হয়ে আশাদির পায়ের ধুলা নেন্। আশাদির যেন তন্ময় ভাব! থাক এত দিনে তবু তিনি একটা এমন কাজ পেলেন, যাতে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে মেতে থাকেন তিনি নিজের মনেই। এই ত কাজ, এইত দেশের কাজ কাজ সত্য খুঁজে নিতে হয়। আরতি ঠিকই বলে গেল, দেশের কাজ, খুঁজে নিতে হয়। তাগ্যিস্ আরতি একটা দিন এল, তাইত সমিতিটা তাঁর গঠন করে গেল। ঈশ্বর আছেন, তার ভাবনার কি আছে? তাছাড়া মণিকা ত বি-এ, পাস দেও কর্ম্মে সেকালী আই, এ, পাস দেও কর্ম্মে সেক্রেটারীর কাজটা। সব ঠিক হয়ে যাবে। প্রথমটা একটু খরচ হয়। কর্ত্তা বিরক্ত হবেন, তাঁর সংসারে কত ব্যয় হয়। সামান্য কটা টাকা যদি মেয়েদের জন্য তাদের উপকারের জন্য লাগেই তাতে কি হয়েছে?

এখানে একটু আশাদির পরিচয় দেওয়াও দরকার তিনি দেশের আশাদি, দশের আশাদি, পাড়ার আশাদি, গরীবের আশাদি। তিনি দরিদ্র ঘরের মেয়ে, ধনী শ্বশুর তাঁর রূপ দেখে দয়া বশতঃ আনেন সেজন্য চির দিন বিনীতা নম্র ভাল মানুষ তিনি। মুক্তহস্তে চাদার খাতা অল্প পূর্ণ করে দেন ঐ আশাদি। যেখানে অন্য বাটীতে দেয় চারি আনা সেখানে আশাদি দেন দশটাকা কমপক্ষে। তোরা সকলে বস একটু আহা, রোদে খুবে বাছারা যেবে গেছে। চাকরকে ডেকে সরবৎ দেন, পাখা খুলে দেন। কি প্লে হবে, কটাতে আরম্ভ হবে, কে কি সাজাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি প্রশ্ন ও চলে। জ্ঞান কাল পাত্র হিসাবে বহু জিজ্ঞাসাতেও যখন সমাধা হবে না, জেনেই, কলেজ স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা উঠে পড়ে নমস্কার করে। অবশ্য টাকা নিয়েই। যখন অনেকেই টাকার জন্য বিপদ গ্রস্থ হন, ধার দেন আশাদি, কিন্তু শোধ তিনি পাবেন না জেনেই তা দেন অবশ্য। এটাকে তাঁর বাটীর সবাই পছন্দ করেন এমনি নয়, তিনি দিয়ে আনন্দ পান, খাইয়ে সুখী হন্। দেশের কাজে তিনি আনন্দ বোধ করেন। শ্রদ্ধা বাইরের লোকের পেলেও, অন্তরে অবশ্য তিনি তা পান্ না! সবাই সবটা পছন্দও করেন না। সেক্রেটারী দুচার দিন বাদে এসে বলেন, আশাদি চাদা আদায় অতিকষ্টে করেছি। চার আনা করে, তাও কি আদায় হয় দিতেই চায় না মেম্বাররা যে সব ঘরেছে কিবলা যায়। আমি বলেই অতিকষ্টে এই কটা টাকা আদায় করেছি বাপু। কি খাওয়াচ্ছ খাওয়াও চাঁদার কটাকা তাও জিজ্ঞাসা করতে আশাদি ভুলে গেলেন। সেক্রেটারীর ক্লান্তি মোচন করতেই ব্যস্ত হন তিনি। আরতি দেবী যাবার সময় বলে যান্ যে, তোর দ্বারা হবে না তাই যাদের ভদ্রলোকের কতকগুলো টাকা নষ্ট হবে বলেই মনে হয়. তোর দ্বারা এসব কাজ হবে টবে না। তাতে একটু আশাদি ব্যথিত হন্, এমন কি তাঁর ত্রুটী! কত পরিশ্রম করছি, লোক কেন এসব কথা বলে। তিনি তক্ষুণি গাড়ী নিয়ে বার হন মণিকাকে সঙ্গে নিতে ভোলেন না। কিন্তু মণিকা বার বারই বলে যে, সেকালী ব্যানার্জ্জিকে সেক্রেটারী করা তাঁর নাকি মোটেই উচিৎ হয়নি। এইরূপ আরও কর্ত্তব্য কথা হয় গাড়ীতে যেতে যেতে কিন্তু আশাদি পারেন না কিছু মুখের উপর বলতে। বার বার বলা সত্ত্বেও আশাদি পারেন না সেকালীকে বলতে কিছুই। এখানে আশাদির স্বামী গণ্যমান্য ব্যক্তি সেই নামে ছাপান চাঁদার খাতা নিয়ে, সেকালী বাড়ী বাড়ী চাদা আদায় করে, কিন্তু সমিতিতে জমা দেওয়া হয় না। সে টাকাতে হয় সেকালী ব্যানার্জ্জির সাড়ী ব্লাউস্ সিনেমার টিকিট। এই ভাবে চলে আশাদির মহিলা সমিতি। যাঁরা ডবল রিক্সা ভাড়া নেন অথচ, দুবারই তাদের হেটে যাওয়া আসা করতে দেখে মণিকা বলে আশাদিকে, কোন ফল হয় না বোঝেন না, বরং রাগ করেন। দুঃখ হয় কোন সময় চোখে জলও দেখা যায়। সমিতির জন্য আশাদির বহু অর্থ ব্যয় হয় বহু বহু করেন তাঁকে বাহবা দেন অনেকে। আশাদিও মনে প্রাণে খুসী হন। যাক্ এত দিনে তবু একটী কাজের মতন কাজ ত তিনি পেলেন যা যথার্থ দেশ সেবার কাজ।

তাঁর শিল্প প্রতিষ্ঠান এর কাজ চলে বেশ ভাল ভাবেই (অবশ্য নিজ অর্থ ব্যয়ে) অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিরা দেখে সুখ্যাতিও করেন। চাদা যা ওঠে তা সেকালী ব্যানার্জ্জির

সিনেমার টিকিট কেনা হয়, তা শেও বেশী নয়। এটা একটা প্রগতিশীল টাউন নয় মেয়েদের দিকটা অন্ধকারই রয়ে গেছে, এই বিংশ শতাব্দীতেও। আশাদি বলেন স্বাধীন দেশ অথচ একটি তেমন কিছু ত মেয়েদের জন্ত হয় না! আশাদির শয়নে স্বপনে ঐ চিন্তা যে, তাঁর সমিতি একদিন বড় হবেই। কিন্তু তিনি ভাবেন না যে, মেয়েরা নিজেরাও ত তাঁর মত মনোভাব নিয়ে সবাই নেই। সেক্রেটারীর সঙ্গে নিম্ন প্রতিষ্ঠানের মেয়েদের মজুরী নিয়ে প্রতিনিয়ত কলহ হয়। নালিশ আসে প্রেসিডেন্টের কাছে চব্বিশ ঘণ্টা। সেক্রেটারী এই বলেন, এই বলেন, ইত্যাদি। কথার ঠেলায় অস্থির হতে হয় আশাদিকে। আশাদি একে ত কিছুদিন ব্লাডপ্রেসার নিয়ে ভুগছেন, তাঁর প্রাণ ত ওষ্ঠাগত করে তোলে কলহ বিবাদে। শেফালী ব্যানার্জিকে বলেন যে হাঁ ভাই, গরীব মেয়েরা, তাদের প্রতি এতটা নিষ্ঠুর হও কেন শেফালী? শেফালী রগং দেহি ভাবে অনেক কিছু বলে গেলেন, আর যারা বিনা পয়সায় নকড়ী করতে চাই না তোমার। চিনেছি খুবই তোমায় আশাদি তোমার পেটে ২ এত ছিল? সমিতি তোমার উচ্ছন্নে যাক। আশাদির চোখে জল, হতাশা পূর্ণ ভাব তার। শেফালী তাঁর ডাকে সাড়া পর্যন্ত না দিয়ে হন্ হন্ করে চলে গেল। পুত্র বধূরাও এসে, সান্ত্বনা না দিয়ে সকলেই প্রকারন্তে দোষ দেয়। বলে, মা কি দরকার ছিল আপনার এত সবে। একটু ঘুঘুসে কাজ হয় তাদের বলি সমিতি সমিতি করা। সেজ পুত্র বধূ বি-এ পাশ, এম-এ পড়েন প্রাইভেট, তিনিও মৃদু হেসে বলে গেলেন, মা, এসব টাউনে কি ওসব বোঝে! ওসব বোঝে কলকাতার মা, কত সমিতি কি সুন্দর ভাবে চলে। কিন্তু মাএ কি সেই দেশ, যত সব কাণ্ড। সমিতি সমিতি করে, তিনি ঘর সংসার ত্যাগ করেছিলেন, আর তিনি পূজাজপ ধ্যান ধারণা গীতাপাঠ সব ত্যাগ করেন। আর করেন তিনি স্বার্থ ত্যাগ যে স্বার্থ স্ত্রীলোক অতি যত্নে আঁকড়ে ধরেন। সেই অর্থ ব্যয় করেন যে অর্থ সযত্নে সঞ্চিত করেছিলেন একদিন। অকৃপন হস্তে তিনি মেয়ে দের জন্ত ব্যয় করেন। তাঁর ভগ্ন স্বাস্থ্য আরও ভেঙে গেল। সমিতি ২ করে বিস্তর খেটেই। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল যে মেয়েরা স্বাবলম্বি হোক একটা কিছু কাজ হোক প্রতিষ্ঠান একটা তৈরী হোক দেশের মধ্যে। আচার পাঁপর তৈরী করাতে সেখান তিনি হাত ধরে ধরে দেয়,আনাড়ী হাতকে। বিক্রী করে মাসেত ১।২ টী কাপড় হবে। মনিকা পাশে বসে ছিল বলল আশাদি একি সেই দেশ, প্রাণ যার আছে তার মূল্য দেয় কেউ? তাও এসব দেশে পাওয়া যায় না। একজিবিসন বল ক্যাংসান বল, নাচ গান ইত্যাদির সবত ঐ সেক্রেটারী শেফালী পণ্ড করে দিল গোড়া থেকেই। নিজে মাকি কি একটা করছে শোনা যায়। কত কষ্ট কত অর্থ ব্যায় করেছ তুমি, কে এসব বাড়িক তোমায় ধরাল বলত আশাদি? বীরা, মীরা, শীরা, প্রভৃতি এগিয়ে এসে বলে তোমারও বদনাম ছড়াচ্ছে সেক্রেটারী মহাশয়া। আশাদি বলেন, মানুষকে ক্ষমার চোখে দেখ তোমরা। দোষ ত মানুষ মাত্রে করে তোমরা ক্ষমা করবে। আশাদি অসুস্থ। আজ বিভা বলে, এতবড় একটি প্রতিষ্ঠান গোড়ে তোলেন কত কাণ্ড করেই না! কত কাজ হয় কত মেয়েই না সাহায্য পায় একজিবিসনএ জিনিষ বিক্রি করে তবু তাঁকে চেনে না! দেখনা শেফালীর বাড়ীতে আড্ডা জমেছে, আশাদির নামে নিন্দা মন্দ। ঐ রাস্তার ধারে বারান্দায় বসে প্রকাশ্যেই হয় নিন্দা বাদ্য সব। আশাদি আমাদের দোষার পাত্র বয়সা ধরেনা তাতে। বয়সা যারা নিজেরা তারাই ওসব করে মাতুরী বলে, সে টীচার স্কুলের। আশাদি কাতর হয়ে শুয়ে আছেন। অত্যন্ত প্রেসার বৃদ্ধি পেয়েছে, মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে অনবরত। "দেখ মনিকা আর সমিতি কর্ম না"। অতি কাতর সুরে বলেন আশাদি কথা কটী। কেন আশাদি? মনিকা জিজ্ঞাসা করে, এর পর আর কেন তা জিজ্ঞাসা করো না। এত অপমান আমার জন্ত তোলা ছিল আগে তাত জানতাম না ভাই! আসেত বোঝা যায় না আশাদি, কত কষ্ট হয় তোমার, আমি জানি সেকথা,তোমার সাথে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলাম যে দিদি। বেশী কথা বলো না ডাঃ বারণ করেছেন। সেক্রেটারী শেফালীর মনে এই ছিল তাকি আসে জানি মনিকা। জানা তোমার উচিৎ ছিল, চোখে মুখে ভেল্কী খেলা স্ত্রীলোক সে। বোঝেনি কেন জানিনা। আশাদি

বলেন,—দেশের কাজের মধ্যে আনন্দ পেতে চেয়েছিলেন! কিন্তু, বলে তাঁর চোখে জল এল। মনিকা ভাবে যে একে কিন্তুর উত্তর কে দেবে? এই পৃথিবী ব্যাপি কিন্তুর উত্তর কোথাও নেই! জগৎ খুঁজে উত্তর পাওয়া যায়নি তার আজকার দিনেও। যারা ঘরে পায়না আনন্দ তারা চায় পথে আনন্দ? সুখ থাকতে পারে, কিন্তু আনন্দ আসে কই? কত সাধ করেই না তিনি সমিতি করেন, পান ও আনন্দ, শান্তি, তৃপ্তি। কিন্তু সবাইকার মতত এক নয়। তাঁর এই আনন্দে খুশী হওয়া সবাই যদি পছন্দ না করে? তারা পছন্দই বা করবে কেন? এই কেন, কিন্তুর সমাধান এ পৃথিবীতে কি আজও হয়েছে? তাই আশাদির জীবনে এই কেন ও কিন্তুর সমাধান হল না! তাঁর মহিলা সমিতিও এখানে হল শেষ।

প্রসাধন

শ্রীহিরণ্ময়ী বসু

যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রার প্রণালী পাল্টাচ্ছে, পাল্টাচ্ছে তার রুচি ও প্রয়োজন। আজকের দিনে পুরুষ ও নারী উভয়েরই দৃষ্টি বহির্মুখী। একদিন ছিল যখন নারী কেবলমাত্র সংসারের সকল দায়িত্ব নিয়ে সুচারুরূপে সন্তানপালন ও মনোরঞ্জন উদ্‌যাপন করত। ক্রমে কালচক্রে কেবলমাত্র সংসারই মেয়েদের একমাত্র লক্ষ্যস্থল রহিল না। অভাব, অভিযোগ, জ্ঞানপিপাসা, অর্থকরী চিন্তা প্রভৃতির সমন্বয়ে নারীকে তার দৃষ্টি প্রসারিত করতে হল। ঘরের আগল মুক্ত করে কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের অসীম পারাবারে তাকে পুরুষের পাশে স্থান করে নিতে হল।

যতদিন মেয়েরা ঘরের ভিতরে আবদ্ধা ছিল ততদিন সাজ-পোষাক সম্বন্ধে তাদের প্রসাধন, তাদের রীতিনীতি ছিল এক ধরণের, কিন্তু আজ যেখানে মেয়েদের রীতিমত জীবনযুদ্ধে অগ্রসর হতে হচ্ছে, সেখানে তাদের চিন্তাধারার সঙ্গে মুখমুখী সেই একান্ত সলজ্জ চেতনাগুলিরও সংঘর্ষ সুরু হয়েছে। মধ্যযুগের সাজপোষাকে যে জীকজমক ছিল এখন তা সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে। মূলতঃ অর্থ-ই এর এক মাত্র কারণ হলেও মানুষের রুচিও পাল্টাচ্ছে। কোন একজন বড় দার্শনিকের মতে যে জাতির রুচির পরিবর্ত্তন না ঘটে সে জাতি দুর্বিষহ এবং তার পরিণতি ভয়াবহ। পরিবর্ত্তনশীল পৃথিবীর সঙ্গে সমান তালে আমাদের মনোজগতেরও পরিবর্ত্তন সাধন করতে হবে।

সেই পরিবর্ত্তনের চক্রে পড়ে আজ আমাদের শিক্ষাদীক্ষা কর্ম্মজগতে সব কিছুর ভিতরেই এসেছে নিজেকে জানবার ও অপরকে জানাবার আগ্রহ। ফুল যখন ফোটে তখন তার দলগুলি উন্মোচিত না হলে সুগন্ধ বিতরণ করতে পারে না। আবার সেই সুবাস তার আত্মতৃপ্তির জন্যে নয়, অপরকে আনন্দদানের জন্যেই। তেমনি মেয়েদের জীবনেও ঐ ফুল ফোটার আগের পর্ব্বটি সমাধা করে প্রসাধন। প্রসাধন জিনিষটি অতি উচ্চ স্তরের। প্রসাধন চলে দুই তরফা—একটি অন্তরে, অপরটি বাইরে।

প্রথমে বাইরের প্রসাধনের রূপটি সম্যক উপলব্ধি করলে ভিতরেরটিরও আভাষ পাওয়া যাবে।

বাইরের প্রসাধন যতটা সম্ভব স্বাভাবিক হওয়া চাই। সহসার বাহুল্য আজকাল কমেই এসেছে। তবু যাঁরা সম্পূর্ণ বাড়ীর ভেতরে থাকেন তাঁদের পক্ষে গহনা ব্যবহারে ক্ষতি কিছু নেই; কিন্তু যে মেয়েদের ট্রামে বাসে রাস্তায় অনবরত ছাতা, ব্যাগ, কাইল, বাস্কেট নিয়ে ঘুরতে হয় তাঁদের পক্ষে অনেক গহনা ব্যবহার করার অর্থ চোরকে আমন্ত্রণ জানান। তাছাড়া বর্ত্তমান যুগের অর্থ-নৈতিক পরিস্থিতি স্বর্ণযুগের মত স্বর্ণ ক্রয়ের অনুকূল নয়।

পরিধেয় বস্ত্র যাই হোক থাকে বেশভূষা। বেশভূষা সম্বন্ধে বিচারী হওয়া আবশ্যক। যাকে যে পোষাক মানায় তার সেই রংয়ের জামাকাপড় ব্যবহার করা উচিত। আসল লক্ষ্য থাকা উচিত যে কাপড়-জামা আমরা ব্যবহার করছি সেটা যেন পরিষ্কার হয়, শুভ্রতা মানুষের মনে সম্ভ্রম জাগায়। গোলাপ আমরা পছন্দ করি ঠিকই, কিন্তু রঙ্গীনতা আমাদের ক্লিষ্ট করে। পোষাক সম্বন্ধে মেয়েদের সব সময় সচেতন থাকা উচিত, যেন মেয়েদের শালীনতাবোধ ক্ষুণ্ণ না হয়। ট্রামে বাসে রাস্তায় অফিসে শত সহস্র কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে যখন আমাদের ঘোরাফেরা করতে হয় তখন ঠিক সেই অনুযায়ী জামা কাপড় ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন। যে বস্ত্র কেবলমাত্র লজ্জানিবারণ করে না কিন্তু সেই সঙ্গে বজায় রাখবে আমাদের সম্ভ্রম সেই ধরণের শাড়ী জামা পরাই কর্তব্য।

পোষাকের পর আসে নিজেকে সুন্দর করে তোলার জন্য কিংবা সুরুচি প্রকাশের জন্য যে প্রসাধন সামগ্রী আমরা ব্যবহার করে থাকি। প্রসাধন সামগ্রীর অধুনা অভাব কিছু নেই মধ্যযুগের সঙ্গে বর্তমান যুগের প্রসাধন সামগ্রীর তুলনাই করা চলে না। সে যুগে তাঁরা মাখতেন দুধের সর, কমলার খোসার গুঁড়ো, শ্বেত চন্দন, পায়ে থাকত আলতা, ঠোঁটে তাম্বুলরাগের চিহ্ন সুস্পষ্ট থাকত। বিশেষ করে সধবা মেয়েদের সাজসজ্জায় বিশেষ অঙ্গ ছিল আলতা, সিঁদুর ও কুঙ্কুম। স্নো পাউডারের বাহুল্য ছিল না, যেটুকু ছিল তা অত্যন্ত পরিমিত। পাউডারের পরিবর্তে অনেক স্থলেই শঙ্খচূর্ণ ব্যবহার হত এখন কিন্তু প্রসাধনের ধারা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। সময়ের অপব্যবহার আধুনিক যুগে অপরাধের সামিল। দুধেও মিশপাউডার মেশানো থাকে, খাঁটী জিনিষ দুর্লভ, তার ওপর সেই দুধের সর বসে বসে মাখবার রুচি বা সময় কোনটাই এ যুগের মেয়েদের নেই। তাঁরাও প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করেন, কিন্তু সংক্ষেপে। স্নো, পাউডার, রুজ, লিপষ্টিক, নেলপালিশ, আইব্রো সবই আছে। তাড়িঘড়ি মুখে বুলিয়ে নিলেই চলনসই হয়ে দাঁড়ায়। এর ভেতর আবার কতকগুলি জিনিষ আছে সেগুলি সব ক্ষেত্রে সবাইকে মানায় না।

কর্মজগতের সঙ্গে যাঁরা সংশ্লিষ্ট তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক সাজ পোষাক শ্রেয়ঃ। একটি বর্ষিয়সী স্থূলাঙ্গী কৃষ্ণবর্ণের মহিলা যখন ঠোঁটের রং ও গালের রঙে ঘর্মাক্ত কলেবরের সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটান, তখন তাঁর সেই অস্বাভাবিক মূর্তি দেখে আমরা না হেসে থাকতে পারি না। এটা কিন্তু ব্যঙ্গ নয়, এটা কৌতূহল উদ্রেককারী মনোবৃত্তির প্রকাশ। রং মাখা সব ক্ষেত্রে শোভন নয়। বিদেশীদের অনুকরণ করতে গিয়ে আমরা সম্পূর্ণ ভুলে যাই যে তাদের দেশটা শীতের এবং তাদের গায়ের রং রীতিমত গৌরবর্ণ, রীতি নীতিও তাদের উগ্র। সে ক্ষেত্রে যা শোভন, আমাদের ক্ষেত্রে তা বিসদৃশ ও অশোভন।

তাই বলে স্নানের পর মুখের তৈলভাব কাটাবার জন্য স্নো পাউডার ব্যবহার করাটা মোটেই অশোভন নয়, বরং একান্ত প্রয়োজন। ওগুলির মৃদু সুরভিতে মন প্রফুল্ল হয়, মনে উৎসাহ আসে, কাজকর্মের অবসন্নতা দূর হয় তাছাড়া বহির্জগতের সঙ্গে যাঁদের নিবিড় যোগাযোগ, তাঁদের পক্ষে সব সময়েই নিজেকে পরিচ্ছন্ন রাখার উপযোগী প্রসাধন সামগ্রী কাছে রাখাটা একেবারেই নিন্দনীয় নয়।

এই তো গেল মোটামুটি বাহ্যিক প্রসাধন। এর পর হচ্ছে ভেতরের প্রসাধন বাইরের প্রসাধন সামগ্রী যেমন সুলভ, মানসিক প্রসাধন কিন্তু তেমনি সুলভ নয়। মানসিক প্রসাধন ঘটে আমাদের জ্ঞানপিপাসার দ্বারা, পরিবেশ ও প্রকৃতি থেকে রস আহরণের দ্বারা। যাঁরা বাড়ীর ভেতর আবদ্ধ থাকেন, তাঁরাও বিভিন্ন ধরণের পুস্তক পাঠ করতে পারেন, কেবলমাত্র ধর্মপুস্তকই নয় কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর পুস্তক যা মনকে উদার করে দৃষ্টিকে করে সত্যসন্ধানী। নিষ্কৃত অবসর সময়ে পরনিন্দার চাটনী পরিবেশন না করে পাঁচজন মহিলা মিলে সেই সময়টুকু যদি জ্ঞান আহরণে ব্যাপৃত করা যায় তাহলে মনের প্রসাধনে সহায়তা করা হয়। মনটা যেন আয়নার কাজ করে।

পড়াশোনা করার সুযোগ না থাকলে পরিবেশের সাহায্যে দৃষ্টিকে ব্যাপক করে তুলতে হয়। মনের এই প্রসাধনের কাজটি অতি দুরূহ। মুখে যেমন স্নো পাউডার মাখলেও তার ভেতর দিয়ে কালো রং উঁকি মারে, তেমনি

সুষ্ঠু পরিবেশের ভেতর দিয়েও আমাদের কলধ্বনির পরশ্রী কাতর মনটা উঁকিঝুঁকি মারে। তবে জ্ঞানের প্রলেপ, বুদ্ধির প্রলেপ, কর্ম্মের প্রলেপে সেটা ক্রমশঃ বিলীন হয়ে যায়।

বর্ত্তমানে যে মহিলারা অন্তর ও বা'র দুই প্রসাধনে সংহতি সাধন করতে পেরেছেন, বাস্তবিকই তাঁরা প্রশংসনীয়। আজকের দিনে মেয়েদের বাঁচতে হবে পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে সংসারকে বাঁচাতে হবে। কর্ম্মজগৎ আর মনোজগতে ঐকান্তিকতা আনার এক প্রধান সহায় এই প্রসাধন। নিজেকে সুন্দর করে তোলার আগ্রহই মানুষকে প্রেরণা দেয় এবং সেই দুর্দ্দম প্রেরণার বশবর্ত্তী হয়েই মেয়েরা জীবনযাত্রার কঠিন ধাপগুলি অতিক্রম করেন তাই মনে হয়—

প্রসাধন প্রসাধন
তোমারই আরাধন,
সাজ আর সজ্জায়
দূর করে লজ্জায়।

সাঁঝের প্রদীপ

শ্রীধীরেন বসু　এম, এ

গোধূলি মিলায়ে নামি পশ্চিমের বাটে
ত্রিমিতের পথশ্রান্ত দিবা রক্তরাগে—
সুবর্ণ জ্যোতিরিদ্রাভ বহ্নি অনুরাগে
পিঙ্গলা, পাণ্ডুর সাথে মিলায় ললাটে।
সপ্তর্ষির প্রতিবিম্ব ত্রিবেণী সলিলে
কম্পিত ঊর্ম্মিপেষম তলে সাবলিলে
করে স্নান আবক্ষ অতলে পুচ্ছ রাখি
সিক্তভায় স্নিগ্ধ জনদেশ যায় ঢাকি।
গঙ্গাবক্ষস্পৃষ্ট খেয়াপারে তরীহাল
থেমে যায় বেলাশেষে ; ফেলে যায় তাল।
পারের ঘাটে পল্লীবধূরা করে খেলা
হংসদল কেলি, দূরে ঘাটে বসে বেলা।
মন্দিরাঙ্গন তলে সন্ধ্যাপ্রদীপারতি
বৈকালী রচনা পরে ছড়ায় সুভাতি।

একটি বিকেল

শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক

পড়ন্ত সূর্যের মেঘ রোদটুকু গায়ে মেখে নিই,
গায়ে গায়ে মেখে নিই নীলটুকু দূর আকাশেই ;
মনটি রঙিন মেঘ পেয়ে গিয়ে তখনতো তার
হৃদয় সমুদ্র ঢেউ নিয়ে করে তোল পাড়,
আমাদের পারাবার পারাবত ডানা হয়ে যায়
দূরে দূরে সীমাহীন মনেরই তেপান্ত ছাড়ায়।
বেলা যে পড়েই এলো আকাশের রঙ্ পাল্টাই
ধূপছায়া শাড়ি হয় বেণারসী কিংবা যে ঢাকাই!
আকাশে মেঘের তাল তিল তিল তমাল হিন্তাল
মাঝে মেঘে পুণ্য বৃষ্টি হয় মাঠে আমার এ সাল ;
আশা নিয়ে মন চলে বেলাবাল যাক ধরিয়ায়
হালকা জীবন এক ভেসে চলে মেঘ বলাকায়।
ছেঁড়া ছেঁড়া আশাবীজ মনে হয় আকাশেই ভাসে
পড়ন্ত সূর্যের রোদ গায়ে মেখে মেঘগুলো আসে,
আভাসে আমার শুধু না-বলা বাণীর ছবি দেখি;
দেখি আর দেখি কত কাজে কাজে হয়তো বা মেকি?
অদৃশ্য শিল্পীর মত ভেসে ভেসে রঙ্ তো বোলায়
চোখে চোখে আশ্চর্য্যের অনুভূতি আলো ও ছায়ায়।

বিদেশের ডাকে

শ্রীমতী প্রীতি সেন

প্রিয় ভগ্নী,

আপনি আমাকে বিদেশযাত্রার বিবরণী লিখে জানাতে বলেছিলেন। কিন্তু আমি আপনাকে বিশেষ করে আর কি জানাবো, বলুন? আজকাল তো ঘরে ঘরেই ছাত্রছাত্রী ও আত্মীয়েরা বিদেশে যাচ্ছেন, কত বড় বড় করে কত রং ধরিয়ে ফলাও করে কত লিখছেন; তাঁদের কাছেই কত জানা গিয়েছে। আমি এই অল্প ক'দিনে আর কি জেনে আসতে পেরেছি, বলুন? একটি জাতি সম্বন্ধে, একটি দেশ সম্বন্ধে যা যা জানা দরকার, কেউ কেউ জেনেছেন; আবার অনেকে না জেনেও কত লিখেছেন। আমি তো ভাই, শেষের পর্য্যায়ে পড়ে যাচ্ছি। তবুও যেটুকু জেনে এসেছি (যদিও লিখে আসতে পারিনি কিছুই) তাই কয়েক ছত্র লিখে দিচ্ছি।

আমাদের খুব ইচ্ছে ছিল, জাহাজে গিয়ে প্লেনে ফিরে আসবো, কিন্তু হাতে সময় না থাকাতে প্লেনেই রওনা হলাম।

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর বিকেল তিনটের পর ধমধম এরোড্রোম থেকে আমাদের প্লেন ছাড়লো। প্লেনে যাবো, প্রথমে ভাবতে বেশ ভয় করছিল—এর আগে তো ভাই, কখনো প্লেনে চড়িনি। একেবারেই অত লম্বা পাড়ি দেবো, যদি অসুস্থ হয়ে পড়ি!—সেই ভাবনা ছিল। কিন্তু আমাদের কিছুই কষ্ট হয়নি। যত উপরে উঠতে লাগলাম ততই আরাম বোধ হতে লাগলো। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি, আমাদের কলকাতা ক্রমশঃ মিলিয়ে যাচ্ছে। মেঘের ওপর দিয়ে চলেছি—নীচেও নীল আকাশ আর মেঘ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ছে না। এই বৈজ্ঞানিক যুগে এ-বেলা ও-বেলা দূর হতে দূরান্তরে চলে যাওয়া যায়, এতদিন শুধু বইতেই এ পড়েছিলাম। ক্রমে সমুদ্রের অল্প অল্প আলো চোখে পড়তে লাগলো। প্লেনেই বলে দিচ্ছে আমরা কখন কোথা দিয়ে যাচ্ছি। রাত ন'টা নাগাদ করাচীতে প্লেন থামলো। তখনও মনে হচ্ছে, আমাদের দেশেই আছি। রাত প্রায় সাড়ে তিনটার সময় কাইরোতে এসে পৌঁছলাম। ঘড়িতে সময় অল্প অল্প করে পরিবর্ত্তন হচ্ছে, সেটা বুঝতেও পারিনি। প্লেনে মাইকে টাইম বলে দিচ্ছে পরদিন ২৪শে সেপ্টেম্বর লণ্ডনে ঠিক সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় পৌঁছলাম। সেটা অবশ্য লণ্ডন টাইম অর্থাৎ কলকাতা থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার তফাৎ। এরোড্রোমে আমার মেয়ে জামাই ও নাতি আমাদের নিতে এসেছিল। এরোড্রোম থেকে মোটরে করে এসে একটি হোটেলে উঠলাম; কারণ আমার মেয়ে তখন লণ্ডনের বাইরে নটিংহামে (২০০ মাইল) থাকতো। এত অল্প সময়ে গিয়ে সেই রাত্রে প্রথমে বুঝতে পারিনি যে, এত ঘুরে সাত সমুদ্র পার হয়ে সত্যিই আমরা পৌঁছে গেছি। হোটেলে আমরা শুধু Bed & Breakfast ঠিক করে, সঙ্গে যা খাবার ছিল, খেয়ে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকাল দশটা নাগাদ ব্রেকফাষ্ট খেয়ে মোটরে সব বেরিয়ে পড়লাম। নটিংহামের একটি সহর—নাম ম্যান্সফিল্ড; সেখানে আমার মেয়ে থাকে। লণ্ডনের কিছু কিছু দেখলাম। সেখানকার দোকান, রাস্তা, ষ্টেসন সব কিছু খুব পরিষ্কার ও সুন্দর ছবির মত চোখে পড়তে লাগলো। যত ঘুরে যেতে লাগলাম ততই সুন্দর ও পরিষ্কার মনে হতে লাগলো। ওখানে রাস্তায় সব নম্বর দেওয়া থাকে এবং প্রত্যেকের কাছে ম্যাপ থাকে। নম্বর দেখে দেখে আমার জামাই গাড়ী চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো, যদিও দু'চারবার রাস্তা ভুলও হয়েছিল। বাড়ীগুলি সব এক সাইজের এবং একই ডিজাইনের। প্রত্যেক বাড়ীর সামে একটি করে বাগান, বাগানগুলিও সব এক সাইজের, বাড়ীর রংও সব এক; কাজেই আমাদের মত লোকের ভুল হওয়া স্বাভাবিক। তখন সেপ্টেম্বর মাস।

কাজেই তখনও খুব গোলাপফুল, ডালিয়া ফুলে গাছ ভরে আছে। এখানকার সর্ব্বত্রই রাস্তাঘাট, ষ্টেশন, বাজার ঝকঝকে ও সুন্দর।

ম্যাঞ্চেষ্টার শহরের কয়লাখনির জন্য বেশ নাম আছে। শহরটি ছোটর ওপরে খুব সুন্দর। পাহাড় ও ছোট ছোট লেক আছে। লোকসংখ্যা খুব বেশী নয়। বেশ শান্ত ও নির্জ্জন। বিশেষ কলকাতা থেকে গিয়ে বেশ নূতন মনে হতে লাগলো। রাত্রি দশটার সময় ম্যাঞ্চেষ্টারের বাড়ীতে চাবি দিয়ে ঘর খুলে ঢুকলাম। প্রথমেই অবাক হলাম এই ভেবে যে, দু'দিন বাড়ীতে কেউ ছিল না—বাড়ীতে চাবি দেওয়া ছিল; চাবি খুলে Maid সব কাজ করে দিয়ে আবার চাবি বন্ধ করে চলে গিয়েছে; ঠিক যেখানকার জিনিষ, ঠিক সেখানেই গোছানো আছে; আর আমাদের এখানকার কথা ভাবুন? যা হোক তখন মনকে প্রবোধ দেওয়া ছাড়া উপায় নেই যে আমাদের দেশে এত অভাবের জন্যেই স্বভাব নষ্ট হয়েছে। পরে জানলাম—সেই মেড-এর স্বামী পাঁচশো টাকা পেন্সন পান; স্ত্রী তাঁর নিজের খরচের জন্যে বাড়ীতে বাড়ীতে কাজ করে সপ্তাহে তিন-চার পাউণ্ড রোজগার করেন। আর তাতে ওদের কোন লজ্জা নেই, সকলেই করে থাকে। আর আমাদের দেশে ৫০০৲ টাকা চাকুরের গৃহিণী লোকের বাড়ী দূরের কথা, নিজের বাড়ীতে বাসন মাজা ও রান্না করা সম্মানহানিকর বলে করেন এবং অনেকের স্বাস্থ্যেও কুলোয় না।

প্রায় সাত বছর পরে মেয়ে-জামাই ও নাতিকে পেয়ে গল্পে ও খাওয়াদাওয়াতে খুবমেতে উঠলাম। মেয়ে ইতিমধ্যে আমাদের কন্টিনেন্ট যাওয়ার সব ব্যবস্থা করে টিকেট করে রেখেছে শুনলাম। তার আগে নটিংহাম ও তার চার দিকের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখার জন্যও ব্যবস্থা করেছে। প্রত্যহ সকাল দশটার সময় ব্রেকফাষ্ট করে সঙ্গে কিছু স্যাণ্ডুইচ নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়তাম। সারাদিন ঘুরে রাত্রে বাড়ী ফিরে আসতাম। একদিন গেলাম রবিনহুডের প্রসিদ্ধ শেরউড অরেষ্ট দেখতে। সর্ব্বজনবিদিত সেই ওকগাছ ও তার ভেতরের গুহা দেখলাম। অতদিনের গাছ এখনও বেশ সজীব ও পাতাগুলো সবুজ আছে দেখলাম। বেশ জঙ্গল তবে আমাদের দেশের জঙ্গলের কাছে কিছুই মনে হয় না। তারপরের দিন গেলাম ডার্বিশায়ারে; এটীও ছোট জেলা। মেণ্টনে গিয়ে গাড়ী থেকে নেমে বেশ খানিকটা পাহাড়ের নীচে নেমে এলাম। সেখানে সুন্দর লেক, তার চারপাশে বাগান, পার্ক, নানারকম ছোট ছেলেদের খেলবার উপকরণে সাজানো, একদিকে ছোট্ট রেলপথ দিয়ে ছোট্ট রেলগাড়ী নিয়ে ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঘুরে আসছে (অবশ্য সব টিকিট করে), আর একদিকে ছোট মোটরবোটে করে লেক বেড়িয়ে আনছে—নাতির সবটাতেই চড়া হলো, সঙ্গে সঙ্গে তার দাদুও চড়লেন। তারপর সেক্সপীয়ারের জন্মস্থান দেখতে গেলাম। সব কিছু সাজানো রয়েছে। পরিষ্কার ঝকঝকে। কবির জন্মস্থান যেমন নির্জ্জন শান্ত হওয়া দরকার সেভাবে আছে। কতকগুলি বই ও ছবি কিনে বিকেলে হ্যামলেট থিয়েটার দেখতে গেলাম। কবির স্মরণীয় হলে তাঁরই রচিত নাটক দেখে মুগ্ধ হয়েছি।

শেফিল্ড, ইয়র্কসায়ার সব ঘুরে শেষে অক্সফোর্ড গেলাম। অক্সফোর্ডের কলেজগুলি দেখে মনে হয় কবে আমাদের দেশে এই রকম কলেজ লাইব্রেরী তথা পড়ার সুব্যবস্থা হবে। আমরা দেখে যেতে পারব না হয়ত আমাদের ছেলেরা দেখতে পারে।

এদের স্কুলগুলিও কি সুন্দর এবং পড়ার কি চমৎকার ব্যবস্থা। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাদের দেশের প্রত্যেকটি ছেলে মেয়ের কিছু কিছু পড়ার ব্যবস্থা অবশ্যই করেন, যাতে তারা রোজগার করে খেতে পারে। অর্থাৎ অল্প পরিচয় থেকে কার্য্যকরী শিক্ষা ব্যবস্থা করেন। প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে বিনা বেতনে স্কুলে পড়ে এবং দুপুরে প্রত্যেক ছেলেমেয়ের জন্য ভাল খাওয়ার বন্দোবস্ত করেছেন। এমন কি সেটা ভাল খাবার দেওয়া হয় কিনা সে সম্বন্ধে মাঝে মাঝে তদন্ত করা হয়। ঐ খাওয়ার জন্য খুব সামান্যই বাপ মায়ের দিতে হয়। স্কুলের বইও স্কুল থেকেই দেয়। তাছাড়া যে কোন অসুখ হলে স্কুল থেকেই বিনা খরচে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। মোটের উপর জাতিগঠন করতে হলে যা যা প্রয়োজন এরা সেটা খুব ভালভাবে নজর দিয়েছেন।

প্রসবের পূর্ব্ব থেকে প্রসবের পর পর্য্যন্ত সমস্ত মায়ের এবং সন্তানের ঔষধ ও নানাবিধ বলকারক খাদ্য গভর্ণমেণ্ট

চালান, এর ফলে এদের দেশে ছেলে মেয়েদের শৈশব থেকেই পুষ্টিকর খাদ্য পেয়ে—প্রত্যেকটীর স্বাস্থ্য হয় দেখবার মত, ছোট থেকেই তারা কত মজবুত কর্মঠ হয় সে দেখলে আমাদের দেশের ছেলে মেয়েদের জন্য দুঃখ হয়। ১২ বছর পর্য্যন্ত প্রত্যেকটী ছেলে মেয়েদের তার একরকম গভর্মেণ্ট বহন করেন। আর একটী কথা ওদের দেশের দুধ এত খাঁটি ও এত সুন্দর যে বিনা দ্বিধায় সকলে কাঁচাই দুধ খেয়ে নেয়। গরুর মালিক কোন গৃহস্থের বাড়ী দুধ দেয়না চাষীদের কাছ থেকে সব দুধ গভর্মেণ্ট নিয়ে রিফাইন করে Co-operative Store ইত্যাদিতে দেয় সেখানে আবার তারা পরীক্ষা করে তারপর বাড়ী বাড়ী দিয়ে যায়; আমাদের দেশেও অনেক চেষ্টা করে দুধের ব্যবস্থা করা হয়েছে কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাতে হয় যে এখন পর্য্যন্ত সেটা সফল হয়ে উঠতে পারে নি।

স্কুলের হেড মাষ্টার মশায় খুব কড়া এবং ছাত্রদের বেশ শাসন করেন আবার ছেলেদের সঙ্গে তার খুব ভাব; ছেলেরা অসঙ্কোচে তার কাছে সব মত প্রকাশ করতে পারে এবং তার জন্য ভয় পায়না। তাঁরা প্রথম থেকে একাধারে বন্ধু ও শিক্ষক হয়ে উঠছেন, তাঁদের সঙ্গে সাতার কাটছেন খেলাধূলা সব রকম করছেন, তাই সকালে সব ছেলে মেয়েরা দুধ খেয়ে ২।৩ মাইল হেটে স্কুলে চলে যায় তাতে তাদের কোন কষ্ট হয় না, অবশ্য লণ্ডনে খুব কাছাকাছি স্কুল আছে ও Bus-এ করেও অনেকে স্কুলে যেতে পারে। ফলের মধ্যে আপেলই একমাত্র ওদের দেশে সহজলভ্য ফল, তবে কিছু সস্তা নয়। ছোট থেকেই ছেলে মেয়েদের ভদ্রতা ও শিষ্টাচার স্কুল থেকেই অনেকটা শেখানো হয়। তাদের ব্যবহারে প্রতিবেশীর যাতে কোন রকম অসুবিধা না হয় সেটাও তাদের বিশেষ ভাবে শেখানো হয়। যেমন ওদের অনেকগুণ আছে তেমনি কতগুলি বিশেষ করে দোষও আছে যেটা নাকি আমাদের দেশে নেই। এদের ছেলে মেয়েরাই মা বাপের সংস্পর্শ খুব কমই পায়। সকাল থেকে রাত ৭টা পর্য্যন্ত তারা মা বাপকে চোখের দেখাও দেখতে পায়না, ফলে আমাদের দেশে মা বাবার সঙ্গে ছেলে মেয়ের যে মধুর সম্পর্ক সেটা ওদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। সকালেই সব ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠিয়ে বাড়ীর কর্ত্তা কর্ত্রী উভয়ে অফিস বা নিজের নিজের কাজে চলে যান, সন্ধ্যায় সব ফেরেন. ৮টার ভেতরে সব ছেলে মেয়ের খাওয়ার পাট চুকিয়ে তাদের বিছানায় ঢুকিয়ে নিজেরা আবার বেড়াতে বেরোন বা ক্লাবে যান। ছেলে মেয়েরা বাড়ীতে একলা একলাই ঘুমিয়ে পড়ে, আমাদের কিন্তু সেইসব ছেলে মেয়েদের জন্য প্রাণ কাঁদে। সব লোক যেন মেসিনের মত টাইমে কাজ করে নিজেরাই মেসিনে পরিণত হয়েছে। দেখলে মনে হয়না এদের মধ্যে প্রাণ আছে স্নেহ, মায়া, মমতা কিছু আছে বলে মনে হয় না, সব সময়ে ব্যস্ততা, নিশ্চিন্ত হয়ে হাটতে গেলে কেবলই ধাক্কা খেতে হয় কারণ সব কাজে তারা ছুটে ছুটেচলেছে তাদের সময় নেই। বাপ্‌রে তখন মনে হয় আমাদের দেশ স্বর্গ; দিব্যি নিশ্চিন্তভাবে ভেবেচিন্তে কাজ করা ওদের যেন ধাতে নেই। পার্কে বেড়াতে যাচ্ছে তাও যেন ঘড়ি ধরে ছুটে যাচ্ছে, হাটে বাজারে, বন্ধু দর্শনে সব সময়েই যেন ঘোড়ার ওপর চলেছে। এটা ঠিক যে ওদের দেশের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমাদের দেশের ছেলেমেয়ের তুলনা করা উচিত নয় কারণ শত গুণ থাকলেও আমরা চাইনা যে আমাদের ছেলেমেয়ে ঐভাবে তৈরী হোক এবং আমাদের দেশে তা সুখকর হবে না। তবে কতকগুলি যে গুণ আছে সেগুলি আমরা গ্রহণ করতে পারলে সত্যি আমাদের ছেলেমেয়েদের আরও উন্নত ও কর্মঠ করে তুলতে পারবো। আমাদের শিশুদের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে যদি আমাদের গভর্মেণ্ট নিতেন তবে কত দারিদ্র্য দূর হয়ে জাতি গঠনের কাজ দৃঢ়ভাবে হতে পারতো। স্কুল কলেজের শিক্ষার ভার আরও সুনিপুণ ভাবে সরকার বাহাদুর যদি চালনা করতেন ও পুষ্টিকর খাদ্যের জন্য চেষ্টা করতেন তবে আজ এইভাবে হাহাকার পড়ে যেত না। আমরা দুঃখের সঙ্গে জানাই যে ছেলে মেয়েদের যা প্রাপ্য আমরা সত্যিই তা দিতে না পারার অভাব অভিযোগ তাদের এত বেড়ে গিয়েছে। তবে এটা ঠিক অদাধুতার ফলে যেটুকু কাজ হবার তাও অগ্রসর হচ্ছে না। আমাদের এই চরম দুঃখ ও লজ্জা যে বিদেশের কাছে আমরা দরিদ্র ও ঘৃণার পাত্র হয়ে পড়েছি। লণ্ডনে ও কন্টিনেণ্টে অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস

করেছে এটা কি সত্যি তোমাদের ইণ্ডিয়া এত গরীব ও দেশে এখনও এত অশিক্ষিত লোক আছে? তাদের ভাল করেই বুঝিয়ে দিতে হয়েছে যে ইণ্ডিয়া মোটেই গরীব নয় এখনও তার বিপুল সম্পত্তি ঘরে ঘরে আছে। যেটুকু তোমরা জানছো সেটা তোমাদেরই কাজ, তোমরাই তাদের সর্বনাশ করেছ। আমরা জানতাম বাঙ্গালী নিশুক জাত এখন দেখলাম ওরা অনেক বেশী। আমাদের দেশের শিয়ালদহ ষ্টেশন ও যেখানকার যেটুকু মন্দ তার ছবি তুলে নিয়ে তাদের কাগজে নানা ভাবে লিখছে। পথের পাঁচালী চিত্র ওখানে খুব নাম করেছে সত্যি; কিন্তু ঐ চিত্রের দারিদ্র্য টেনে এনে আমাদের ইণ্ডিয়ার সঙ্গে যোগ করেছে। ওখানে বহু ইণ্ডিয়ান ছাত্র ছাত্রী চাকরী করছেন তাদের মধ্যে একটা জিনিষ দেখে আনন্দ পেয়েছি যে বেশীরভাগই তারা মনে প্রাণে ইণ্ডিয়ান। অনেকে ঐ দেশে বিয়ে করে বসবাস করছেন কিন্তু ইণ্ডিয়া সম্বন্ধে কোন নিন্দা শুনলে জ্বলে ওঠেন। অবশ্য কেউ কেউ আছেন তারা ভারতীয় বলে পরিচয় দিতে লজ্জাও পান। লণ্ডনে বহু ভারতীয় ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে ইণ্ডিয়া হাউসের মারফৎ আলাপ হলো। অনেকে বসবাস করছেন আসবো আসবো করেও আসতে পারছেন না তাদের সকলেরই মনের অবস্থা ঠিক যেন পা বাড়িয়ে আছেন, সুযোগ পেলেই চলে আসবেন।

সব কিছু বাদ দিয়ে শুধু শুণটা দেখলে মনে হয় বাস্তবিক এদের শৃঙ্খলা এদের দেশপ্রীতি ও এদের কর্মদক্ষতা এগুলি শিখবার মত;

এর পর অষ্টোদের কন্টিনেন্ট বেড়ানোর কথা কিছু কিছু লিখে আমার লেখা শেষ করব।

গত ১লা অক্টোবর ভিক্টোরিয়া ষ্টেশন থেকে একটি বিরাট দলের সঙ্গে ট্রেণযোগে বেলা দশটার সময় আমরা রওনা হই। টমাস কুক আমাদের সকলের চার্জ নিয়ে তাদের ব্যবস্থামত রওনা হলাম। দলের মধ্যে আমরা চারজন ভারতীয় (আমরা দুজন ১টি নাগপুরের ও ১টি বম্বের মেয়ে) ছিলাম। আর বহুদেশের যাত্রী চললো। আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, মাইজিরিয়া, সাদেন্স, এদেন্স, সায়ারলেট ইত্যাদি প্রায় ৩০ জন নিয়ে বেশ একটি দল করে আমরা ডোভারে পৌঁছলাম। তারপর জাহাজে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ক্যালে পৌঁছি।

বিকেল ৪টের সময় আমরা ক্যালেতে এসে পৌঁছলাম। ক্যালে ফরাসীদের বন্দর এটা ইংরেজদের হাতে ২০০ বছর থাকার পর এখন আবার ফরাসীদের হাতে এসেছে। ১৯১০ থেকে ১৯১২ সালের ভেতর এখানে একটী টাউন হল প্রতিষ্ঠিত হয়। Flemish Renaissance এবং মিউনিসিপ্যাল ক্যাসিনো দেখে তারপর সমুদ্রের ধার দিয়ে Gravelenes এবং Dunkerque যাই। Dunkerque এ ১৯৪০ সালে খুব যুদ্ধ হয়। এরপর মোটরে করে এলাম Adinkerque। এটী একটী সমুদ্র তীরবর্তী ছোট শহর। তারপর এলাম La-Panne, তারপর La-Panne ছেড়ে সমুদ্রের ধারে বেশ বড় শহর নাম Ostend পৌঁছলাম। Ostend Belgium এর সব চেয়ে বড় বন্দর। Ostendএ রেসকোর্স, ক্যাসিনো থাকবার বাথ এবং প্রশস্ত বেলাভূমিতে বেড়িয়ে খুব আনন্দ পেলাম। এরপর এলাম Belgium এর রাজধানী Brussels, এখানে তখন বিরাট ব্যাপার World Exhibition হচ্ছিল তার ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যে, কীর্ত্তিকলাপে, তার নানাবিধ নৌকিন দ্রব্য দেখে ও বিজ্ঞানের ভাবধারা ও উন্নতি দেখে চোখ ঝলসে গেল। Brussels একটী হোটেলে (Albert Ler) বিশ্রাম করে সন্ধ্যা ৮ টার সময় একটী মোটর কোচে করে সহর দেখতে বেরুলাম। সহরের নৈশ দৃশ্য ও Exhibition এর প্রাচুর্য্য থেকে আমাদের (বেচারা বাংলা মায়ের ছেলে মেয়ে) বিশ্বাস হচ্ছিল না যে কোথায় এসেছি। একি ইন্দ্রপুরী না স্বর্গ? পৃথিবীতে এত অর্থশালী স্থান আছে সে কথা না দেখলে ধারণা করা অসম্ভব। পরদিন সকলে ৭॥ টা Brussels ছেড়ে আমরা Turvueren মধ্য দিয়ে Louvain সহরে পৌঁছলাম। এই সহর একটী বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র। এখানে একটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ পর্য্যন্ত মহাযুদ্ধে এই সহরের খুব ক্ষতি হয়, তবে এখনও অনেক বিখ্যাত অট্টালিকা আছে তারপর এগিয়ে চল্লাম আমরা। একটী পুরাণো সহর নাম St Trond এ পৌঁছলাম এটী একটী ব্যবসার বিরাট কেন্দ্র। St Trond ছাড়িয়ে Liege সহরে এসে যাবলাম এই সহর

বেশ-বর্ধিষ্ণু ও বিখ্যাত, সহরটী খুব সুন্দর পাহাড়ের উপর অবস্থিত দুটী নদী একটী Meuse এবং অপরটী Ourthe সঙ্গমস্থল বলে খুব খুবই চমৎকার। বর্ত্তমানে এটী Metal Industries এর জন্য বিখ্যাত. এই সব দেখে আবার রওনা হয়ে এসে পৌঁছলাম Aixlachapelleএর প্রান্তে জার্ম্মানী রাজ্য আরম্ভ হলো, এই সহরটী সম্রাট Charlemagne এর রাজধানী ছিল। তিনি যে Cathedral নির্ম্মাণ করেছিলেন এখনও সেটী দেখা যায় এবং Spa হিসাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী বিখ্যাত হয়ে আছে। আমরা তারপর Eifel Mountain এর উত্তর দিক দিয়ে যেতে যেতে Cologne সহরে পৌঁছলাম। বলতে ভুলে গিয়েছি যে আমরা যেখানে যেখানে নেবে দেখা শোনা করছি সেই সব জায়গাতে হোটেলে Lunch, Dinner চা, কফি, ইত্যাদি খেয়ে নিচ্ছি এবং রাত্রে একটী হোটেলে বিশ্রাম করে পরদিন Breakfast করে আবার রওনা হচ্ছি। এই সব ব্যবস্থাই আমাদের জন্য Thomas Cookএর লোক সব করে রেখেছেন।

কলোন ubii সব চেয়ে বড় সহর এবং সম্রাট Claudeus এর মহিষীর সম্মানের জন্য উহার নাম হয় কলোনিয়া। French Revolution পর্য্যন্ত এই সহরটী খুব বর্দ্ধিষ্ণু ছিল। এই সহরের নামানুসারে অডিকলোণের নাম হয়। এরপর আমরা এসে Bonn সহরে এসে পৌঁছলাম এখানকার বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় জার্ম্মানীর একটি গৌরব. সহরটি এখন West German Federal Republic Governmentএর রাজধানী. এখানেই বিখ্যাত Composer Beethovenএর জন্মভূমি। ক্রমে ধীরে বিখ্যাত রাইন নদীর ধারে এসে বেড়াতে লাগলাম। নদীর ধার দিয়ে দিয়ে আমরা রাইন ও Moselle নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত "Coblenz পৌঁছলাম। পার্ব্বত্য গ্রামের মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক Castlesএর পাশ দিয়ে নদীর উভয় তীরের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে এগিয়ে চল্লাম। মনে কত কথাই না জাগতে লাগলো সেই ছেলেবেলায় রাইন নদীর কথা ভূগোলে পড়েছিলাম তাতে তার সৌন্দর্য্য কতটুকু আর জানতে পেরেছিলাম? প্রকৃতি দেবী কত ভাবে কত যায়গাতে লাজিয়েছেন ও নিজেও সেজেছেন আমাদের যেন সব হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগলো, তাদের ফেলে আসতে কষ্ট হতে লাগলো। এবার আমরা এসে Bad Schwalbach একটি হোটেলে (Hotel Herzog-Von-Nassau) রাত্রির মত বিশ্রাম নিলাম, কোথা দিয়ে দিন কোথা দিয়ে রাত্রি চলে যাচ্ছে বুঝতে পারছি না। নিত্য নূতন দেশ, নূতন নূতন বেশে নূতন নূতন লোকজন দেখে মনের আনন্দে চলেছি। দেশ ভ্রমণে যে কত আনন্দ সেকথা ভুক্তভোগীরাই জানেন। পরদিন সকাল ৮টায় আবার চলা সুরু হলো। কন্‌কনে শীত, যতগুলো পেরেছি গরম জামা কাপড় শরীরে চাপিয়েছি, দেখা যাচ্ছে ঠিক যেন সাদা তুলো ভ্রূক্ষেপ নেই। এসে পৌঁলাম Wiesbaden এটি Rhine ও Main নদীর সঙ্গমস্থলে Industrial Centre। তারপর আমরা ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত Heidelberg এলাম। এখানকার University Libraryটী বহুমূল্য পুরাতন পাণ্ডুলিপিতে বোঝাই. যে দিকে তাকাই খালি বইতে ভর্ত্তি হয়ে আছে, এই Libraryটী 14th Centuryতে প্রতিষ্ঠিত। নদীর ওপর একটি Castle আছে সেটী 18th Centuryতে তৈরী হয়েছে, Hieldelberg এই Museumএ বিখ্যাত Town এখানে আরও কিছু ২ দ্রষ্টব্য স্থান দেখে আমরাBlack forestএর heastএর মধ্য দিয়ে Offenburg ও Freiburg এই দুটী সহর দেখে তারপর বেশ খানিকটা চড়াইতে উঠে আমরা বিখ্যাত লেক Titiseeতে গেলাম। Titisee জার্ম্মানীর Summer resort এবং winter Sports Centre। এখানকার হোটেলটীর নাম Schwarzwald Hotel। এই হোটেলটীতে বন্দোবস্ত খুব সুন্দর ছিল একটী সম্পূর্ণ পরিবার এই হোটেলটী চালাচ্ছেন তাঁদের ব্যবহারও খুব সুন্দর। এরপর আমরাআবার Black forestএর মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে ২ লেকের পাশ দিয়ে Schaffhausenএ পৌঁছে বিখ্যাত Rhine Falls দেখতে গেলাম, বহু দূর থেকেই জলের শব্দ শুনে আসছে। কাছে গিয়ে মনে হলো তুলোর মত ধবধবে শাদা জল অনেক উঁচু থেকে আছড়ে এসে পড়ছে। ছোট একটী কুঁড়িখানা জলের পাশে রয়েছে। আমরা সব নেবে গিয়ে

কটো তুললাম কফি খেলাম, কেউ আত্মীয়দের চিঠি পত্রও লিখে ডাকে দিল। একটী নব বিবাহিত দম্পতি ওখানে বসে তাদের বন্ধুদের নিয়েখেতে বসেছিল। তাদেরও কটো নেওয়া হলো, এবার আমরা চল্লাম Zurich, Zurich Switzerland এর Financial & Commercial Capital। Zurich সহরে রাস্তার দুপাশে সারি দেওয়া গাছ অনেক দূর পর্য্যন্ত এক লাইনে সুন্দর ভাবে সাজানো। Lake side promandes গুলি খুবই সুন্দর এখনও সে সব স্বপ্নের মত মনে পড়ে। তারপর আমরা Zug সহর পেরিয়ে Lakeএ অবস্থিত Lucerne সহরে এসে এখানকার প্রসিদ্ধ হোটেল Grand Hotel Europe বাসা বাঁধলাম। এই সহরটী খুব Popular holiday restort in Switzerland এখানে আমাদের Tour ম্যানেজার বললেন যে আমরা যদি আরও Extra বেড়ানো বা কিছু দেখতে চাই তবে তাঁরা ব্যবস্থা করবেন তবে আরও মাথা পিছু 6 £ করে দিতে হবে। আমাদের হাতের টাকা যদিও ফুরিয়ে এসেছে তবুও দেশ দেখার নেশায় রাজী হয়ে গেলাম। ফলে জিনিষপত্র কিছুই কেনা গেলনা শুধু দেশই দেখে এলাম। অতিরিক্ত এটাই আমাদের বেশী প্রয়োজনীয় ছিল ও তাতে আনন্দও পেয়েছি। যাহোক রাত্রে Grand Hotelএ থেকে পরদিন Breakfast খেয়ে মোটর লঞ্চে করে লেক বেড়াতে বের হলাম।

কি আনন্দ সকলের। কে কোন দেশের? কে কোন জাতি? কার কোথায় ঘর সব যেন ভুলে গিয়ে আনন্দে হৈ হৈ করতে সব বেড়াতে বের হলাম। কেউ বা গান গাইছে কেউ বা কটো তুলছে, লেকের একপাশে পাহাড় লেকের জল সবুজ পরিষ্কার চক্‌চক্ করছে। লেকের আর এক পাশে সহর সাজানো। ছোট ছোট সুন্দর ২ ছেলে মেয়েরা বেড়াচ্ছে ঠিক যেন রঙীন প্রজাপতি, ফুলে ২ চারিদিক আলো হয়ে আছে। স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা কত বড় শিল্পী এখানে এসে তাঁর চরণে প্রণাম জানালাম। যেখানে যেটী সাজালে ভাল হয় ঠিক সেখানে সেটী সাজিয়ে রেখেছেন, মোটর লঞ্চ এসে একটী সহরে থামলো। আমরা একে একে নেবে এলাম, চা কফি খেয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে এখানকার Museum দেখে এলাম এখানে Swiss life এর অনেক exhibits আছে, কিছু কেনা কাটাও কেউ ২ করলেন আমাদের অবস্থা তখন প্রায় নিঃসম্বল কারণ লণ্ডন থেকে আমরা ২ জনে মোটে 20 পাউণ্ড নেওয়ার অনুমতি পেয়েছিলাম, তারপর সন্ধ্যার সময় আমরা আবার মোটর লঞ্চে করে পূর্ব্বের হোটেলে ফিরে এলাম। সেই রাত্রি আবার হোটেলে থেকে সকাল বেলা খেয়ে দেয়ে আবার রওনা হলাম। শ্রান্তি নেই ক্লান্তি নেই কেবল নেশার মত যেন ঘুরে বেড়াচ্ছি যা দেখছি তা আর জীবনে দেখবোনা ভেবে যেন আরও কষ্ট হতে লাগলো। অবশেষে Interlaken একটী সুন্দর লেকের ওপর সাজানো একটী হোটেল নাম Matropole monopole এসে পৌঁছালাম, রাত্রে খাওয়া দাওয়া সেরে সকলে মিলে সেখানকার একটি গানের জলসায় নাচ ও গান শুনতে গেলাম, গানের কিছুই বুঝতে পারিনি শুধু কয়েকটী English গান বুঝতে পারলাম। রাত্রি ১২টায় বাড়ী ফিরে বিশ্রাম করে সকাল ১০টার মধ্যে আবার আমরা একটী ছোট ট্রেণে চেপে Ice Palace দেখতে চল্লাম পাহাড়ের উপর দিয়ে Light Train চললো কি ঠাণ্ডা তখন? চারিদিকে বরফ তবে সবই ছবির মত, ঐ ঠাণ্ডায় দেখেও ঘর বাড়ীগুলি পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে চারিদিকে ফুল। কোনটা ওপরে কোনটা নীচে বাড়ীগুলি অনেকটা হাজিলিংএর বাড়ীর মত। তখনই ঠাণ্ডার জন্য লোকজন কম। শুনলাম 15th Octoberএর পর ঐ রাস্তায় আর ট্রেণ চলে না। ট্রেণ ক্রমশঃ ওপরে উঠতে লাগলো মাঝে মাঝে ছোট ২ ষ্টেশন। ষ্টেশনে ২।১ জনের বেশী লোক নেই, এবার গিয়ে যেখানে থামলাম সেই যায়গাটীর নাম Jungfrau। ট্রেণ থেকে নেমে দেখলাম আমরা একটী tunnelএর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি তার মধ্যে Ceutral Heating থাকাতে ঠাণ্ডা একটু ও লাগছিলো না। এরপর Ice Palaceএ গেলাম, সমস্ত ঘর বরফ কেটে কেটে করেছে। এস্কিমোদের কথা বইতে পড়েছিলাম এবার তাদের বাড়ী ঘর ও তাদের চেহারা দেখলাম। কেউ কেউ ওখানে বাড়ীঘর তৈরী করে থাকে। October থেকে March মাস পর্য্যন্ত এখানকার ট্রেণ ইত্যাদি ঠাণ্ডার জন্য সব বন্ধ থাকে। মাঝে মাঝে সুন্দর সুন্দর হোটেল ও চোখে পড়তে

লাগলো। কোনোটা তখনই বন্ধ হয়ে গিয়েছে কোন কোন হোটেলে তখনও লোক আছে, October মাসের পরে এখানে এত বরফ পড়ে যে গাছ পালাও কিছু জন্মাতে পারে না। শীতে ওদের নীচে থেকে ওপর, ওপর থেকে নীচে আসতে হলে Cable অর্থাৎ Electric এর তারের সঙ্গে কাঁচের বাক্স তাতে ছজন বসতে পারে, তার ওপর বসে বাতায়াত করে ঠিক Rope wayর মতো। শুধু বরফে ঢাকা সাদা চারিদিকে দেখতে লাগলাম, Ice Palaceএর মধ্যে ঢুকে দেখলাম বেশ কেটে ২ রাস্তা করে ছোট ২ ঘর করেছে, আবার বরফ কেটে Crismas Tree করেছে, তারপর আরও উপরে যেতে লাগলাম সেখানে আর ঘরের ছাদ নেই চারিদিক খোলা, শুধু তুলোর মত বরফে পা ঢেকে যেতে লাগলো সে যে কি সুন্দর দৃশ্য লিখে জানানো যায় না। শীতে সব যেন জমে যেতে লাগলো কোন রকমে এসে আবার সব ট্রেণে উঠলাম। এবার আবার আমরা Interlakenএর হোটেলে এসে উঠলাম। পরদিন বেলা ৮ টার সময় Interlaken ছেড়ে আমরা বরাবর লেকের পাশ দিয়ে রাস্তা ধরে সুন্দর সুন্দর সাজানো সহর ও পাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে Thun সহরের দিকে এগিয়ে চললাম। লেকের পাশ দিয়ে ঘোরানো রাস্তা দিয়ে আমাদের মোটর চললো ক্রমে Switzerland এর Federal Capital Berne সহরে এসে পৌঁছলাম। Berne সহরটিকে বলা হয় ভালুকের সহর। আমরা Nydegg Bridge এর কাছে কয়েকটি Bear pit এ ভালুক দেখলাম। রাস্তাঘাটগুলি এত পরিষ্কার মনে হয় এইমাত্র কেউ ঘুরে ঘুরে রেখেছে। Switzerland এর প্রত্যেক রাস্তাই এমনি পরিষ্কার। থাকে থাকে বর্ণা ও Arcaded Streets আছে। সবই যেন ছবির মত সাজানো, ওখান থেকে আমরা নিউ চ্যানেল সহরে গিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজন করলাম, তারপর বেলা ২টার সময় Jura Mountains পার হয়ে ফ্রান্সে পৌঁছলাম। Jura পার হয়ে Levier জঙ্গলের মাঝ দিয়ে আমরা নীচে নামতে লাগলাম। কয়েকটি সহর পার হয়ে Louis Pasteurএর জন্মভূমি Dole সহর ও Beaune সহরের মদের কারখানা Burgandy প্রদেশের মধ্য দিয়ে ক্রমে এসে Autun সহরে এসে পৌঁছলুম। Autun সহরে Hotel St. Louisএ আমাদের আবার আস্তানা হলো—এক সময়ে Napoleon ও তাঁর পত্নী জোসেফিন বাস করেছিলেন, তাঁদের ঘরটি সেই ভাবে সাজানো রয়েছে আমরা সেই ঘর দিয়ে ঘুরে ঘুরে সব দেখলাম। আমাদের দেশেও কত বীর ছিলেন কত মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু তাঁদের জন্য কোথাও এভাবে বিশেষ করে সুন্দর ভাবে কিছু আছে বলে জানিনা যা দেখে এখনকার লোকের মনে এভাবে সাড়া দিয়ে ওঠে। Autunএ ২ দিন থেকে আবার আমরা প্যারিসে এসে পৌঁছলাম। প্যারিস একটি সহর, যার সম্বন্ধে বহু লোকের মনে বহু বাসনা জেগে আছে সেই সহরে এসে রাত্রির আলোকমালা সজ্জিত সহর ও সুন্দর সুন্দর বর্ণা···রাস্তা সব দেখে আশ্চর্য্য হলেও মন কিন্তু মুগ্ধ হলো না এ দেশের লোক যেন বিলাসিতার মগ্ন, উদ্দাম উচ্ছ্বাসের সঙ্গে এদের দিন কেটে যায়, এদের শুধু ভোগ লালসা প্রবল, ঈশ্বরে বিশ্বাস ভক্তি বিশেষ কিছু দেখলাম না, দেশের উন্নতির জন্য কর্ত্তব্য নিষ্ঠা পরিশ্রম যা জার্ম্মানীতে দেখেছি সে সব তেমন নেই, এরা কেবল হালকা ভাবে জীবন কাটিয়ে যায়, পরিশ্রমী নয়, রাস্তাঘাট ও বিশেষ কিছু পরিষ্কার দেখতে পেলাম না অনেকটা আমাদের দেশের মত সহরগুলি কোন সহর বেশ পরিষ্কার আবার কোন সহর ময়লা, গ্রামের ভেতরও আমাদের দেশের মত। প্যারিস সম্বন্ধে অনেকের খুব ভাল ধারণা হতে পারে তবে আমার মোটামুটি যা ধারণা তাই লিখে জানাচ্ছি, প্যারিসে আমাদের দেশের মত রাস্তার ধারে ধারে দোকানে নানা জিনিষ বিক্রী হচ্ছে। লোক সংখ্যাও খুব বেশী, পুরোণো জিনিষ পত্রের ও অনেক দোকান দেখতে পেলাম, প্যারিস থেকে সকলে Scent ও Silk ইত্যাদি কেনার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন অনেকে কিনলেন, সব জিনিস লণ্ডন থেকে সস্তা মনে হলো। প্যারিসে ২ দিন থেকে আবার আমরা মোটরে ক্যালে এসে পৌঁছলাম। এবার অনেকের সঙ্গে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল, কেউ কেউ প্যারিস আর কয়েক দিন থাকবার জন্য রয়ে গেলেন। Calais এসে জাহাজে উঠলাম

আমাদের মোটর কোচের ড্রাইভার আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে এলো, এতদিন এদের সঙ্গে ঘুরে সত্যিই যেন আপন জন হয়ে উঠেছিল। English Channel পার হয়ে ডোভারে এসে আবার সব ট্রেণে উঠলাম, সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ Victoria ষ্টেশনে এসে একে একে সকলের কাছে বিদায় নিলাম। কেউ আমাদের ঠিকানা নিয়ে নিল, কেউ কেউ আমাদের ফটো নিল। তখন মনে হয়নি আমরা কতদূর দেশের লোক, অন্য জাতি, অন্য দেশের লোক ভগবানের সৃষ্টি আমরা মানুষ, তখন তাই মনে হলো। আমাদের মধ্যে হিংসা দ্বেষ, রেষারেষি স্বার্থপরতার কারণ কিছুই না থাকাতে সব বিশেষভাবে একভাবে মিশে গিয়েছিলাম। আবার আমরা সব যে যার দেশে ফিরে এসে সে কদিনের কথা স্বপ্নের মত মনে করছি।

— ——

কৃষ্ণকলি

(উপন্যাস)

ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

(১৩)

বাড়ী ফিরে নিজের ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল রঞ্জন—তার চেয়ারে ও কে বসে, শঙ্কর না? হ্যাঁ তাই ত। কিন্তু সে অমন একাগ্রচিত্তে পড়ছে কি? তার ডায়েরী নয়? হ্যাঁ তাই ত। তাতে যে তার মনের অনেক গোপনীয় কথা লেখা আছে। রঞ্জন অত্যন্ত বিব্রতভাবে শঙ্করের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই শঙ্কর সচেতন হয়ে তার দিকে তাকাল। রঞ্জন বললে—ছিঃ ছিঃ শঙ্কর, তুমি কেন ওসব বাজে লেখা পড়ছ? খাতাখানা হাত থেকে টেবিলে নামিয়ে রেখে শঙ্কর বললে, পড়েছি ত কি হয়েছে? তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বোস।

তার মুখোমুখী একটা চেয়ার টেনে বসে রঞ্জন বলল, 'তুমি আজ অনেক আগে অফিস থেকে চলে এসেছ, তাই না?'

শঙ্কর বললে—'হ্যাঁ, যাবার সময় মার শরীরটা খারাপ দেখে গিয়েছিলুম, তাই চলে এলুম।'

রঞ্জন ব্যস্ত হয়ে বললে—'কি হয়েছিল তাই, মাসীমার? এখন কেমন আছেন?'

শঙ্কর উদাস স্বরে বললে—'শেষ বয়সে যা হয়, তাই আর কি। এখন অনেকটা সুস্থ আছেন।'

'যাক বাঁচা গেল'—স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রঞ্জন বলল—'তুমি বোস শঙ্কর, আমি একটু চায়ের ব্যবস্থা করি।'

শঙ্কর বললে—'সে ব্যবস্থা আমার ওখানে তৈরী আছে; তোমাকে সঙ্গে নেবার জন্যে আমি এসেছি। তুমি চটপট যা করবে করে নাও।'

রঞ্জন তার চোখের দিকে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে বললে—'কেন শঙ্কর, কি হয়েছে?'

শঙ্কর ম্লান হেসে বললে—'হবে আবার কি? কিছুই হয়নি।'

রঞ্জন বললে—'তবে?'

শঙ্কর এবার বন্ধুর মুখের পানে পূর্ণদৃষ্টিতে চেয়ে বললে—'আচ্ছা রঞ্জন, তোমার হয়েছে কি? রাতারাতি এমন বদলে গেলে কি করে? যে তুমি এতদিন রোজ বিকেলে আমার বাড়ী যেতে, আমরা একসঙ্গে চা খেতুম; সেই তুমি সাধ্যমত আমার বাড়ীর ছায়াও মাড়াও না—এর মানে কি?'

রঞ্জনকে হঠাৎ কে যেন সপাং করে পিঠে চাবুক মারল। নিজের অনিচ্ছাকৃত অপরাধ স্মরণ করে সে মনে মনে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠল। কিন্তু এ অপরাধ খালনের ত কোনও পথ নেই; এ যে অত্যন্ত গোপনীয়, অত্যন্ত প্রিয় স্মৃতি জড়িত, গভীর দুঃখজনক ব্যাপার।

তাকে নীরব দেখে শঙ্কর পুনরায় বললে—'বুঝেছি

রঞ্জন, তোমার মনে কোনও একটা ব্যাপার নিয়ে সন্দেহ এবং বেদনার উদ্রেক হয়েছে।"

রঞ্জন ব্যাকুল স্বরে বললে—'আমায় মাপ কর শঙ্কর; আমি অত্যন্ত স্বার্থপর। তাই, আমি নিজের অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে এমন অন্ধ হয়ে ছিলুম যে তোমার মত প্রিয়তম বন্ধুর কথা একবারও মনে পড়েনি। বিশ্বাস কর, এ আমার ইচ্ছাকৃত অপরাধ নয়।'

শঙ্কর মনে মনে পরম তৃপ্ত হয়ে বললে—"আমি কি তোমায় চিনি না? তোমার সঙ্গে কি আমার আজকের পরিচয়? সে কথা এখন থাক—চল, আমরা বেরিয়ে পড়ি।"

বহুদিন পর দুই বন্ধু আবার একত্রে চায়ের টেবিলে গিয়ে বসল। ভৃত্য এসে যখন চা পরিবেশন করল তখন দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নীচু করল। দুজনেরই চোখের সামনে ভেসে উঠল লক্ষ্মীর মত শ্রীমতী সুধার হাস্য-ময়ী মূর্তিখানি। সুন্দর সুডৌল হাত দুখানি বাড়িয়ে সে তাদের চা-খাবার পরিবেশন করছে। আজ সে নেই, কোথাও নেই; পৃথিবীর কোনও প্রান্তে গেলেও তার দেখা পাওয়া যাবে না, নিশ্চিহ্ন হয়ে সে মুছে গেছে জীবজগতের পৃষ্ঠা হতে। কিন্তু হৃদয়ের পৃষ্ঠায়? সেখানে তার অস্তিত্ব সজাগসজীব। কায়িক বিরহ-মিলনের বহু উর্দ্ধে, বহু উচ্চে তার স্বর্গীয় অবস্থিতি, গভীর প্রশান্তিতে মগ্ন। দুই বন্ধু নতবদনে আহার সমাধা করে তাদের চিরপরিচিত নাববী বিতানের পাশে, দুটি চেয়ার নিয়ে এসে বসল। বহুক্ষণ দুজনে দুজনের মুখের দিকে চেয়ে আনমনে বসে থাকার পর নীরবতা ভঙ্গ করে শঙ্কর এক সময়ে বললে—'তোমায় আজ এখানে ধরে এনেছি কেন, জান রঞ্জন?'

রঞ্জনের চোখের সামনে ভেসে উঠল, শঙ্করের তার ডায়েরী পাঠরত মূর্তিখানি; সে রঞ্জনের গোপন কথা সব জেনে নিয়েছে। বন্ধুত্বের দাবীতে, স্নেহের অধিকারে সে এখুনি রঞ্জনকে সেই ডায়েরী বিষয়ে যা খুশী প্রশ্ন করে বসতে পারে; কিন্তু রঞ্জন তার কি উত্তর দেবে? প্রেমকে অস্বীকার করতে গিয়ে কি মিথ্যে বলবে, না দুঃখকে বরণীয় করতে গিয়ে সত্য বলবে? তার বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো। কণ্ঠ হতে কোনও স্বর নির্গত না হওয়ার জন্য, সে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বন্ধুর মুখপানে চেয়ে রইল।

সে দৃষ্টির মিনতি নির্দ্দয়ের মত উপেক্ষা করে শঙ্কর বলল—'তুমি এখানে আর কেন আস না, আমি জানি, সে শুধু কৃষ্ণার জন্য। তুমি তার সামনে আসতে চাও না, এই না?'

রঞ্জন গভীর বিষাদে মাথা নীচু করল। শঙ্কর বললে—'না রঞ্জন, চুপ করে থাকলে চলবে না, আমার কথার জবাব দাও। তুমি নিজে দুঃখ পেয়ে আমাকে আর দুঃখ দিও না।'

রঞ্জন মুখ তুলে বললে—'আমি কি বলব, শঙ্কর?—কি তুমি শুনতে চাইছ?'

শঙ্কর বললে—'কৃষ্ণার প্রতি তোমার এমন সাংঘাতিক বিতৃষ্ণা এল কেন, সেই কথাই আমায় আগে বল।'

রঞ্জন একটু ইতস্ততঃ করে বললে—'সে সব অপ্রিয় কথা তুমি নাই বা শুনলে, শঙ্কর; শুনে তোমার এই দারুণ মানসিক অবস্থার উপর আরও দুঃখ পাবে।'

শঙ্কর বললে—'এই জন্য আমি এখনও মনে মনে দারুণ যন্ত্রণা পাচ্ছি, রঞ্জন।'

রঞ্জন বললে—'একান্তই তুমি শুনবে?'

শঙ্কর বললে—'হ্যাঁ শুনব; কোনও দ্বিধা না করে তোমার যা বলবার আছে, বল।'

রঞ্জন তখন ধীরে ধীরে কৃষ্ণার সঙ্গে পরিচয়ের সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত প্রণয়ঘটিত যা যা ঘটেছিল সে সমস্ত সবিস্তারে শঙ্করের কাছে বর্ণনা করল। তার নিজের মনের কোনও কথা গোপন রাখল না। কৃষ্ণার প্রত্যাখ্যানের নিষ্ঠুরতাকে চাপা দেবার কোনও চেষ্টা করল না।

রঞ্জনের কথা শেষ হলে শঙ্কর কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে বসে রইল। সন্ধ্যার ছায়া তখন বেশ ঘন হয়ে এসেছে। হাসুহেনার ঝাড়ের মধ্য থেকে অশ্রান্ত কণ্ঠে ঝিঁঝিঁপোকা ডেকে চলেছে করুণ একটানা সুরে। তার মধ্যে দুই বন্ধু মুখোমুখী স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। নিজের মাথার লম্বা কোঁকড়ান চুলগুলোর মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে শঙ্কর এক সময় বললে—, 'দেখ রঞ্জন, তুমি যে এই রকমই একটা মানসিক বৈকল্যের মধ্যে পড়েছ, এটা আমি আগেই অনুমান করেছিলুম; তারপর তোমার ডায়েরীর কিছু অংশ পাঠ করে আমি নিজের ধারণা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হই। কিন্তু

আমার সে ধারণা যে এমন জটিল রূপ ধরে আছে এ কথা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।'

রঞ্জয় ধীরে ধীরে বললে—'এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে তুমি কেন এত মাথা ঘামাচ্ছ শঙ্কর? এমন ত মানুষের জীবনে কত ঘটে—আবার এক সময় মানুষ সবই ভুলে যায়।'

শঙ্কর গম্ভীর কণ্ঠে বললে—'না রঞ্জয় আমাকে তুমি অত সহজে ভোলাতে পারবে না। কৃষ্ণার ব্যবহারে তুমি যে মনে কতখানি আঘাত পেয়েছ, সে কথা আমি আমার হৃদয় দিয়ে অনুভব করছি; এ যাতনা বড় অসহ্য। কিন্তু ভাই! আমায় তুমি দোষ নিও না—কেননা কৃষ্ণার সঙ্গে একবার কথা না বলে আমি তার সম্বন্ধে তোমায় কোনও কথা বলতে পারছিনে।' একটু থেমে সে আবার বললে—'আমি যতদূর তাকে জানি, তাতে অন্য কোনও ছেলের সঙ্গে তার প্রণয় আছে বলে আমার মনে হয় না; তবে সে তোমার ভালবাসাকে কেন এমনভাবে অপমান করল? এর মধ্যে কি রহস্য আছে তা তার সঙ্গে কথা না বলে আমি কিছু ত বুঝতে পারছিনে রঞ্জয়।'

রঞ্জয় দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বললে—'একটা কথা শঙ্কর?

শঙ্কর বললে—'কি কথা, বল—থামলে কেন?'

'তুমি কিছু মনে করবেনা ত ভাই?'—রঞ্জয় ভীত কণ্ঠে বললে।

শঙ্কর গম্ভীরভাবে বললে—'বুঝেছি, এই রকম ছোটখাটো মন নিয়েই তুমি আমায় ভালবাস, আর আমিই মিছে তোমার জন্যে ভেবে ভেবে মরি!'

রঞ্জয় বিচলিত হয়ে বলে—'না শঙ্কর, তুমি রাগ করো না। তুমিই আমার সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে আপনার। দেখ, এত বড় পৃথিবীতে একমাত্র তুমি ছাড়া আমার আপন বলতে আর কে আছে?'

শঙ্কর বললে—'তবে সেই বিখ্যাত আপন জনটির কাছে একটা কথা বলতে এত দ্বিধা করছ কেন?'

'বলছি ভাই-বলছি'—একটু নীরব থেকে রঞ্জয় বললে—'দেখ ভাই, আমার মনে হয় কৃষ্ণা বোধ হয় তোমাকে ভালবাসে।'

'আমাকে?'—শঙ্করের কণ্ঠস্বর ঠিক আর্ত্তনাদের মত শোনালে। 'কি বলছ তুমি রঞ্জয়! আমি ত এ কথা কখনো ভাবিনি!'

'আমার তাই মনে হয় শঙ্কর'—রঞ্জয় অবলম্বিত কণ্ঠে বললে।

শঙ্করের মাথার মধ্যে কেমন যেন সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। সে যে কি ভাববে, কি বলবে কিছুই ঠিক করতে পারছে না। সুদূর অতীতের, সঙ্কটময় বর্ত্তমানের এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কতকগুলি চিত্র একত্রিত হয়ে তার চোখের সামনে তাণ্ডব নৃত্য করতে সুরু করে দিয়েছে। বাগান তখন অন্ধকার হয়ে গেলেও গাড়ীবারান্দার নীচে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছিল বলে সেই আলোকরশ্মি এসে পড়েছিল দুই বন্ধুর মুখের উপরে। শঙ্করের বিহ্বল অবস্থা লক্ষ্য করে রঞ্জয় বললে—'থাকগে শঙ্কর, ওসব কাল্পনিক কথা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোন লাভ নেই। তার চেয়ে চল, ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করিগে। তারপর তোমার এখানে খাওয়া সেরে, চল—অনেক দিন পরে দুজনে মিলে একটা নাইট শো দেখে আসি।'

রঞ্জয়ের কোনও কথা কিন্তু শঙ্করের কাণে প্রবেশ করল না। সে নিজের মনে কি ভাবছিল, ভাবতে ভাবতে বলল—'দেখ রঞ্জয় কৃষ্ণাকে আমি অনেক ছোটবেলা থেকে জানি তুমি জান আমার খুব ছোট বয়সে বিয়ে হয়েছিল; সেই বিয়েরও আগে থেকে তাকে জানতুম। সে চিরদিনই আমার কথাবর্ত্তা শোনে, আমায় খুব মান্য করে; কিন্তু তাই বলে তার সে ভালবাসার কোনও দিন ত সামান্য আভাষের গন্ধও পাইনি আমি।'

রঞ্জয় বুঝতে পারল সে মৌচাকে ঢিল মেরেছে। এখন এই বিপর্য্যস্ত অলিকুলকে শান্ত না করলে আর নিস্তার নেই। সে তাই হাত বাড়িয়ে শঙ্করের কাঁধে একখানি হাত রেখে মৃদু কণ্ঠে বললে—'ছেড়ে দাওনা ভাই ও কথা। কৃষ্ণা যেমন আমারও কেউ না, তোমারও সেই রকম কেউ না। তার সম্বন্ধে চিন্তা করে লাভ কি? এমনওত হতে পারে তোমায় যা বলেছি সে আমার ভুল ধারণা!'

শঙ্করের মনে যে কিসের প্রতিক্রিয়া সুরু হয়েছে সেই জানে। তাই সে আত্মগোপনে অধৈর্য্য হয়ে বললে—'না, ভুল ধারণাই বা তোমার মনে উদয় হবে কেন?'

রঞ্জন একটুখানি চুপ করে রইল। তারপরই মৃদু কণ্ঠে বললে—'না শঙ্কর, তুমি ঠিকই বলেছ; এ ধারণা আমার খাঁটী সত্যি।'

শঙ্কর হিম তুহিন স্বরে বললে—'ঠিক বলেছ, সত্যি?

রঞ্জন বললে—হ্যাঁ।

শঙ্কর বললে—'কৃষ্ণা আমায় ভালবাসে এবং তার ভালবাসা সকাম?'

রঞ্জন মৃদুকণ্ঠে বললে—'হাঁ ঠিক তাই!

শঙ্কর স্তিমিত কণ্ঠে বললে—'আর আমি? আমার সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা?'

রঞ্জন পূর্ব্ববৎ স্বরে বললে—'তুমি কাউকে ভালবাস না, প্রেম সম্বন্ধে উদাসীন—'

শঙ্কর বাধিত কণ্ঠে বললে—'আজ সুধা নেই বলেই তুমি আমায় এই কথা বলতে পারলে।'

রঞ্জন বললে—'সুধা বৌদিকেও তুমি কোনওদিন ভালবাসতে না শঙ্কর!

শঙ্কর বিস্ময়ে ফেটে পড়ল। সে অধৈর্যে বললে—'থামো রঞ্জন, থামো! তোমার কথা আমি আর সহ্য করতে পারছি নে। কি পাগলের মত যা' তা' বকছো তুমি?'

শান্ত কণ্ঠে রঞ্জন বললে—'আমি ঠিকই বলেছি শঙ্কর, একটাও ভুল কথা বলিনি। সময়মত তুমি আমার কথাগুলো একবার ভেবো, দেখবে তোমার মনের সঙ্গে হুবহু মিলে যাবে।'

শঙ্কর দুই হাটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে ছিল। এক সময় মাথা তুলে ডাকল—'রঞ্জন, রঞ্জন!' কোনও সাড়া না পেয়ে সে আরও উচ্চকণ্ঠে ডাকল—তাতেও কোন সাড়া নেই! অথচ ভিতর থেকে ভৃত্য মদন ছুটে এসে বললে—'ডাকছেন বাবু?'

শঙ্কর বললে—'দেখ ত রে রঞ্জনবাবু ভিতরের ঘরে গেছে কি না—'

মদন সম্মতি জানিয়ে চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল—'না বাবু, তিনি ত ভিতরে কোথাও নেই, নিজের বাসায় চলে গেছেন বোধ হয়।'

শঙ্কর শূন্যদৃষ্টিতে একবার চতুর্দ্দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর ধীরে ধীরে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করল।

অন্ধকার বারান্দার এক কোণে জপের মালা হাতে নিয়ে বসে ছিলেন শঙ্করের বৃদ্ধা জননী। পুত্রকে দেখে তিনি ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বললেন—'ও রে খোকা! কৃষ্ণারা দেশ থেকে ফিরে এসেছে। বিকেলবেলা তাদের বাড়ী থেকে লোক এসেছিল খবর নিয়ে। তোর পিসীমা তোকে ডেকেছে।

আবার সেই কৃষ্ণার প্রসঙ্গ! শঙ্কর মনকে পাথরের মত কঠিন করে মায়ের পাশে এসে বসে বললে—'যাবখন মা এখন ও সব কথা। আগে বল তুমি কেমন আছ?'

পুত্রের মাথায় হাত দিয়ে বৃদ্ধা বললেন—'ঘরের মধ্যে একলা একলা কেমন যেন ভয় ভয় করে আসছিল, বাবা! তাই একটু বাইরে বেরিয়ে এসে বসেছিলুম।'

শঙ্কর মনে মনে ভীষণ লজ্জিত হয়ে উঠল। আহা! সারাদিন একা একা কি করেই না মার দিন কাটে! দেশের অত বড় বাড়ী, অত লোকজন, সারা জীবনের অভ্যস্ত সমস্ত ছেড়ে এসে, তাঁর না জানি কত কষ্টই এখানে হচ্ছে!

মায়ের কোলের মধ্যে মাথা গুঁজে শুয়ে সে বললে—'মা গো! এখন তোমার আর একটুও একলা লাগবে না; আমি সারা রাত্রি তোমার সঙ্গে বসে বসে গল্প করবো।'

মা হেসে বললেন—'হ্যাঁ আমার চোখে যেন একটুও ঘুম নেই! সারা রাত্রি বুড়ো ছেলের সঙ্গে বসে গল্প করলেই হয়ে যাবে!'

শঙ্কর মায়ের হাটুটা শক্ত করে চেপে ধরে বললে—'তা তুমি ঘুমোও না, ঘুমোতে তোমাকে কে বারণ করছে?'

বৃদ্ধা তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন—'আমার বাবা জেগে বসে থাকবে আর আমি তার সামনে পড়ে পড়ে ঘুমোব, তা কি কখনও হয়?'

শঙ্কর উঠে বসে বললে—'তবে এখন আমায় কি করতে হবে তাই বলো?'

বৃদ্ধা বললেন—'লক্ষ্মী বাবা আমার! এখন নীচে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে আয়, রাত অনেক হয়েছে। তারপর আমরা দুজনে সারারাত বসে গল্প করবো, কেমন?'

গভীর রাত্রি, নিবিড় অন্ধকার, নির্জ্জন সুপ্তপ্রায় পল্লী। শুধু ঝিল্লীর একটানা গুঞ্জন ছাড়া আর কোনও শব্দ কর্ণগোচর হয় না। এমনি সময় কি একটা স্বপ্ন দেখে শঙ্কর

ধরমর করে বিছানার উপর উঠে বসল। সে অন্ধকারে সামনের দিকে হাত প্রসারিত করে দিয়ে স্বাগতভাবে বলে উঠল—'কই সূর্যা, তুমি কোথায় গেলে? আমার সামনে এস।'

কিন্তু কোথায় সূর্যা! তার চোখের সামনে অন্ধকার তেমনি জমাট বেঁধে রইল; সেখানে সূর্যার সুন্দর রূপের আভা একটুও ফুটে উঠল না। নিরাশ হয়ে সে শয্যায় শুয়ে পড়ে যেই চোখ বন্ধ করেছে, অমনি সেই বন্ধ চক্ষুর সামনে ফুটে উঠল সূর্যার হাসি হাসি সুন্দর মুখখানি। সে বললে —'কেন গো! আমায় অমন করে ডাকছ কেন?' শঙ্কর কি বলবে! গভীর আবেগে তার গলার স্বর বন্ধ হয়ে গেল। তার দুঃখকাতর হৃদয় আকুল হয়ে কামনা করতে লাগল—সূর্যা যদি আগের মত আবার তার কাছে আসে, পাশে এসে বসে, তাহলে সে তার সমস্ত কৃত অপরাধের মার্জ্জনা চেয়ে নেয়; সে জানে সূর্যাকে সে অনেক দুঃখ দিয়েছে। কিন্তু তখন কি সে জানত যে সূর্যা অমন অতর্কিতে তাকে ছেড়ে চলে যাবে, আর সেই দুঃখের বোঝা তার বুকে দ্বিগুণ হয়ে ফিরে এসে শেলের মত বিঁধে থাকবে? কিন্তু সূর্যাকে কামনা করার সঙ্গে সঙ্গেই তার সুন্দর মূর্ত্তিখানি তার চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল। আবার তিমির তমসায় ঢেকে গেল তার অশ্রুবাষ্পাচ্ছন্ন দৃষ্টিপট। কাণের পাশে শুধু ভেসে বেড়াতে লাগল রঞ্জনের মর্ম্মস্পর্শী কথাগুলি—কৃষ্ণা তোমায় ভালবাসে, তুমি কাউকে ভালবাস না; সূর্যা বৌদিকেও না।

অতি নির্ম্মম নিষ্ঠুর হলেও এ অতি সত্য কথা; শঙ্কর শত চেষ্টা সত্ত্বেও এ কথা অস্বীকার করতে পারে না। সত্যই সে উদাসীন, তার উদাস চিত্তপটে সহসা কোনও স্পর্শ অনুভূত হয় না, কোনও রেখাপাত করতে পারে না। মনে মনে সে চির নিঃসঙ্গ; জীবনের অনন্ত পথের নিরুদ্দিষ্ট পথিক। সেখানে কেউ নেই, কিছু নেই; সে একা, চির একা।

কিন্তু এই নিদ্রাহীন রাত্রি তাকে ব্যাকুল করে তুলেছে আরও একটি প্রশ্নে; সেটি হচ্ছে কৃষ্ণার সম্বন্ধে প্রশ্ন। সত্যই কি কৃষ্ণা তাকে ভালবাসে? তাই রঞ্জনের প্রেমকে অমন নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে? কিন্তু এর প্রতিকার কি করে সম্ভব হবে? সে যদি শঙ্করকে সম্রমের সঙ্গে দূরে রেখে আজীবন কুমারী থাকতে মনস্থ করে থাকে? আর শঙ্কর তার মনের সমস্ত কথা অবগত হয়েও তাকে আজীবন নিঃসঙ্গ ও জীবনের পূর্ণ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করে রাখবে? শঙ্করের সঙ্কটময় অবস্থা দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েই কি সূর্যা মৃত্যুকালে বলেছিল—'কৃষ্ণাকে তুমি বিয়ে কোর!'

বিয়ে, আবার বিয়ে! সেই ছোটবেলায়, মধুপুর গড়ের জঙ্গলে দেখা সেই ছোট্ট মেয়ে কৃষ্ণকলি; তাকে বিয়ে করতে হবে? না, না—শঙ্কর আর বিয়ে করতে পারবে না, কিছুতে পারবে না। কৃষ্ণার তৃষ্ণার্ত্ত বঞ্চিত আত্মা সম্মুখে তৃষ্ণার বারি রেখে আকণ্ঠ শুকিয়ে তিলে তিলে মরে যাক, তথাপি ও তার ওষ্ঠে তুলে দিতে পারবে না সুমিষ্ট শীতল পানীয়। রঞ্জনের ম্লান মুখের দিকে চেয়ে সে কৃষ্ণার মুখে হাসি ফুটাতে পারবে না—কিছুতেই না। দুই হাতে সবলে নিজের মুখখানি চেপে ধরে শঙ্কর কাতর কণ্ঠে বলে উঠল—'রঞ্জন, রঞ্জন! আমায় ক্ষমা কর বন্ধু, ক্ষমা কর। তোমার কৃষ্ণাকে আমি কিছুতে হৃদয়ে স্থান দিতে পারব না; প্রাণপণে চেষ্টা করব তাকে তোমার হাতে তুলে দিতে। আত্মার অগোচর কিছুই নেই। তাই এই রাত্রিকে সাক্ষী রেখে আমি তোমার উদ্দেশে অকপটে স্বীকার করছি যে, কৃষ্ণা আমার আশৈশবের অতি প্রিয়, অতিহৃদয় সঙ্গিনী। তার উপস্থিতি আমার মনে আনন্দ জাগায় প্রচুর। তবে আমার দেহগত কামনায় তার বিন্দু মাত্র স্পর্শ কোনও দিন অনুভব করিনি; এ অতি সত্য কথা।

অস্থির হৃদয়ে শঙ্কর শয্যার উপর উঠে বসল। চতুর্দ্দিকের অন্ধকার রাশির পানে চেয়ে তার নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। সে দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে ছাদে চলে এল। ভোর হতে তখন বেশী দেরী ছিল না, আকাশের পূর্ব্বপ্রান্তে অস্পষ্ট শ্বেতাভা দেখা দিয়েছে। আকাশ থেকে বার বার ঝরে পড়ছে হেমন্ত রাত্রিশেষের তুহিন হিমবিন্দু। তারি মৃদু আঘাতে রাশি রাশি ঝরে পড়ছে শিউলি ফুল; জবাগাছের ঝাড়ে ধীরে ধীরে ফুল মেলছে রক্তমুখী কলিগুলি। দুপারীবাগানের মধ্য দিয়ে

হু হু করে ছুটে আসছে ঠাণ্ডা বাতাস। শঙ্করের মাথার চুল হিমে ভিজে উঠেছে, ঠাণ্ডা বাতাসে গায়ে শির শির করে কাঁটা দিচ্ছে, সেদিকে তার কোন খেয়াল নেই। সে অস্থির ভাবে সেই ভিজে ছাদে পদচারণা করে বেড়াচ্ছে। পূর্ব্বাশার প্রান্তে তার ব্যথাহত দৃষ্টি স্থিরভাবে নিবদ্ধ রয়েছে; কখন নবোদিত সূর্য উদয় হবে? সেই প্রাতঃসূর্যের বিমল কিরণ স্পর্শে সে নিজের মনকে পবিত্র ও নিষ্কলুষ করে নেবে, পৃথিবীপতির কাছে নতুন জীবনের দীক্ষা নেবে। ভারমুক্ত হয়ে সে মানবের কল্যাণসাধনে ব্রতী হবে। একটি হৃদয় হরণ করে যাওয়ার বিনিময়ে সে সহস্র হৃদয় জুড়িয়ে তুলবে। অজ্ঞাতসারে সে মনে মনে আবৃত্তি করতে লাগল:

"ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদি স্থিতেন,
যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।" (ক্রমশঃ)

মহিলা সমাচার

শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ

রবীন্দ্র পুরস্কার মহিলার ভাগ্যে: ১৯৫৮-৫৯ সালের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার অন্য ভাষাতে লেখার মৌলিক পুস্তক রচনার জন্য ৫০০০৲ "রবীন্দ্র পুরস্কার" শ্রীমতী উমা মুখোপাধ্যায় এম এ ও তাহার স্বামী অধ্যাপক শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়কে প্রদান করিয়াছেন: Origin of the National Education movement পুস্তকের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। এ পুস্তক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীমতী উমা দেবীর গবেষণা করিবার অধ্যবসায় ও শক্তির পরিচয় আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। দিনের পর দিন আমাদের নিকট আসিয়া অরবিন্দ সম্পাদিত "বন্দেমাতরম"এর File পাঠ ও নকল করিতে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। তাঁহাকে রবীন্দ্র পুরস্কার প্রদানে, প্রকৃত গুণিকে আদর করা হইয়াছে।

সঙ্গীত বিশারদ বঙ্গললনা: শ্রীমতী অনুরাধা বন্দ্যোপাধ্যায় লখনউ ভাতখণ্ডে সঙ্গীত বিদ্যালয় পরিচালিত পরীক্ষায় "সঙ্গীত বিশারদ" উপাধি পাইয়াছেন এবং পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম হইয়াছেন।

মহিলার ভাগ্যে সঙ্গীত নৃত্য একাডেমীর পুরস্কার: ভারত সরকার কলা ও কৃষ্টির উন্নতির উৎসাহ দিবার জন্য "সাহিত্য একাডেমী" "সঙ্গীত-নাটক" ও 'নৃত্য একাডেমী' স্থাপন করেছেন নিউ দিল্লীতে। সর্ব্ব-ভারতীয় পরিপেক্ষিতে জাতি ভাষা নির্বিশেষে হাজার হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়। ১৯৫৮-৫৯ সালের নৃত্যের জন্য সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ভরতনাট্যম নৃত্য বিশারদ শ্রীমতী গৌরী অম্মা পাইলেন।

লণ্ডনে রবীন্দ্র নাটক অভিনয়ে রজনীর কৃতিত্ব: সম্প্রতি লণ্ডন সহরে ইণ্ডিয়া আর্ট সোসাইটীর উদ্যোগে কিং জর্জ হলে রবীন্দ্র নাথের "পরিত্রাণ" নাটক অভিনীত হয়। বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী সহ বহু লর্ড, লেডী ও গুনী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাহারা অভিনয় দেখিয়া বিশেষতঃ মেয়েদের অভিনয়ে মুগ্ধ হন ও বাঙ্গলা ভাষা না বুঝিয়াও তাহার মধুর ঝঙ্কারে আনন্দ পান। উদয়াদিত্যের ভূমিকায় শ্রীমতী সুমিতা চৌধুরী, রামীর ভূমিকায় শ্রীমতী কৃষ্ণাদাস রাজ মহিষীর ভূমিকায় শ্রীমতী সবিতা বসু অভিনয় করিয়াছিলেন।

জাপানের যুবরাজের সাধারণ মেয়ে বরণী: জাপানের সম্রাট বংশ ২০০০ হাজার বৎসরের প্রাচীন। সুদীর্ঘকাল রাজরক্তে প্রবাহিত কুলে তাহাদের বিবাহই সিদ্ধ ও প্রচলিত। সে রুদ্ধ দ্বার ভেঙেছে জ্যোতির্ম্ময়। যুবরাজ আকিহিতো সুন্দরের ও সংস্কৃতির

অকৃত্রিম উপাসক : তিনি সুন্দরী শ্রেষ্ঠ ও নানা গুন কুশিতা সাদরণ ঘরের কন্যা শ্রীমতী মিচিকা লোতীকে বিবাহ করিলেন ১০ই এপ্রিল ১৯৫৩। সম্রাট হিরোহিতো প্রাচীন রাজ নীতির দৌরবান্বিত বলিয়া বিবাহ সভায় উপস্থিত হন নাই। পরে অপত্য স্নেহে ও বধূর গুণে রাজ বধূকে সস্নেহে বরণ করিয়া লইলেন।

প্রথম ভারতীয় মহিলা বিমান অফিসার : ডাঃ শ্রীমতী গীতা চন্দ এম, বি, ১৯৫৭ সালে ভারতীয় বিমান বাহিনীর অফিসার পদে নিযুক্ত হন। সম্প্রতি বিমান হইতে প্যারা-সুটে অবতরণ শিক্ষা আগ্রা বিমান শিক্ষা ক্যাম্পে গ্রহণ করিতেছেন। তাহার সাহস ও দক্ষতা দেখিয়া সকলে চমৎকৃত। মেয়েরা বরণ দেয় ও অসীও ধরে তাইত জগদ্ধাত্রী রূপে পূজা পায়।

অ-বাঙ্গালী মেয়েদের বাংলা ভাষা শিক্ষায় কৃতিত্ব : নিখিল ভারত বঙ্গ ভাষা সমিতি প্রতি বৎসর অ-বাঙ্গালী যাহারা বাংলা শিখিয়াছেন তাহাদের 'আদ্য' 'মধ্য' ও 'অন্ত' পরীক্ষা গ্রহণ করেন। মধ্য পরীক্ষায় রবীন্দ্রনাথের "কথা ও কাহিনী" "গল্প গুচ্ছ" বঙ্কিম চন্দ্রের "রাধারাণী" ও শরৎ চন্দ্রের "বিন্দুর ছেলে" পাঠ্য পুস্তক এবং পরীক্ষক স্বয়ং ডাঃ শ্রীকুমার ব্যানার্জি মহাশয়। সম্প্রতি মহারাষ্ট্র ভবনের তিলক হলে উক্ত সমিতির সমাবর্ত্তন উৎসব হয়। সভাপতি ছিলেন জনাব রুমায়ুন কবির। উদ্বোধন করেন কলিকাতার মেয়র শ্রীবিজয় ব্যানার্জি, প্রধান অতিথি আমেরিকান কনসল মিঃ ন্যাস বাংলায় বক্তৃতা দেন। প্রসিদ্ধ তামিল কবি সুব্রহ্মানি ভারতীর তৈল চিত্র উন্মোচন করেন শ্রীজননী কান্ত দাস। মহারাণী অহিরাণী বর্ত্তমান, জাপানের কনসল জেনারেল আদি অনেক বিশিষ্ট অ-বাঙ্গালী উপস্থিত ছিলেন। ৩৮ জন সার্টিফিকেট পান। তাহাদের মধ্যে প্রথম স্থানীয় ৭ জন মেয়েরাই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া পদক ও পুরস্কার পাইয়াছেন ;

শ্রীমতী মীনাক্ষী সুন্দরম (তামিল) প্রথম হইয়া "মীরা রত্ন" স্বর্ণ খচিত পদক, বাংলা সঙ্গীত করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার কুমারী জি যোগাম্বল "রামকুমার ভাণ্ডলকার" স্বর্ণ ও "জ্যোতির ময়ন্তী" স্বর্ণ খচিত পদক দুইটী পান।

শ্রীমতী উর্ব্বশী বুপেলিয়া (গুজরাতি) মিসেস্ বরদা রাও (মাদ্রাজী), শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী সুব্রাহ্মনীয়, মিসেস্ জে সরস্বতী (তামিল), শ্রীমতী মধুরম্মল গনেকান, শ্রীমতী রঞ্জন কে, ভোরা, নলিনী শেঠ, ইন্দুমতী যোশী মিস্ যোগাম্বল বসুমতী পারিখ, শ্রীমতী চন্দ্র পুজারী শ্রীমতী এস এলামুল পারিতোষিক পান।

শ্রীমতী পল্লবী মেটা শ্রীমতী দয়া বসুরী, শ্রীমতী কে. সরস্বতী বাঙ্গালা গান ও আবৃত্তির জন্য পুরস্কার পান। আজ পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলে অধ্যাপিকা বিজয়া সেনগুপ্ত বি, এ, বি, টি।

বঙ্গ সরকারের মহিলা সেক্রেটারী : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ হোম পলিটিকেল বিভাগের যুগ্ম সেক্রেটারী মিস্ রমা মজুমদার আই এ এস নিযুক্ত হইয়া কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তিনি দার্জিলিং জিলার অতিরিক্ত ডেপুটী কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

পঃ বঙ্গ সঙ্গীত নৃত্য নাট্য এ্যাকাডেমী উপাধি : পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে নৃত্য নাট্য এ্যাকাডেমী যোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর আওতায় বিরাট নব সৌধে প্রতিষ্ঠিত তাহার প্রথম উপাধি পরীক্ষায় মেয়েরাই বেশী কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ৯ঠ সঙ্গীত উপাধি পাইয়াছেন—আরতি রায়, কেতকী ঘোষ, প্রীতি ব্যানার্জি, মীরা ঘোষ, উমা দে পাল, বনানী ঘোষ, যন্ত্র সঙ্গীতে বীণা হস্ত এবং নৃত্যে অর্চ্চনা মিত্র, অমিতা সেনগুপ্ত, দিলীপ চৌধুরী, নাট্য অভিনয়ে মমতা চাটার্জি, দিপ্তী চক্রবর্তী উপাধি পাইয়াছেন।

ইন্দিরা দেবীর ভাগ্যে রবীন্দ্র ভারতী পুরস্কার : রবীন্দ্র ভারতীর কর্তৃপক্ষরা স্থির করিয়াছেন দুই বৎসর অন্তর রবীন্দ্রসাহিত্য ও জীবনী সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট লেখক বা লেখিকাকে ৩০০০৲ পুরস্কার দিবেন। বর্ত্তমান বর্ষে সেই পুরস্কার ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের বাল্য সহচরী অশীতি বৎসরোপরি প্রবীণা শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে প্রদান করা হইয়াছে।

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি

(ক) কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্নার পরিদর্শন

গত ২০শে মে, বুধবার বেলা এগারটায় কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রী খান্না সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি পরিদর্শন করেন। শিল্পবিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ব্রতচারী নৃত্য ও গীতের দ্বারা তাঁহাকে স্বাগত জানায়। সমিতির সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, সাধারণ সম্পাদিকা এবং বিদ্যালয় সম্পাদিকা তাঁহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।

শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও শ্রী খান্না সহাস্যমুখে সমিতির বিভিন্ন বিভাগ ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখেন এবং ছাত্রীদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। শতকরা ৭৫টি ছাত্রী উদ্বাস্তু এবং তার মধ্যে শতকরা ৪০ জন আবার দুঃস্থা, বিধবা এবং নিরাশ্রয়া জানিয়া তিনি দুঃখপ্রকাশ করেন এবং তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন। যাহাতে এই সমস্ত ছাত্রীরা সরকারের সাহায্য পাইয়া এই শিল্পকার্য্যের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হইতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা করিবেন বলিয়া ভরসা দেন। তিনি তাঁহার নিজস্ব স্বাভাবিক সরল প্রাণখোলা বাক্যালাপ ও হাসির দ্বারা তাঁহার স্বল্পকালীন পরিদর্শনসময়কে মধুর করিয়া তোলেন। পরিশেষে তিনি সমস্ত বিভাগের কার্য্যের প্রশংসা করেন এবং প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কামনা করেন।

(খ) কংগ্রেস সভানেত্রী কর্তৃক পরিদর্শন

গত ২৩শে মে, শনিবার সাড়ে তিনটায় কংগ্রেস সভানেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি পরিদর্শন করেন। শিল্পবিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ব্রতচারীর মাধ্যমে তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানায়। সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা, বিদ্যালয় সম্পাদিকা এবং কর্মীবৃন্দ শ্রীমতী

সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতিতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

গান্ধীকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বিদ্যালয়ের সকল বিভাগ, বিশেষতঃ শিল্পবিভাগ পরিদর্শন করিয়া কর্মনিরত ছাত্রীদের শিল্পকার্য্য দেখিয়া অতীব সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে এই প্রতিষ্ঠানের বহুমুখী গঠনমূলক কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করিয়া প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করেন।

প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ সভ্য এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মাননীয় অতিথিদ্বয়ের পরিদর্শনের উভয় দিনে উপস্থিত ছিলেন। এই বিশিষ্ট অতিথিদ্বয়কে আমাদের ভিতরে পাইয়া আমরা কৃতার্থ ও গর্ব্ব বোধ করিতেছি।

সমাজসেবা শিক্ষা শিবির—১৯৫৯

সরকারের শিক্ষাগুরুর সাহায্যে এবং তাঁদের পরিকল্পনা অনুযায়ী সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির পরিচালনায় ২৪ পরগনা জেলার দক্ষিণ সড়িষায়, ১৪ই মার্চ অপরাহ্ণ হইতে ২৯শে মার্চ মধ্যাহ্ন পর্যন্ত এক 'সমাজ সেবা শিক্ষা শিবির' পরিচালিত হয়। ৫০ জন বয়স্কা শিক্ষার্থী এই শিবির শিক্ষাকেন্দ্রে যোগদান করে।

সমিতির সভাপতি শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ আনুষ্ঠানিক ভাবে ১৫ মার্চ শিবির শিক্ষাকেন্দ্র উদ্বোধন করেন। উপমন্ত্রী শ্রীমতী মায়া ব্যানার্জী এবং সরোজনলিনী সমিতির অনেক বিশিষ্ট সভ্যা এই উদ্বোধনানুষ্ঠানে যোগদান করেন। উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীযুক্ত ঘোষ শিবিরশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তথ্যমূলক ভাষণ দেন।

প্রাত্যহিক কার্য্যসূচী

ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় শিক্ষা লাভের উৎকর্ষের লাভের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রাত্যহিক কার্য্যসূচী তৈয়ী করা হয়। ভোর ৫ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্যন্ত শিক্ষার্থীদিগকে নানাবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। শিক্ষণ শিবিরের ভারপ্রাপ্ত কর্মী প্রথম দিন তাদের কিভাবে শিবির পরিচালনা করা হইবে—তা বুঝাইয়া শিবির অধিনায়িকার অধীনে শিক্ষার্থীদিগকে ৪টি বিভাগে (প্রত্যেক বিভাগে দশজন করিয়া) বিভক্ত করা হয় এবং প্রতিটী বিভাগে একজন নেত্রী নিযুক্ত হয়। প্রতিদিনের কর্মসূচীর পর রাত্রে শুইবার পূর্ব্বে প্রত্যেক শিক্ষার্থিনী যাহাতে প্রতিদিনের ডায়েরী লিখে তার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়।

শিক্ষার্থীদের প্রাত্যহিক কার্য্যসূচীর অন্তর্গত প্রধান প্রধান কার্য্য ও শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ নিম্নে দেওয়া হইল। ভোর ৫ ঘটিকায় শয্যাত্যাগ, প্রার্থনা ও আরাধনা সঙ্গীত, আত্মিক উন্নতি বিধানের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে জ্ঞানদান।

ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে তথ্যমূলক জ্ঞান দান, এবং কর্মীরা নিজ হস্তে বাসস্থান, তৎসংলগ্ন বারান্দা, নালা-নর্দ্দমা প্রভৃতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতিও প্রতিটি শিক্ষার্থীকে বিশেষভাবে সচেতন করা হয়। মনের শুচিতা বাহিরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর যে বহুলাংশে নির্ভর করে—শিক্ষার্থীদিগকে তাহা কথায় ও কাজে বিশদরূপে জানান হয়। জলল পরিষ্কার, ফুল ও সব্জীবাগান প্রস্তুত বিষয়ে কর্মীরা হাতেকলমে জ্ঞানলাভ করে।

শিক্ষা—সাহিত্য, নীতি, ধর্ম্ম, রাষ্ট্রগঠনও পৌরবিজ্ঞান, গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, প্রাথমিক চিকিৎসা, রোগী পরিচর্য্যা, শারীর চর্চ্চা, ব্রতচারী, শিল্প শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

সমাজসেবা ও বয়স্ক শিক্ষা—শিক্ষার্থীদের এক একটি বিভাগ নিকটবর্ত্তী পল্লীসমূহে যাইয়া নিরক্ষরা বয়স্কাদের শিক্ষা দেয় এবং স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা গৃহস্থালী প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা ও শিক্ষাদান করে।

শিল্প শিক্ষা—শিক্ষার্থীদিগকে নিয়মিত শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। কতিপয় অভিজ্ঞা শিল্প শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে ছাটকাট, সূচিশিল্প, বাঁশ ও বেতের দ্বারা নানাবিধ জিনিষ তৈরী, খেলনা তৈরী, ঘড়ির কাজ, প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়।

প্রাথমিক চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব—সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের মনোনীত একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও প্রাথমিক চিকিৎসার বিষয়ে শিক্ষা দেন।

আমোদ প্রমোদ—শিক্ষার্থীদের চিত্তবিনোদনের জন্য শিক্ষাপ্রদ ভ্রমণ, ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা ও নাটকাভিনয় প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, জননায়ক, ঐতিহাসিক, যাঁহারা শিক্ষার্থীদিগকে জ্ঞান ও আনন্দ দান করিয়াছেন কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাদের নাম ও আলোচ্য বিষয়ে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে —

শ্রীমতী মায়া ব্যানার্জী—সমাজে নারীর স্থান ও কর্ত্তব্য। কিভাবে জনহিতকর কাজ করা যায়। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা।

শ্রীউষানাথ রায়—প্রাথমিক চিকিৎসা।

শ্রীঅমিয়জীবন মুখার্জী—বিভিন্ন দেশের নারী এবং আমাদের দেশের কৃষি ও কৃষক।

শ্রীমতী ভক্তি সেন—পরিবারে পরিকল্পনা।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ব্যানার্জী—ভবকর্তা।

শ্রীমতী মীরা দত্ত—সমাজসেবা।

সরোজনলিনী সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য ও সভ্যা, শিল্প বিদ্যালয় ও ট্রেণিং কলেজের এবং সমিতির কর্মীবৃন্দ এই শিবিরশিক্ষা কেন্দ্রের সুষ্ঠু পরিচালনার ভার অক্লান্ত শ্রম স্বীকার করেন।

২৯শে মার্চ্চ শিক্ষার্থীদের বিদায়মুহূর্ত্ত করুণ ও বিষাদময় হইয়া উঠে। ১৫ দিনের ভিতরে তাহারা পরস্পরের সহিত বিশেষ সৌহার্দ্য ও প্রীতির বন্ধনে যে আবদ্ধ হইয়াছিল বিদায়কালীন বেদনাদায়ক শেষ পর্যটতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সামাজিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই অনুভূতির মূল্য অপরিহার্য্য। তরুণীদের সরল, সরল, মধুর ও কোমল হৃদয়ের পরিচয়ে সকলে মুগ্ধ। তাহারা যে আদর্শ এই স্বল্প-সময়ে পাইল, তাহা তাহাদের ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিফলিত করিয়া স্ব স্ব গৃহ ও সমাজকে সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিবে এই আশা করি।

লোক সংবাদ

(ক) রায় বাহাদুর শ্রী জে, পি, আগরওয়ালার পরলোকগমনে আমরা একজন সমাজ-হিতৈষীকে হারাইলাম। তিনি সরোজনলিনী সমিতির আজীবন সভ্য ছিলেন এবং কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতিতে তিনি পাঁচ বৎসর সহ-সভাপতি থাকিয়া সমিতির উন্নতিকল্পে কাজ করিয়াছিলেন। সরোজ নলিনী সমিতিকে ব্যক্তিগত অর্থদানে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের ভিতর স্বর্গতঃ রায় বাহাদুর জে, পি, আগরওয়ালার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার স্বর্গত আত্মার শান্তি কামনা করা যাইতেছে।

(খ) সরোজনলিনী সমিতির সাধারণ সভ্যা শ্রীমতী সান্ত্বনা রায়ের মৃত্যুতে আমরা একজন দরদী বন্ধুকে হারাইলাম। তিনি সমিতির যুগ্ম-কোষাধ্যক্ষ শ্রীপ্রফুল্ল কুমার রায়ের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। তাঁহার স্বর্গত আত্মার শান্তি কামনা করা যাইতেছে।

(গ) সরোজ-নলিনী সমিতির মহিলা কর্ম্মী শ্রীমতী সুবোধবালা ঘোষ গত মার্চ্চ মাসে পরলোক গমন করেন। তিনি ২৩ বৎসর কাল সমিতির মাধ্যমে নারী সমাজের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বর্গত আত্মার শান্তি কামনা করা যাইতেছে।

শোক-সভা

স্বর্গতঃ সুবোধবালা ঘোষের উদ্দেশ্যে গত ১৮ই এপ্রিল সমিতি ভবনে এক শোক-সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমতী মিতা ঘোষ, শ্রীমতী চিত্রলেখা সিন্হা, শ্রীমতী মণিকা গুপ্ত, শ্রীমতী অমিতা চৌধুরী, শ্রীমতী মনীষা রায় এবং সমিতির আরও অনেক সভ্যা ও সরোজনলিনী প্রতিষ্ঠানের সকল বিভাগের কর্মী, ছাত্রীবৃন্দ ও ১১টি মহিলা সমিতির প্রতিনিধি এই শোক-সভায় যোগদান করেন। শ্রীমতী মনীষা রায় সভানেত্রীত্ব করেন। চেষ্টা ও নিষ্ঠার দ্বারা অতি সাধারণ অবস্থা হইতে শিক্ষা ও সমাজ সেবার উচ্চতর পর্য্যায়ে যে পৌঁছা যায় স্বর্গতঃ সুবোধবালা ঘোষ তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ছিলেন বলিয়া তাঁহার সহকর্ম্মীরা বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন। সভায় শোকচ্ছায়া পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার স্বর্গতঃ আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে প্রার্থনান্তে সভা সমাপ্ত হয়।

কাঁচড়াপাড়া মহিলা সমিতি

এবার রেলওয়ে সপ্তাহে ইষ্টার্ণ রেলওয়ের মধ্যে কাঁচড়া-পাড়া সমিতি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া রানার্স আপ শীল্ড পাইয়াছে এবং ৫ জন সভ্যা পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। দিল্লীতে সর্ব্বভারতীয় রেলওয়ের হস্ত ও কারুশিল্প প্রদর্শনীতে এই সমিতির ১০টী জিনিষ প্রদর্শিত হয় এবং ২ জন সভ্যা প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। যে দশটী শিল্প সামগ্রী দিল্লী প্রদর্শনীতে পাঠানো হইয়াছিল ইষ্টার্ণ রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার তাহার জন্য প্রশংসা পত্র পাঠাইয়াছেন।

এবারে শীল্ড, পুরস্কার ও প্রশংসাপত্রাদিতে সমিতির ছাত্রী ও সভ্যাদের মধ্যে বেশ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

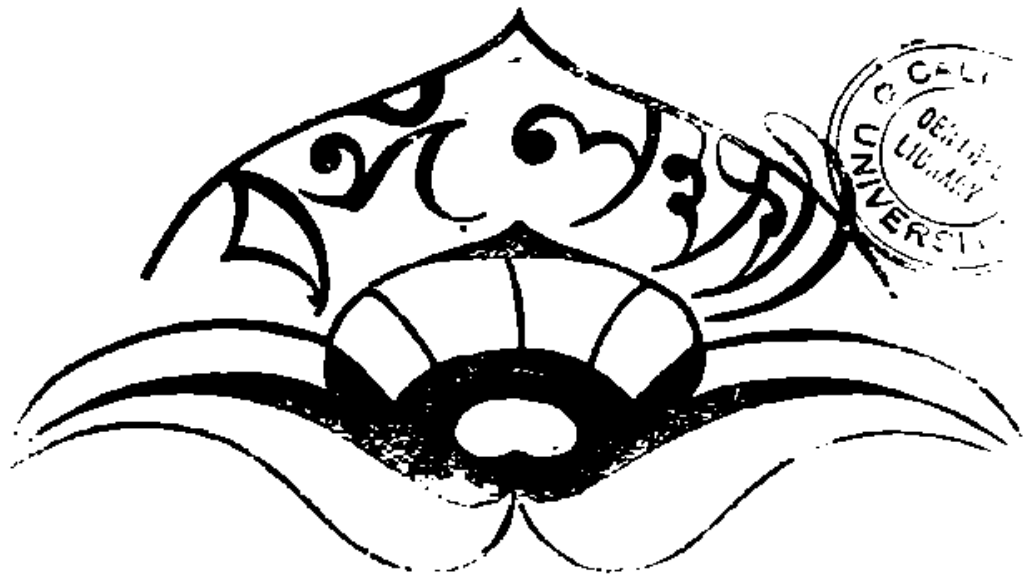

৩৪শ বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩৬৬ [৩য় সংখ্যা

স্মরণীয়া অন্নপূর্ণা

তুমি কবিতা ভালবাসতে
ভালবাসতে সাহিত্য।
এই সাধনাই ছিল তোমার জীবনের পরমতম সত্য।
এরই মাধ্যমে তুমি ফুটে উঠেছ
ফুলের মত।
গৌরবে ভরে উঠেছে নানাদিক
যে পাপড়ী ঝড়ে গেছে সমীরাহত
সেও ধূলায় স্থান পেয়েছে তার সঠিক।

যে তোমার প্রস্ফুটনের মাঝে
দেখেছে নিজের প্রতিকৃতি,
চেয়েছে তোমার অকুণ্ঠ সহানুভূতি,
সেখানেও ফুটেছে তোমার পরম পূর্ণতা।
নিজের অন্তর সম্পদ দিয়ে
পূর্ণ করেছে অন্যের রিক্ততা।

তোমার সেই নিজ হাতে পোঁতা গাছে
আজও কোটে ফুল হলুদ আর লালচে,
আজও তার সৌরভ কেঁপে কেঁপে ওঠে,
বোবা ঘরের কোণে
রাশীকৃত বইর মলাটে।

অব্যক্ত আবেদনে চঞ্চল হয়ে উঠে মন
শুধু ততক্ষণ, এ ফুলের ও প্রাণ আছে যতক্ষণ।
ওই লালচে আর হলুদের নিষ্প্রভ বাহারে,
ওই পুঞ্জীভূত সঞ্চয়ের পাহাড়ে
তোমার হারিয়ে যাওয়া সত্তা মনে হবে।
তারপরও শ্রাবনের এই সৃষ্টি করা মেঘ মহোৎসবে
অপরাহ্নের অস্তমান সূর্যের স্বর্ণালোকে,
তোমার এই মহাসুপ্ততা ভাস্বর করবে
শাশ্বত কালকে।

অমৃতের সাধনা

শ্রীমীরা দেবী

বেশ কিছু দিন আগেকার ঘটনা—আজকে এর মূল্য কতখানি জানিনা, কিন্তু যেদিন ঘটেছিল সেদিন এর গুরুত্ব ছিল অনেকখানি। যে গুরুত্বের ভারে নিজে গিয়েছিল আনন্দের সব উৎস। আজ অবশ্য সবই সহজ, সহনীয়, ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বসে বসে ভাবছেন মিসেস দত্ত ফেলে আসা অতীতটার দিকে তাকিয়ে। বয়সের ভারে ঝুলে পড়েছে দেহটা, পদমর্য্যাদার ভারে আভিজাত্যের বোধটাও একটু উঁচুতে উঠে গেছে কিন্তু সব কিছুর আড়ালে চাপা পড়া মনটা মাঝে মাঝে দোল খায় স্মৃতি-তন্ত্রীতে।

কলেজ থেকেই নিয়ে গেল এলবার্ট হলে, বিশেষ বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়েছে ইংরাজী সাহিত্যের ওপর; ইংরাজীতে অনার্স ছাত্রীদের এবং ছাত্রদের তাই সমাবেশ সেখানে। প্রফেসার দত্ত ওয়ার্লড ট্যুর করে এসেছেন। সঞ্চয় করেছেন অগাধ অভিজ্ঞতা, সকল দেশের সকল কালের সাহিত্যের রস গ্রহণ করে রসদ সংগ্রহ করেছেন প্রচুর, তারই খানিক আজ পরিবেশন করবেন ভাবী উজ্জ্বল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে আছে ছেলে-মেয়েরা। মঞ্চের ওপর উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসার দত্ত। প্রথমেই সু-চেহারার হরণ করলেন সকলের মন, তারপর কথার যাদু গেঁথে গেঁথে সাজিয়ে তুললেন বিরাট হলটা, আর মন্ত্রমুগ্ধ করলেন প্রতিটি উৎসুক হিয়া।

দেখে থেকে এক কোনে বসেছিল রোগা ছিপছিপে প্রতিমা মুখার্জী চিরদিনের মুখচোরা মেয়ে, সবাই শুনছিল বক্তৃতা, সেও শুনছিল। আরো কিছু কি সে শুনতে পেয়েছিল? শুনেছিল কি বক্তার অব্যক্ত বাণী, দেখতে পেয়েছিল কি তার ভেতরকার সেই একা মানুষটাকেও অসহায় তোলানাথের সন্ধান পেয়েছিল কি সেই মানুষটির মাঝে না-দেখাই কল্পনা দিয়ে রচনা করল তাঁকে।

কি জানি কি হল; বক্তৃতা শেষ হ'ল। থেমে গেল সেই গুরুগম্ভীর ধ্বনি নিস্তব্ধে মুক্ত করল হাই পাওয়ারের বাতিগুলো, অনেকগুলো জুতোর মসমস্ আওয়াজে ডুবে গেল কিছুক্ষণ আগেকার সেই গম্ভীর সুর কিন্তু ডুবলো না প্রতিমার কাছে, সরু মোটা গলার আওয়াজ, জুতোর শব্দ ট্রাম বাসের ঘড়ঘড়ানি সব কিছু ছাপিয়ে সেই একই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হ'তে থাকল তার মনে এবং প্রাণে।

এরপর সুরু হ'ল ঠিকানা খোঁজা, বাইরের ঠিকানা খুঁজতে খুঁজতে মনের ঠিকানারও খোঁজ চলতে থাকল। বোধহয় ঠিকানাও মিলল, কিন্তু অমিল হ'ল মতবাদে। চিরাচরিত নিয়ম—নূতনের সঙ্গে পুরাতনের বিরোধ, বিরোধ মনের সঙ্গে বাইরের, সংঘাত হৃদয়ের সঙ্গে প্রথার। চিরকালের মুখচোরা মেয়ে মুখর হ'ল। বাবাকে জানাল সব কথা; কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হ'ল সে ঘরের বাতাস, ঘাট চেয়ার টেবিল ফুল দানীতে ফুলের গুচ্ছ ফ্রেমে বাঁধা ছবি; ক্যালেণ্ডারে তারিখগুলো ওবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল প্রতিমার মুখের দিকে। শুধু প্রতিমার বাবার দৃষ্টি নীচে কার্পেটের দিকে—বোধহয় খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন কার্পেটের ওলাকার ঘাটি বিন্দু বিন্দু ঘামে ভরা কপাল ছেয়ে গেছে গলার কাছটা কেমন যেন ব্যথা করে উঠছে, প্রতিমা কিন্তু নির্ব্বিকার।

প্রথম বাবু ভেবে পেলেন না রাগ করবেন কি না। ও মেয়ের ওপর রাগ করা তো যায় না, বড় কর্ত্তব্য পরায়ণ মেয়ে বড় ভাল মেয়ে তাঁর, তবে কেন সে এমন ভুল করল। সেদিনটা ভাববার সময় চেয়ে নিলেন মেয়ের কাছ থেকে।

শুধু একটি কথাই বলেছিলেন মেয়েকে প্রথম বাবু, "তুমি তো ভাল পার্টনার পেলে! তোমার জীবন সুখের হবে সব দিক দিয়ে, কিন্তু আমার অন্য মেয়েরা? প্রথম সন্তান তুমি, তোমাকে দিয়েছি কায়দুর হাতে তুলে, এরপর তাদের তো ঘরে বিয়ে হওয়া মুস্কিল, আর সকলেই যে নিজের উপযুক্ত বর বর খুঁজে পাবে তারও তো স্থিরতা

নেই। কিন্তু এ ঘটনা যদি না ঘটে, তা'হলে আমার পক্ষে সংঘ হবে, উপযুক্ত পাত্রে তাদের পাত্রস্থ করার।"

প্রতিমার বুকটা একবার শুধু কেঁপে উঠেছিল, শুকিয়ে উঠেছিল ঠোঁট দুটো। নির্ভীক নিঃসঙ্কোচ গলায় সে বলল তার বাবাকে—"আমি তোমার পায়ে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করছি বাবা, তোমার আঘাত দেব না। কিন্তু তোমাকেও একটা কথা রাখতে হবে। আমার বিয়ের কোন চেষ্টা আর কোরো না।"

সেদিন থেকে প্রতিমাকে আর কেউ দেখেনি কোন সভা সমিতিতে বা বাইরের জগতে। পড়ার ঘরে বন্দী করল সে নিজেকে। বছরের পর বছর পার হয়ে যায় ডিগ্রীর পর ডিগ্রী বেড়ে যায় প্রতিমার।

পর পর তিন বোনের বিয়ে হয়ে গেল দুই ভায়েরও। অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেছে। সদরতলীর ছোটখাট একটা স্কুলের হেডমিষ্ট্রেস প্রতিমা মুখার্জী। খুঁজলে হয়ত ২।১ গাছা রূপোলী চুল পাওয়া যাবে, ভাল করে দেখলে হয়ত দেখা যাবে কপালে গালের পাশে ভাঁজ পড়েছে, চোখের দৃষ্টি হয়েছে ক্লান্ত, পায়ের গতি হয়েছে মন্থর।

প্রমথ বাবু ভাবেন মেয়েটি তার পাথর। অপরাধী মনে হয় নিজেকে। যুগের হাওয়া অনেক বদলেছে। সেদিনের প্রথা যা ছিল কঠিন আজ তা শিথিল হয়েছে, তবু প্রতিমা কেন এখন কঠিন হয়ে রইল। ভুলে গেছে কি সেদিনের সব কথা—না অভিমান? কিছুই বুঝতে পারেন না, অবসন্ন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। মাঝে মাঝে বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে, তখন দরকার হয় হুকোর নলটার। তামাকের ধোঁয়ায় আর কাশির দমকে একাকার হয়ে যায় অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ।

অনেক দিন আগেই কাগজে একটা খবর বেরিয়েছিল, প্রফেসার দত্ত বিলেত যাচ্ছেন, ইংলিশ লিটারেচারের ওপর রিসার্চ করার জন্য। আস্তে করে নীল পেন্সিলের দাগ দিয়েছিলেন প্রমথ বাবু। জানি না আর কেউ সেই কাগজটার সেই বিশেষ কটা লাইনের ওপর আর কোন অক্ষের দাগ বুলিয়েছিল কি না। আজ দীর্ঘদিন পরে আবার একটা খবর বেরিয়েছে :-সস্ত্রীক প্রফেসার দত্ত ফিরে এসেছেন ভারতবর্ষে সঙ্গে ছেলেমেয়েও আসছে। বলা বাহুল্য স্ত্রীটি বিদেশিনী।

এবার দাগ বুলিয়েছিল প্রতিমা আর আড়াল করে রেখেছিল খবরটা বৃদ্ধ বাবার চোখের সামনে থেকে।

একটা বছর কেটে গেল—পৃথিবীর বয়স আর এক বছর বেড়ে গেল। পরিবর্তন ঘটল মস্ত বড় হয়ে প্রতিমার জীবনে; প্রফেসার দত্তের স্ত্রী মারা গেছেন দুটি শিশু সন্তান নিয়ে ভদ্রলোক একা। বয়স হয়েছে, তার ওপর আপন-ভোলা মানুষ।

পঁয়ত্রিশ বছরের প্রতিমা ফিরে গেল ১৫ বছর আগের দিনে—ঠিক তেমনি নির্ভীক কণ্ঠে বাবাকে গিয়ে বললে—"বাবা এবার তোমার সমাজের কাছে সব মাশুল শোধ করা হয়ে গেছে। প্রথার বন্ধন ছিন্ন হলে আজ নিশ্চয় তোমার আত্মশোধ করবার কিছু থাকবে না, এবার তুমি অনুমতি দাও তার পাশে গিয়ে দাঁড়াবার সময় এসেছে। এখনও যদি না যাই তবে নিজের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ব।"

আর একবার অবাক হ'বার পালা এল বৃদ্ধপ্রমথবাবুর। ভীরু কণ্ঠে প্রশ্ন করেন, "আজও সেই লোকটাকে তুই মনে রেখেছিস। কি মূল্য দিয়েছে সে তোর একনিষ্ঠতার। যেম বিয়ে করেছে। জীবনের সব আনন্দটুকু ভোগ করেছে, যশ, মান সমস্তই সে ভোগ করেছে। কি দিয়েছে তোকে? তুই সমস্তটা জীবন বঞ্চিত হয়ে রইলি কার জন্য? একটা অপদার্থ অমানুষ, তার পায়ে বলি দিতে চলেছিস নিজেকে!

বলি দিয়েছি বাবা নিজেকে, কিন্তু মানুষের বা দেবতার পায়ে নয়—দিয়েছি সমাজের পায়ে। যশ, মান, সম্পদ তিনি তো আমায় দু' হাত ভরে দিতে চেয়েছিলেন, বাবা সেদিন আমি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম, আজ তিনি অক্ষম, অসহায়, জরা-গ্রস্ত, আমাই তো তাঁর আমাকে বিশেষ প্রয়োজন।"

প্রমথ বাবু বুঝলেন মেয়েটা আর একবার ভুল করতে চলেছে। বাধা দিলেন না, দেবার সামর্থ্যও আজ তাঁর নেই কোন কারণও নেই।

পলি আর ডিংকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন

মিঃ দত্ত। আয়া পারছে না সামলাতে। ভাবছেন তিনি বিলেতে পাঠিয়ে দেবেন তাদের মামার বাড়ীতে। কিন্তু ব্যথার মোচড় দিয়ে ওঠে বুকের ভেতরটা, ও কথা ভাবতে গিয়ে। সে ব্যথার উপশম হ'ল প্রতিমা যেদিন এসে হাল ধরল, তার ভাঙা চোরা সংসারটার প্রথমটা চিনতে পারেন নি। তারপর ভেবেছিলেন—বোধহয় প্রতিশোধ নিতে এসেছে নেটিভ মেয়েটা। তারপর গর্ব্ব বোধ করেছিলেন নিজের খোক টাকার অঙ্কটা স্মরণ করে। সবশেষে কিন্তু অবাক হলেন, যখন দেখলেন টাকার হিসেব প্রতিমা চাইল না কোনও দিন।

নানা কথার রটনা হল, নানা জটলা, অনেক কানাঘুষা প্রকৃতির পরাজয় বুড়ো বয়সের ভীমরতি ইত্যাদি অনেক বিশেষণ প্রতিমার চরিত্রের পেছনে জোড়া হ'ল। প্রতিমা কিন্তু অচল, অটল। বঞ্চিত কি সে সত্যিই? না—না দেহকে তো সে চায় নি, চেয়েছিল দেহাতীতকে তাকে তো সে পেয়েছে। প্রকেশার দত্ত তো একটা উপলক্ষ্য মাত্র নিভৃতে সাধনা তার যে অমৃতের জন্য সে অমৃতের সন্ধান সে পেয়েছে বৈকি; তাই আজ চাওয়া পাওয়ার হিসেব কষার প্রয়োজন নেই তার। সে পেয়েছে, সে জিতেছে, সে পরিতৃপ্ত এইটেই বড় কথা। যা পাওয়া হ'ল না সেটা তুচ্ছ যা পেয়েছে সেটা অনেক বড়। তার নাগাল সবাই পায় না। পায় দু একটা প্রতিমা যারা পৃথিবীর আনাচে কানাচে আজও বেঁচে আছে, যাদের খুঁজে পায় না আজকের সভ্য সমাজ।

পড়ন্ত রোদের আলোটা চোখের ওপর এসে পড়েছে। নতুন শীতের আমেজে গাটা কেমন শির শির করছে। পাশে রাখা টিপয়টায় আওয়াজ করতেই ছুটে এল মার্সি। ঘরে যাবার সময় হয়েছে মিসেস দত্তর। অতীতের অতল সমুদ্র থেকে মনটা আবার ফিরে এল বর্ত্তমান গতানুগতিক জীবনটাকে সজাগ করে দেবার জন্য বোধ হয়। ডিক্ ফিরে এল অফিস থেকে ঘড়ি বেজে চলেছে চং চং।

যুগ পরিবর্ত্তন

শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র দে

বর্ত্তমান যুগে ভারতের যে পরিবর্ত্তন ঘটেছে সে সম্বন্ধে লোকের ধারণা স্পষ্ট নয়। অনেক সময় শুনা যায়, কালের অধোগতি হয়েছে—বর্ত্তমান যুগে অমঙ্গল ঘটে চলেছে মানুষ প্রাচীন যুগের আদর্শ ও নিষ্ঠা হতে ভ্রষ্ট হয়েছে। মানুষকে মঙ্গলের পথে আনতে হলে পূর্ব্বতন যুগের মত ও পথে ফিরে যেতে হবে। পূর্ব্বের যুগ ছিল স্বর্ণযুগ বা সত্যযুগ। স্বর্ণযুগকে অনেকে রামরাজ্য বলেন। রামরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন যে আজ সম্ভব নয় সকলেই তা জানেন। তবু রামরাজ্যের স্বপ্ন লোকের মন হতে যেতে চায় না। কলি যুগকে কেবলমাত্র চৈতন্যযুগের প্রবক্তা অভিনন্দন করেছেন।

প্রণমিয় কলিযুগ সর্ব্বযুগ সার।
যেই যুগে হরিনাম কীর্ত্তন প্রচার।

এই প্রবচন প্রাচীন যুগের অবসানে গণযুগের আরম্ভ ঘোষণা করেছে। অন্ততঃ বলতে হয় ইহা ধর্ম্মাধিকারের যুগের আরম্ভ। জনগণের নানা অধিকার লাভের সূচনা বলে মনে হয়—রাষ্ট্রীক, আর্থিক, সামাজিক। রামরাজ্যে ছিল রাজার ও রাজন্যের নিরঙ্কুশ অধিকার। কথিত এই—ধর্ম্মশাস্ত্র এই অধিকারকে নিয়ন্ত্রণ করত আর সেই ধর্ম্মশাস্ত্রকে অমাত্যরা প্রয়োগ বিধান দিত। সাধারণ প্রজার কোন অধিকার ছিল না। তাহাদের কর্ত্তব্য ছিল মাত্র আনুগত্য। সাধারণ প্রজার মধ্যে নিম্ন শ্রেণীর ধর্ম্মের অধিকার ছিল না, শিক্ষার অধিকার ছিল না—ব্রাহ্মণসন্তানের অকালমৃত্যুর কারণ শূদ্রের তপস্যা জানিয়া তার শিরশ্ছেদ করা হল একলব্যের বঞ্চিতা অনধিকারচর্চ্চার দণ্ডরূপে তাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ উৎসর্গ

করতে হল, তাকে বহুবিধঃ বিসর্জন দিতে হল। সত্যকামের ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় অভাবে তার লাঞ্ছন হল

পূর্ব্বকালের জীবন ছিল ছাড়া ছাড়া, ভেদ বিভেদ আকীর্ণ। এখনকার জীবন ঘনিবিষ্ট। পূর্ব্বে জগৎ ছিল বিস্তৃত ব্যাপক। এখন দেশ বিদেশ সব অত্যন্ত সন্নিকট। এক দেশের ভাগ্যের সঙ্গে অন্য দেশের ভাগ্য জড়িত। এক মানুষের ভাগ্যের সঙ্গে অন্য মানুষের ভাগ্য জড়িত। ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প সংস্কৃতি সকল বিষয়ে সর্ব্ব জাতি ও লোক এখন পরস্পরের সঙ্গে জড়িত কোন দেশের অমঙ্গলে অন্য দেশের মঙ্গলসাধন হয় না প্রাচীন যুগে অনার্য্য ব্রাহ্মণ দস্যু কিরাত নিষাদ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির লোকদের সহিত যুদ্ধকে অধর্ম বলে পরিগণিত হত না। বরং ইহা বীর্য্য বিক্রমের ক্ষেত্র ছিল। অশ্বমেধ যজ্ঞ পরাক্রম প্রকাশ করত। দাস প্রথা প্রচলিত ছিল। দিগ্বিজয়ের নেশা ছিল।

সেকালে এখনকার এরোপ্লেন, মাইক, রেডিও টেলিগ্রাফ, বাস, ট্রাম, মোটর, রেল ষ্টীমার ছিল না, কারখানার এঞ্জিন, কল ইত্যাদি ছিল না। এরোপ্লেন ছিল না যুদ্ধাস্ত্র, কাগজ, ডাক যোগাযোগ, খবরের কাগজ, সাধারণ শিক্ষার স্কুল কলেজ, শিল্পকারখানার বিরাট উৎপাদন, নগর, বন্দর অঞ্চলে পরস্পরের দ্রুত যোগাযোগ ছিল না। জীবিকা অর্জ্জনের এখনকার দুর্দ্দাম সংগ্রাম ছিল না। জনসংখ্যার বিপুল বিস্তৃতি ছিল না। এখনকার বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার ফল প্রতিটি মানুষ ভোগ করছে। ইচ্ছা করলেও এখন আর কারও অবিজ্ঞানের যুগের অবস্থাতে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়।

এখনকার যুগ হল সাম্যের যুগ। সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার যে পতাকা ১৮৭৯ সালে ফরাসী বিপ্লব উড়িয়েছিল, এখন নানাদেশে তারই আদর্শে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠিত বা পরিবর্ত্তিত হচ্ছে। পূর্ব্বকালে ভেদবুদ্ধি প্রবল ছিল। স্তরে স্তরে সমাজ বিন্যাস ছিল উচ্চ নীচ ভেদ ছিল এখনকার যুগের আদর্শ সাম্যবাদ—যা ভেদ আছে তাকে ক্রমে অপসারণ করতে হবে—সমান সুযোগ দিয়ে। আদর্শ হবে—all for each and each for all—সব কিছু প্রত্যেকের জন্য এবং প্রত্যেক সকলের জন্য। প্রতি গৃহ পরিবারের প্রতিবাসীওয়ার যে আদর্শ আছে তারই প্রসার সমস্ত দেশে ও দেশান্তরে হবে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে মানুষের ধর্ম ও জাতিবোধ নিয়ে বিবাদ বিসম্বাদ ঘটত এখন রাষ্ট্রক্ষেত্রে ও সামাজিক আচরণে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িক ভেদের স্থান নেই। হিন্দু বেদান্তীর মত —একমেবাদ্বিতীয়ম্—এক ঈশ্বর, অন্য নাই। সত্যমেব জয়তে, সত্যের জয় হইবে। ঈশা বাস্যমিদম সর্ব্বং যৎকিঞ্চ—ঈশ্বর সর্ব্বভূতে ও সর্ব্বজনে বিরাজিত। দিব্যো হি অমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যা ভ্যন্তরোহি—তিনি মূর্ত্তিবর্জ্জিত দিব্য পুরুষ তিনি বাহিরে ও ভিতরে। ন তস্য প্রতিমা অস্তি—তাঁহার আকার নাই প্রতিমা নাই। হিন্দু শাক্ত বৈষ্ণব আদি বললেন—ভগবান মানবের রূপ নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেন। হিন্দু পুরাণ বললেন (বিশেষতঃ বাংলাদেশে) নানা দেবদেবী আছেন যাঁদের মূর্ত্তির অর্চ্চনা বন্দনা প্রয়োজন। মুসলমান বললেন—একমাত্র ঈশ্বরই দেবতা ও মহম্মদ তার প্রচারক। কোরাণ নির্দ্দিষ্টভাবে তাঁর পূজা ও নানা পর্ব্ব পালন হল বিশ্বস্তদের কর্ত্তব্য। মুসলমান সম্প্রদায় বিশেষভাবে ভগবৎ অনুগ্রহের অধিকারী। ইহুদীরাও মনে করেন তাঁহারা ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ ভাজন। খৃষ্টান মনে করেন—যিশুখৃষ্ট যিনি নিজেও ভগবান অথচ ভগবানের পুত্ররূপে জগতে মানবের উদ্ধারের জন্য প্রেরিত—তাঁতে বিশ্বাস ও তাঁর ভজনাই একমাত্র পথ। খৃষ্টানরা ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহভাজন। এইরূপ জৈন, পার্শী ও বৌদ্ধ নানা সম্প্রদায়ের ধারণা, তাঁরাই দেবতার অনুগ্রহভাজন। এই ধারণার বশে বাদ-বিসম্বাদ, যুদ্ধবিগ্রহ অনেক হয়ে গিয়েছে। ধর্ম্মের অজুহাতে যুদ্ধ প্রায় চলে গিয়েছে, কিন্তু দেশ বা জাতি স্বার্থে যুদ্ধ এখনও চলেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ধর্ম্ম নিয়ে বা ধর্ম্মের অজুহাতে মানুষে মানুষে বা জাতিতে জাতিতে সংঘাত ছিল প্রবল। গত ৪।৫ শত বৎসর ধরে উগ্র জাতীয়তাবাদ (nationalism) প্রবল হয়ে পৃথিবীতে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ ঘটেছে ও ঘটে চলেছে। তার ফলে উপনিবেশ স্থাপন, অনুন্নত দেশ দমন, শোষণ ও শাসন ঘটেছে। বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য যুদ্ধ ঘটেছে। দুই বিশ্বযুদ্ধে ভয়াবহ মারণাস্ত্রের বিরাট

প্রয়োগে অসংখ্য লোকক্ষয় ও বিরাট সম্পদক্ষয় হয়েছে। ১৯৪৫ সালে জাপানে দুইটি অ্যাটম বোমার নিক্ষেপে হিরোশিমা ও নাগাসাকি নামক দুই ঘনবসতিপূর্ণ সহরে লক্ষ লক্ষ লোক নিমেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত বা বিকলাঙ্গ হয়েছে। এই বৈজ্ঞানিক যুগের আর দুই ভয়াবহ নব আবিষ্কার হল হাইড্রোজেন বোমা ও আন্তর্দেশিক বোমা (I.C.B.M.)—ইহা বহু সহস্র মাইল দূরস্থ লক্ষ্যভেদ করে দেশকে নিশ্চিহ্ন করতে পারে। নিত্য চন্দ্র বা কৃত্রিম গ্রহ ঐ দূর বোমার উন্নত সংস্করণ। ইহা এ যুগের আবিষ্কার। আবার বিশ্বযুদ্ধ বাধলে এবার পৃথিবী ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

যেমন নবযুগে বিজ্ঞানের অগ্রগতির অপপ্রয়োগে ভয়াবহ ফল এসেছে তেমনই ইহার সুপ্রয়োগে পৃথিবীর সম্পদের, ভোগ্যবস্তুর বৃদ্ধি ও প্রসার সম্ভব হয়েছে। মানুষে মানুষে প্রবল ভেদবুদ্ধির অবসান ঘটছে। ধর্ম, সম্প্রদায় ও জাতি নির্বিশেষে মানুষের পরস্পর নির্ভরতা ও সাম্যবাদের প্রসার ঘটছে।

মানুষের উচ্চ নীচ একান্ত ভেদ আর নাই। আমাদের নূতন সংবিধানে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার, অনুন্নত জাতের সমান অধিকার ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার স্থাপিত হয়েছে—হয়ত কার্য্যতঃ সকল স্থলে প্রয়োগ হয় নাই। ইহারই নানা আকার Social Security or reform সামাজিক সংস্কার বা নিরাপত্তা। Socialism বা সমাজবাদ, সমাজতন্ত্র Co-operative বা সমবায়বাদ সুবিধার সমস্ত অধিকার সমষ্টির প্রত্যেক জনে সমভাবে বর্ত্তমান এখন ইহাদের মূলমন্ত্র সর্ব্বত্র স্বীকৃত।

পূর্ব্বে আইনের চক্ষে স্ত্রী-পুরুষের, ব্রাহ্মণ-শূদ্রের অধিকারে ভেদ ছিল। এখন আইনতঃ তাহা নাই। সকলের সমান অধিকার – সম্পত্তিগত, সমাজগত, পেশাগত, রাষ্ট্রীয় অধিকার গত—সব ক্ষেত্রেই। এই অধিকারের সঙ্গে আসে সমান দায়িত্ব।

বহুশত বৎসর ধরে এ দেশ ছিল ভিন্ন জাতির অধীন। অধীনতার ফলে কর্ত্তাভজা মনোবৃত্তি জন্মেছে। আমরা সব বিষয়ে কর্ত্তা সরকার বা দলপতির নির্দ্দেশে চলি। কর্ত্তা যা বলেন, সরকার যা বাপ এই আনুগত্যের ভাব আকাশে বাতাসে। নবযুগের নির্দ্দেশ হলো বিচার বিবেচনামূলক দায়িত্ববোধ, নির্ভরতা। পরস্পরের সঙ্গে একযোগে কাজ. Team spirit—সহযোগিতা। সাহায্যের যোগে শক্তির অভ্যুদয়। তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈঃ বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ। তৃণকে রজ্জুতে পরিণত করলে মত্ত হস্তিও বাঁধা যায়। এখন বসুন্ধরা কেবল বীরভোগ্যা নয়, সকলের সমভোগ্যা। আগের আদর্শ ছিল বিক্রমীরা শক্তিবানরা বংশানুক্রমে ভোগ চরিতার্থ করে যাবে—আর সাধারণ লোকে তাদের অনুগ্রহভাজন হয়ে থাকবে। এখনকার আদর্শ—সকলে সমান। সকলকে সমানভাবে কর্মী হতে হবে, সমান দায়িত্ব নিতে হবে। ভেদ বিভেদের অবসান এ যুগে হচ্ছে। সমানে সমানেই যোগ বা সহযোগিতা সম্ভব। সহযোগিতা, সমবায় এ যুগের মূলমন্ত্র। এক অভিনব কর্ম্মপন্থা কংগ্রেস ঘোষণা করেছে– সমবায় পদ্ধতিতে কৃষি চালাতে হবে। এই সমবায় প্রথার নানা ক্ষেত্রে প্রসার হল নতুন সমাজ আদর্শ—সাম্যবাদের প্রকাশ আগে ছিল আদর্শ—রাজা দেশ শাসন করবেন আর তখনকার গ্রামীণ সভ্যতার আদর্শ ছিল যে গ্রাম বা জনপদবাসীরা ছোট ছোট ক্ষেতে চাষবাস করবে, আর ছোটখাট ব্যবসায় বাণিজ্য নির্বিবাদে করে যাবে। রাজা ছিল বংশানুক্রমিক। এখনকার দেশপতি নির্ব্বাচিত। তখনকার অমাত্য ও ভূমিপতি ছিল বংশানুক্রমিক। এখন ভূমিপতি শেষ হয়েছে হচ্ছে বা অমাত্যের স্থলে হয়েছে নির্ব্বাচিত বা নিযুক্ত মন্ত্রী ও কর্ম্মচারী। তখনকার আদর্শ ছিল প্রজারা কর দিবে আর সেই অর্থ রক্ষিত হয়ে প্রজাপালন ইত্যাদি হবে। সহস্রগুণ মুৎসৃষ্টুং আদত্তে হি রসং রবিঃ। রাজা করবেন শিষ্টের পালন আর দুষ্টের দমন। বিদেশ রাজার বিক্রমে শান্ত থাকবে। দেশ এখন অনেক বড়। বৈদেশিক নীতি আর দেশরক্ষা বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে এখন এক বিরাট ব্যাপার হয়েছে। ইহার ভার রাজ শক্তি ও প্রজাশক্তি সকলের উপর। এখন শিষ্টের পালন বা শান্তিরক্ষা ছাড়াও দেশের বিরাট উন্নতির প্রয়োজন হয়েছে। সেকালে কাম্য ছিল বংশবৃদ্ধি ও লোকবল উপচয় আর এখনকার কাম্য হল অল্প নিয়ন্ত্রণ নিরোৎসাহ আর বংশ সঙ্কোচন। এখন কৃষিকে বিজ্ঞানের সহায়তায় উন্নত করতে হবে, কলন বহুগুণ বাড়াতে হবে দেশের খাদ্য ভাণ্ডার

বাড়াতে হবে। শিল্পের অগ্রগতি ও অনেক বাড়াতে হবে। অন্যান্য দেশের সমতালে এগোতে হবে। অন্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে জীবনের মান উন্নয়ন করতে হবে। দেশের এখন বিপুল জনতা – প্রায় ৪০ কোটী। সকলের অন্নসংস্থান ও কর্মীদের জীবিকার সুযোগ সংগ্রহ বিরাট ব্যাপার। দেশ পালন এখন গড়িয়ে গড়িয়ে চলে না। এখনকার নীতি শুধু দেশে শান্তিরক্ষা নয়, (Police State) এখনকার নীতি হল কল্যাণরাষ্ট্র (Welfare State)। দেশের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন সরকার ও জনসাধারণ উভয়ের দায়িত্ব ইহাতে বিশেষ চেষ্টা ও সহযোগ প্রয়োজন

সরকার ও ধনীদের প্রচেষ্টায় বড় বড় উদ্যোগ চলেছে। এতে ধনী দরিদ্র সকলের লাভের বৃহৎ প্রচেষ্টা রয়েছে। টাটার কারখানা কুলটি ও ভদ্রাবতী কারখানা, টুবের কারখানা, ভাক্রা নাঙ্গল, দামোদর উপত্যকা হিরাকুণ্ড, ইস্তকারণা, সিন্ধি, চিত্তরঞ্জন এঞ্জিন কারখানা সম্প্রতিং দুর্গাপুর কোক করলা কারখানা ইত্যাদি বিরাট বিরাট শিল্প কারখানা একদিকে দেশকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাচ্ছে। দেশের দারিদ্র্য দূর করা জ্ঞানের প্রসার করা ও স্বাস্থোন্নতি করা বিরাট সমস্যা। বহুকালের চেষ্টায় কালাজ্বর প্রায় দূর হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাহায্যে ম্যালেরিয়া দূর হতে চলেছে। কুষ্ঠ, যক্ষ্মা, কলেরা বসন্ত মহামারীও দূর করার চেষ্টা চলেছে। দেশের ৫৬০০ পল্লীর উন্নতিতে দেশের উন্নতি। সরকারের পল্লী উন্নয়নের চেষ্টা চলেছে। পল্লীর রাস্তা, পয়ঃ প্রণালী, পানীয়, শিক্ষালয় চিকিৎসালয় হাট বাজার কুটীর শিল্প এই সবের উন্নয়নে গ্রামের উন্নতি ও গঞ্জের ও সহরের সঙ্গে যোগ ঘটলে পল্লীর রূপ বদলে, তাহাতে সহরের সুখ সুবিধা ঘটবে, সহর ও পল্লী উভয়ের সমৃদ্ধি ঘটবে। কৃষির উন্নতির জন্য জাপানী পদ্ধতি প্রয়োগে ফলন বৃদ্ধি প্রয়োজন। জাপানের মত, বিরাট বিরাট শিল্প ক্ষুদ্র শিল্পের সহযোগিতা করে তাহাদের শাখা রূপে কাজ করাবে। দেশের শত করা ৭০ জন কৃষিজীবি তাদের অর্দ্ধবৎসর বেকার অবস্থায় কাটে। ক্ষুদ্র শিল্পে যোগদান করলে তাদের দারিদ্র্য মোচন হবে। কৃষি জীবীদের উদ্বৃত্ত আর হাটে বাজারে শিক্ষালয় ইত্যাদিতে গিয়ে দেশের সমৃদ্ধি হবে। সাধারণের সমৃদ্ধিতে দেশের সমৃদ্ধি। সাধারণের জীবনের সুখ সুবিধা ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য— কেবল ধনীদের উন্নতি নয়—সাধারণের জীবন উন্নয়ন লক্ষ্য।

আর্থিক সমৃদ্ধি না এলে স্বাধীনতা শূন্যগর্ভ হয়ে যায়। জনসাধারণের সম্মুখে স্বাধীনতার আদর্শ। দেশের সরকার এখন জনসাধারণের নির্ব্বাচিত সরকার। জনসাধারণের বুকে এখন স্বাধীনতার বীর্য্যের রক্ত প্রবাহিত। দেশের সহযোগ সহায়তার জন্য উচ্চপদস্থরা সকলের মুখ চেয়ে আছেন। আর্থিক সুমতির সঙ্গে যেমন ধনীরা ধন সঞ্চয় করে দেশের পুঁজি বৃদ্ধি করবে। তেমনই স্বল্প সঞ্চয় দ্বারা জনসাধারণও কৃষিও শিল্প সমৃদ্ধিতে রসদ যোগাতে পারে সাধারণ সৈনিকের কর্মশক্তি যুক্ত হয়ে যেমন অসাধ্য সাধন হয় দেশের সাম্য ভাবে উদ্বুদ্ধ জনগণের কর্মশক্তি উদ্বোধনে কৃষি ও শিল্প সমৃদ্ধি ঘটতে পারে। চীন জাপান রুশ অল্প কয়েক বৎসরে যা ঘটাতে পেরেছে আমরা ও তা পারি। রুশ চীন আদি দেশে জনগণের বাধ্যতামূলক কার্য্য প্রণালী ফলে যা ঘটেছে আমরা তা স্বাধীনভাবে করতে পারি যদি একযোগে যুক্ত হই। সকলের যোগে বিরাট কর্মশক্তির তড়িত-প্রবাহ দেশকে অগ্রগতির পথে নিতে পারে। এই ভাবের উদ্বোধন তুমি আমি সকলেই করতে পারি।

সাধারণ লোকের কর্মশক্তির মূল প্রাচীন কালে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থাসঙ্গত ছিল। তখনকার সাধারণ লোক রাজশক্তিকে ভক্তি করে অনুগত ভৃত্যরূপে থাকত ও তাহাকে ভাগ্য দাতা মা বাপ রূপে দেখত। এখন উপর নীচ একাত্ম ভেদ আর নাই। রাজশক্তি এখন সাধারণ লোকের দ্বারা নির্বাচিত তাহাদের শক্তি হতে উদ্ভূত। সাধারণ লোক নির্বাচন করবে, কর দিবে শুল্ক দিবে কর্মী হবে। তাতে রাজ্য চলবে। আত্মনির্ভর হয়ে আপনার শ্রীবৃদ্ধি করবে, পরস্পর সহযোগিতা করে জীবনের মান উন্নয়ন করবে। সাধারণ লোকে আয়ের উদ্বৃত্ত থেকে সঞ্চয় করবে তা দিয়ে নূতন অর্থ লাভ হবে— কৃষিকার্যে যেমন একবছরের শস্য থেকে উদ্বৃত্ত বীজ ও সার প্রয়োগে নূতন বছরের ফসল আসে। প্রাচীন কালের মত এখন রাজশক্তি নাই এখন তা সাধারণ শক্তির অন্তর্ভূত

হয়ে গিয়েছে। রাজনির্ভর বা পরনির্ভর না হয়ে এখন মানুষ আত্মনির্ভর হয়েছে। সেই জন্য এখনকার সাধারণ জীবনের মূল মন্ত্র উপরের দয়া দাক্ষিণ্য অপেক্ষা আত্মনিভর ও সহযোগ সমবায় গত হয়েছে। এখানকার মূলমন্ত্র :—

এক হিন্দু এক মনপ্রাণ
এক জাতি এক ভগবান।

[সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতি পরিচালিত শুরুণ সদন শিবিরে বিবৃত]

'স্নেহের শিকল'

শ্রীহিরণ্ময়ী বসু

বেহালার চওড়া রাস্তার উপর পাশাপাশি দুটি প্রকাণ্ড একতলা বাড়ী পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাড়ী দুটি মিশনারী বোর্ডিং স্কুল আগে এই দুটি স্কুল ছিল না তখন একটি বাড়ীর দুটি বিভিন্ন অংশে ছিল আর সেটিকে বলা হত "হোম"। হোম মানে বাড়ী কিন্তু সব ছেলেমেয়েদের জন্য এ বাড়ী তৈরী হয়নি এটি হয়েছিল সমাজের অবহেলিত যে শিশুরা কোথাও আশ্রয় পায় না তাদের জন্য, আর যে সব ছেলে মেয়েরা ছোট বেলা থেকে মন্দ সংসর্গে পড়ে নষ্ট হয়ে যায় তাদের শুধরে মানুষ করে তোলার জন্যে।

প্রায় ত্রিশ বছর আগে কলকাতার কাছেই বেহালা অঞ্চলে অনেকখানি জায়গা নিয়ে খৃষ্টান মিশনারীরা এই হোমটির প্রতিষ্ঠা করেন। এখানকার ছেলেমেয়েরা নিজেদের সব কাজ নিজেরাই করে নিত। বাগান করা, কাপড় কাচা, বাড়ী ঘর পরিষ্কার সব কিছু করত কেবল রান্নার আলাদা লোক থাকত। ষষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়াশোনার ব্যবস্থা ছিল আর ছিল বহু রকম হাতের কাজ শিক্ষা করার সুবিধা। এখান থেকে কারিগরী যে কোন বিভাগে পাশ করে ছেলের ছুতোরের কাজ, ঘড়িবাটি কলাই এর কাজ, বেতের কাজ, এই সব কাজে অন্যত্র যোগদান করত। নিজেরা দুপয়সা রোজগার করে সাবলম্বী হত। আর মেয়েরা শিখত সেলাই, বোনা, তাঁত, অনেক কিছু। বিভাগ ছিল দুটি একটি ছেলেদের অপরটি মেয়েদের।

এই মেয়েদের বিভাগের বড় হল ঘরে একটি মস্তবড় ছবি টাঙানো তার দিকে চেয়ে বোর্ডিং এর এক নবাগতা মেয়ে কণু আর একটি মেয়ে বীথিকে জিজ্ঞাসা করল : এটি কার ছবি ভাই? বীথি দুহাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে উত্তর দিল, ইনিই তো মল্লিকাদি এঁর গল্প শোননি বুঝি?

কণু মাথা নেড়ে বলল : না ভাই আমি তো নতুন তুমি বুঝি মল্লিকাদিকে দেখেছিলে? বীথি খুব গর্ব্বভরে বললে : তাঁকে দেখিনি কিন্তু যাঁরা দেখেছেন তাঁদের মুখেই গল্প শুনেছি।

গল্প সুরু করল বীথি। এই মিশনারী হোমে কোন বাঙ্গালী মেয়েই কাজ নিতে আসত না, প্রথম এলেন মল্লিকাদি মল্লিকাদি নাকি খুব সুন্দর ছিলেন আর তেমনি গম্ভীর। কাজের কথা ছাড়া একটি বাজে কথা বলতেন না। মেম সাহেবরা পর্য্যন্ত তাঁকে সমীহ করে চলত। তাঁর উপরেই ভার পড়ল মেয়েদের স্বভাব শোধরানোর। সব সময় তাদের গান শিক্ষা দিতে হবে, ভাল ভাল গল্প বলতে হ'বে যাতে তাদের মনের সব পাপ নষ্ট হয়ে যায়।

মল্লিকাদি সব শুনে নাকি হাসলেন, বললেন পাপ আমাদের ভেতরের জিনিষ, শুধু গল্পে কি আর পাপ নাশ হয়? ওদের ভাল করতে হলে ওদের সঙ্গে মিশতে হবে স্নেহের শিকল রচনা করে বাঁধতে হবে ওদের কচি মনকে তবেই ওরা কথা শুনবে আর সে কথা মেনে চলবে।

মিশনের যিনি বড় মেমসাহেব ছিলেন তাঁকে সকলে মিষ্টার বেরী বলত তিনি মনে মনে বিরক্ত হয়ে বললেন ওরা ভালবাসার অযোগ্য জীব। শাসনে না রাখলে তুমি ওদের কিছুতেই বাধ্য মানাতে পারবে না মিস রায়। মল্লিকাদি হেসে উত্তর দিলেন, আমার উপর যখন ভার দিয়েছেন তখন আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব।

এই হোমের ছেলেমেয়েদের বয়েস ছিল তিন থেকে বারো বছর। তারা এত দুষ্টু ছিল যে প্রায় পালিয়ে যেত, পরস্পরের জিনিষ চুরী করত। মেথিন তাদের আরো কত কি। অন্যায় করলেই ওদের চাবুক মারা হত, যার যেমন দোষ তার পিঠে তত ঘা বেত পড়ত। এই বেতের ভয়েই ছেলেমেয়েরা দোষ করেই পালাত। অনেককে আবার ধরে আনা হত অনেকের আর হদিস হত না। এই রকম পরিস্থিতিতে মল্লিকাদি এসে পড়লেন হোমের ছেলেমেয়েদের ভেতর।

প্রথম কয়েক মাস তিনি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বেশী মিশতেন না শুধু তাদের স্বভাবের সঙ্গে পরিচিত হলেন। মল্লিকাদির এমন একটা গম্ভীর ভাব কড়া দৃষ্টি ছিল যে যতো দুষ্টু মেয়েই হোক না কেন ওঁর সামনে দাঁড়াতে ভয় পেত। মল্লিকাদি মেয়েদের বকাবকি একেবারেই করতেন না কিন্তু দোষ করলে কঠিন শাস্তি দিতেন। রেবেকা নামে একটি মেয়ে একবার বীণা বলে একজনের ঘরের থেকে তার ভাগের খাবার চুরি করে খায় মল্লিকাদি সে কথা শুনে রেবেকাকে ডেকে বললেন, আজ সমস্তদিন তোমার খাওয়া বন্ধ। রেবেকা বেত খেতেই অভ্যস্ত কারণ চুরি করা তার ছোট বেলার অভ্যাস, এবারে বেতের বদলে খাওয়া বন্ধ হওয়াতে তার যেন কষ্ট হল। কিন্তু নিজের কষ্টের চেয়েও তার বেশী কষ্ট হল যখন জানতে পারল সারাদিন মল্লিকাদিও জল স্পর্শ করেন নি। রেবেকার এত দুঃখ হল যে সে মল্লিকাদির পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করল আর কোন দিন পরের জিনিষে হাত দেবে না। তারপর থেকে রেবেকা শুধরে গেল। এখন যিনি মেলাই এর দিদিমণি তিনিই হচ্ছেন রেবেকা। ওঁর মত ভাল মানুষ সত্যিই দেখা যায় না।

আর একবার কি হল বড় দিনের আসের দিন 'খৃষ্টমাস ইভ' এ নরেন বলে একটি ছেলে তাদের হোমের যে কাপড়ের ছিলেন তাঁর বহু টাকা কড়ি নিয়ে বাড়িটা খানিকটা ছেঁটে দিয়ে যাতে পাঁচিল উপকে পালাল পরদিন পুলিশে কাপড়ের খবর দিলেন চোর বলে নয় অবশ্য। হারিয়েছে বলে। শেষ পর্য্যন্ত মাকেরেহাট ষ্টেশন থেকে তাকে অনেক ভুলিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন মল্লিকাদি। প্রতিজ্ঞাতি দিলেন যে কোন মারধোর হবে না। মল্লিকাদি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি চুরী করেছিলে কেন নরেন? নরেন অনেক কাঁদল বলল, আমার অনেক খেলনা কিনতে ইচ্ছা করে, ভাল জামা কাপড় জুতো পরতে ইচ্ছা করে। ভাল খেতে ইচ্ছা করে। আর বেশী বলতে হল না মল্লিকাদি সবটাই বুঝে নিলেন। তারপর থেকে তিনি হোমের ছেলেমেয়েদের মাসে একবার ভাল খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। নিজের টাকায় খেলনা ভাল জামা কাপড় সব কিনে দিতেন। তারপর সেই নরেনও মল্লিকাদির স্নেহের শিকলে বাঁধা পড়ে গেল। বড় হল, ভাল হল, হাই স্কুলে তাকে পড়ালেন মল্লিকাদি, নরেন খুব মেধাবী ছাত্র ছিল। বয়েও স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার নরেন ঘোষালই সেই নরেন। আজ যাঁর নাম শুনলেই ছেলেরা শ্রদ্ধা; জানায় যিনি স্কুলের কাজে নিজের সর্ব্বস্ব দান করেছেন তাকে কিন্তু তৈরী করে দিয়ে গেছেন মল্লিকাদি।

মল্লিকাদির অনুরোধেই মিষ্টার আর কর্ণধররা 'হোম' নাম পাল্টে বোর্ডিং স্কুল নাম রাখলেন। তাঁদের ধারণা হয়েছিল যত বড় শয়তান ছেলেমেয়েই হোক না কেন একবার মল্লিকাদির কাছে এনে ফেলতে পারলেই শুধরে যাবে। কেউ অন্যায় করলে শাস্তি পেত ঠিকই কিন্তু সে মনে জানত তার অংশীদার আছে মল্লিকাদি। তাঁর সেবা তাঁর মমতা মাখানো ব্যবহারগুলি এড়িয়ে যাওয়ার সাধ্যি ছিল না তাদের।

সেবার বেহালা অঞ্চলে ভিষণ কলেরা আরম্ভ হল। মেম সাহেবরা ভয়ে একেবারে জড়সড়। বসন্ত আর কলেরা ওঁদের কাছে যমের সামিল। সব বুঝে মল্লিকাদি প্রস্তাব করলেন তিনি একাই ছেলে মেয়েদের নিয়ে থাকতে পারবেন, ওঁরা যেন মাসখানেক পাহাড়ে ঘুরে আসেন।

বেয়ারা, খরোয়ান, ঝি, চাকর সবাই রইল, ছেলে মেয়েরা সকলেই রইল আর রইলেন মল্লিকাদি।

বোর্ডিং এ কলেরা দেখা দিল। যাদের সম্ভব হল মল্লিকাদি হাসপাতালে পাঠালেন। আর যাদের পাঠাতে পারলেন না নিজেই তাদের সেবা করলেন। ছেলেমেয়েরা সবাই প্রায় সুস্থ হয়ে উঠল, মেম সাহেবরাও ফিরে এলেন। আশ্চর্য্য একটি ছেলে বা মেয়েরও কোন ক্ষতি হয়নি কিন্তু সকলের ঘরে ক্ষতি স্বীকার করলেন মল্লিকাদি। তিনিও রোগে আক্রান্ত হলেন, কারো সেবা যত্ন কিছুই নিতে হল না মাত্র ঘণ্টা দুই এর ভেতর স্নেহের শিকল ছিন্ন করে মল্লিকাদি ওপারে পাড়ী জমালেন। সে দুঃখ ভুলতে পারল না ছেলেমেয়েরা, তাদের জীবনে সবচেয়ে আপন ঘরে যিনি এসেছিলেন তাঁকে হারালেও তাঁর আদর্শকে তারা বাঁচিয়ে রাখল।

সুন্দর সাদা ছাপোশি পাতে মোড়া কফিনের ভেতর মল্লিকাদিকে শুইয়ে দেওয়া হল, ফুলের স্তূপ আর রীথ দিয়ে সাজান হল তাঁর সাদা গাড়ীখানি। শেষ ঘরে গেলেন মল্লিকাদি কিন্তু শেষ হল না তাঁর কাজের সুরভি। আজকের মল্লিকা গার্লস হাই স্কুলের বীজ রোপন করেছিলেন মল্লিকা রায় স্নেহের শিকল দিয়ে তাকে সুরক্ষিত করে গেছিলেন, সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ফুলে ফলে আজ ভরে উঠেছে।

কণু তার ছোট্ট দু হাত তুলে প্রণাম জানালে মল্লিকাদির বৃহৎ তৈলচিত্রটিকে।

কালের প্রহরী

সুপ্রীতা মিত্র

মতোচারী বিহঙ্গম মেলে দিয়ে
আতপের ডানা,
মধ্যাহ্নোত্তাপে ক্লান্ত স্থির
শ্রান্তি-ক্লান্তি-হীন,
দিক্ হ'তে দিগন্তরে
বিস্তারিয়া ছায়া ;
তাহি দরশন লভি'
সুরু হয় আলোকের দিন।
এক চক্ষু সে দানব
জেগে রয় সতর্ক প্রহরী,
কালের প্রহর মোরে
দৃষ্টি অচঞ্চল ;
তারি পাশে আসি বিশ্ব
ঘুরি চক্রাকারে,
প্রাণ পেয়ে জেগে উঠে
হাসে সমুজ্জ্বল।
কালের প্রহরী বসি
আলোকের রথে
রথচক্রতলে বিশ্ব
ঘোরে মূক পথে।

অনামী

ধীরেন বসু, এম. এ

আমি রঙিন ফুলের কুঁড়ি নইকো।
নইকো। সবুজ পাতা,
সেই মালিকার গ্রন্থী আমি
হয়নি যে ফুল গাঁথা।

ঘুম সায়রে আকাশ পারে,
স্বপন লোকের স্মৃতির ঘোরে
নীড়ভোলা এক পাখীর মতোই
টানবো সুরের আলপনা
বেলা ভোরের আলোয় মিলিয়ে যাবে
মিথ্যে অলীক কল্পনা।

ছায়াপথের রেখা বেয়ে
শুকতারাটি হাসবে চেয়ে
মরুপথের যাত্রা আধার
মরুদ্যানের গা ঘেঁসে,—
হেসে খেলেই সাঙ্গ হবে
অচীন দূর বিদেশে।

পাষাণের কান্না

দ্বিজেন্দ্রলাল ঘোষ

ভবানন্দ দা। ভবানন্দদাকে ভুলতে পারি না। সংসার জীবনের প্রতি ঘাত প্রতিঘাত তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি সকলকেই বলতেন, ওরে বিয়ে নিশ্চয় করবি তা সময় থাকতেই করবি।

ভবানন্দদাকে মনে হলেই ৩০ বৎসর পূর্ব্বের জীবনে ফিরে যেতে হয়। বেল বাড়ী। এক এক ফ্লোরে ৪।৫টি করে সাট। কেউ কলেজে পড়ছে, কেউ চাকরী করছে, কেউ চাকুরীর সন্ধানে ঘুরে ঘুরে জুতোর তলা ক্ষয় করছে। আমাদের ভিতর ভবানন্দদাই ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ। তখন তাঁর বয়স ৬০-এর কাছাকাছি। বাড়ীর নীচের তলায় কোনের ঘরে থাকেন। আধভাঙ্গা ভক্তপোষ, জীর্ণ মলিন সন্তাবরের টেবিল। বেটে গোছের বলিষ্ঠ গড়ন তাঁর। বাম পা খানা বাতে কাবু করায় হাঁটতে একটু কাৎ হয়ে চলেন। সওদাগরী অফিসে চাকুরী করেন, সন্তাগণ্ডার দিনে যা পেতেন তা তালই।

তাঁকে কদাচিৎ করুণ বা বিমর্ষ দেখেছি। তিনি একাই সমস্ত বাড়ীখানাকে মাতিয়ে রাখতেন। তিনি না থাকলে বড় শূন্য মনে হত।

ভোর না হতেই শোনা যেত ভক্তভক্তীর গলায় তিনি হাকছেন—ওরে ছোঁড়ারা, আর কত ঘুমুবি? এখন ওঠ—যত সব কুঁড়ের দল! আর শোনা যেত দন্তধাবনের পর জিভ পরিষ্কার করার তাঁর "এ্যা" "এ্যা" শব্দ। ঘুমিয়ে ওঠার আগে সবার ওঠা চাই। যদি কেউ না উঠত তাহলে আর এক বিপত্তি। তিনি ধরে নিতেন নিশ্চয় ওটার শরীর খারাপ। তখন তিনি নিজে গিয়ে তাকে বিছানা থেকে উঠিয়ে নিজহাতে বিছানা পরিষ্কার করে দিয়ে জোর তাকে শুইয়ে দিতেন—বলতেন, তোর নিশ্চয় অসুখ করেছে, আজ ঘর থেকে বেরোনো নিষেধ। তারপর ঠাকুরকে ডেকে পথ্যের যে নির্দ্দেশ দিতেন তা সুস্থ শরীরে ত দূরের কথা, অসুস্থ অবস্থায়ও আৎকার কারণ। রাত্রিতে শোবার আগে একবার করে সবার খাটিয়াদি পরীক্ষা করে যেতেন, ঠিকমত শোওয়া হয়েছে কিনা। যদি সত্যি কেউ অসুস্থ হত তখনকার ভবানন্দদার করুণার মূর্ত্তি আজও মনে পড়ে। রোগীর পাশে তিনি দিবারাত্র বসে থাকতেন। নিজের স্নানাহার, অফিস সব কিছু ভুলে যেতেন তাঁকে কেউ কিছু বলতে গেলে ধমকে উঠে বলতেন—বাদরামো করতে হবে না, চুপ থাক্। যত সব ইয়ে—শয়তান সব, অনাচার অত্যাচার করে সবাই অসুখ ডেকে আনবেন, আবার আসবেন বাদরামো করতে! দাঁড়া, তোদের বা বাবাকে সব জানিয়ে দিচ্ছি। অনেকের অভিভাবকের নিকটই তিনি পত্র দিতেন; কিন্তু যে সব কথা লিখতেন, তাতে অভিভাবকরা তাঁদের সন্তান সম্বন্ধে শুধু নিশ্চিন্তই হতেন না, মনে মনে গর্ব্বও বোধ করতেন হয়ত।

ভবানন্দদার বৈশিষ্ট্য ছিল প্রতি শনিবার বাড়ী যাওয়া ও রবিবার সন্ধ্যায় ফিরে আসা। বাড়ী হতে তিনি একা ফিরতে পারতেন না, ছুটো কুলি সাথে করে ফিরতে হত; পায়েস, মিষ্টান্ন, পিঠা প্রভৃতি তিনি হাঁড়ি ভর্ত্তি করে আনতেন আর আমাদের সবাইকে এক সারে বসিয়ে নিজে পরিবেশন করে খাওয়াতেন।

সত্যি বলতে কি, প্রতিটি রবিবারের সন্ধ্যায় জন্য আমরা সজল রসনায় পথের দিকে তাকিয়ে থাকতাম।

—এত সব কেন আনেন, ভবানন্দ দা?

গর্ব্বে উঠে তিনি বলতেন—কেন আনি! আমার ভারি গরজ আনার! না এনে রক্ষে আছে? যে বাঘিনীর সাথে ঘর করি—তোদের বৌদি রে, তোদের বৌদি—সে বলে কি, জানিস?—বলে, বাদরগুলো রয়েছে সব মা-বাবাকে ছেড়ে, ওরা ভাল-মন্দ পাবে কোথা? ওদের জন্যে নিতেই হবে এইটুকু।

—বউদিকে কেন একবার আনে না, ভবানন্দ দা?

প্রাণখোলা হাসি হেসে তিনি বলেন—তা কি আর

বলি না রে! বলি। কিন্তু সে বলে কি, জানিস? বলে যে, আমি গোঁয়ো; তোমার সাথে যাই, আর তোমার বাবুর ভাইগুলো সব হিঃ হিঃ করে হাসুক আর কি! ও সব হবে না। তোমার কাছে যা শুনি, বাকাঃ!

অফিস থেকে প্রতি শনিবার বাকা ভর্তি করে বাজার নিয়ে হাওড়া ষ্টেশনে যাবার ছোটা চাই. আবার রবিবার সন্ধ্যায় বর্ধমান কলেবরে কুলিসহ মেসে পৌছা চাই। এলেই হাঁকবেন—আছিস তো রে সব? আটটার ভিতর সবাইকে পাওয়া চাই।

ঘাড়ে শনি চাপল। স্থির করলাম, এক শনিবার ভবানন্দবার পিছু নেবো। করলামও তাই। হাওড়া হতে ৫০ ৬০ মাইল দূরে এক ষ্টেশনে নামলাম। তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। আষাঢ়ের আকাশে কালমেঘের ছাউনি।

ষ্টেশন থেকে প্রায় চার মাইল দূরে এক বাড়ীর সামনে দাঁড়ালেন ভবানন্দ দা। অন্ধকারেও বেশ বোঝা গেল, বাড়ীটি বেশ বড়; কিন্তু অব্যবহারে অযত্নে পড়ে রয়েছে। ঘাসী লতা আর গাছে বাড়ীখানাকে যেন ঠেসে ধরেছে। তালা খুলে ভবানন্দবা বাড়ীর ভিতরে ঢুকলেন। বৃষ্টিপড়তে আরম্ভ করেছে আত্মরক্ষার জন্য আমি পাশের বাড়ীর রকে আশ্রয় নিলাম। গৃহস্বামী বেরিয়ে এলেন।

—আপনি কোথা থেকে এসেছেন?

—কলকাতা, ভবানন্দবার মেসে থাকি।

—ভবানন্দবার মেস থেকে? আসুন, আসুন, আপনাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় নেই বটে কিন্তু ভবানন্দবার নিকট হতে আপনাদের সকলের খবরই জানি নাম পর্য্যন্ত।

—তিনি তাহলে আমাদের গল্পও করেন?

—করেন মানে? আপনাদের প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ, আমাদের শুনতে হয়, না শুনলে তিনি রেগে যান দুঃখ পান।

বাইরে বৃষ্টির চাপ বেড়েই চলছে। পাশের বাড়ীতে ভবানন্দবার ঘরে আলো দেখা যাচ্ছে, জিজ্ঞাসা করলাম, ভবানন্দবার বাড়ী কাঁকা কাঁকা ঠেকছে যেন।

—কেন? তিনিও একাই আছেন।

—তাঁর স্ত্রী?

—স্ত্রী? তিনিও বিয়েই করেন নি।

—বিয়ে করেন নি? তবে···

—স্ত্রীর কথা খুব বলেন, না? সে এক ট্রেজেডী।

পাশের এক বাড়ী হতে স্ত্রী পুরুষের কর্কশ কণ্ঠ শোনা গেল। বৃষ্টি বৃহৎ হয়ে এসেছে।

কণ্ঠ নিসৃত বাক্যসব ভক্তপরিবেশের অনুকূলে নয়।

জিজ্ঞাসা করলাম এ আবার কি?

—এ ভবানন্দবার আশ্রিত কপোত কপোতি, নন্দমিস্ত্রী আর তার স্ত্রী শ্যান্ত।

নন্দ মিস্ত্রী যে পরিমাণে রোগা তার স্ত্রী শ্যান্ত সে পরিমাণে বলিষ্ঠ ও স্থূলাঙ্গী। দিনে রাতে তাদের অন্ততঃ একবার যুদ্ধ হওয়া চাই। নন্দমিস্ত্রী শূন্য হাতে আস্ফালন করবে আর স্ত্রী শ্যান্ত যেসা কাঠে নন্দমিস্ত্রীর পিঠ ক্ষতবিক্ষত করবে।

—ভদ্র পল্লীতে এদের উপদ্রব চলে কি করে?

—চলে কি করে? তবে বলি, একদিন ভোর না হতেই শুরু হয়েছিল এই ধস্তাধস্তি। আমরা কয়েকজন স্থির করলাম এর প্রতিকার দরকার, চললাম নন্দমিস্ত্রীর বাড়ী। তখন নন্দমিস্ত্রী বাড়ী হতে বেড়িয়ে পরেছে, শ্যান্ত অশ্রাব্য ভাষায় চালিয়েছে বাক্যবর্ষণ। বললাম, তোমাদের এ অনাচার এখানে চলবে না। শ্যান্ত উগ্র হয়ে উঠল, বলল, বেশ, মিনসে আসুক আমি আজই চলে যাব ওর মুখে ছাই দিয়ে।

শ্যান্তমণির সঙ্গে আর বাক্যালাপ করা সমীচিন বোধ করলাম না। স্থির করলাম, নন্দ আসুক, আজই এর সুরাহা করা চাই। ভবানন্দবাও ছিলেন আমাদের সঙ্গে। সারাদিনে নন্দর টিকি দেখা গেল না। রাত্রিতে আবার গেলাম খোঁজ নিতে, গিয়ে দেখি নন্দ ফিরেছে। জ্যোৎস্না ঢালা ছোট আঙিনায় ছেড়া মাদুর বিছিয়ে বসেছে নন্দ ও তার স্ত্রী। সামনে একটি থালায় মুড়ী ও রসগোল্লা। নন্দর বোধ হয় তখনও অভিমান পড়েনি গুম হয়ে বসে রয়েছে। শ্যান্তমণি যার ঘরে নন্দের মুখের ভিতর পুরে দিলে রসগোল্লা। ভবানন্দবা ইশারায় আমাদের ঘরে আসতে বললেন। একটু দূরে এসে তিনি বললেন, ওদের প্রেম একটু উগ্র কিন্তু পবিত্র। কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করো না ভাই, এই আমার অনুরোধ, বলেই ভবানন্দ কেঁদে ফেললেন।

ভবানন্দদার রাগকে আমরা ভয় করি না, কিন্তু তাঁর চোখের জলকে বড় ভয় করি।

—কী ট্রেজেডীর কথা বলছিলেন না?

—হাঁ, ভবানন্দদার জীবনটাই ট্রেজেডী।

বাবামার একমাত্র ছেলে তিনি। পাঠ্য জীবনে স্বদেশী কাজ, আর্তসেবা নিয়ে মেতে থাকতেন, গায়ে অসীম শক্তি ছিল। খেলাধুলায় একাই একশ ছিলেন। চিরকুমার থেকে আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করবেন, দেশের সেবা ও আত্মিক সাধনায় জীবন সার্থক করে তুলবেন এই ছিল তাঁর জীবনের স্বপ্ন। তাঁর মা-বাবা তাঁকে বশে আনতে পারলেন না। কয়েক বৎসরের জন্য দেশ বিদেশও ঘুরে এলেন। তখন তাঁর মা-বাবা উভয়েই গত। বাবার বিষয় সম্পত্তি যা ছিলতা ভবানন্দদার একার পক্ষে যথেষ্ট।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে ভবানন্দদার ভিতরে একটা পরিবর্ত্তন দেখা গেল, যেন সংসারী হতে চায়। তখন তাঁর বয়স ৪০ পেরিয়ে গেছে। তাঁকে আমরা ধরলাম বিয়ের জন্য, তিনি যেন রাজিও হলেন। কন্যাদায়গ্রস্থ এক দরিদ্রকে আমরা জানতাম। পাত্রী দেখার জন্য ভবানন্দদাকে নিয়ে গেলাম।

মেয়েটি বেশ সুন্দরী বয়স ১৮।১৯। পাত্রী দেখে ভবানন্দদা স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি গর্জে উঠলেন, তোমার বাবা কোথায়? আচরণ দেখে আমরা হতভম্ব।

মেয়েটির বাবা এলেন, ভবানন্দদা আরও রেগে গেলেন, বললেন—তুমি এ মেয়ের বাবা না কসাই? এই সোনার প্রতিমাকে টাকার জন্য শুষ্ক কাষ্ঠে ঝুলাইতে চাইছ? বেগে গেলে ভবানন্দদা স্থানকাল পাত্র ভুলে যান।

ভদ্রলোকত হতবাক্। কি আর বলবেন! আমরাও বেগতিক দেখে সরে পরলাম। ভবানন্দদা সেখানে রয়েই গেলেন।

কয়েকদিন পরে জানা গেল ভবানন্দদা নিজের পাঁচের পাঁচশত টাকা খরচ করে মেয়েটিকে যোগ্য পাত্রে বিয়ে দিয়ে ফিরেছেন।

ভবানন্দদাকে জিজ্ঞেস করলাম, এ কী হল দাদা? —শ্মশানে ফুল বাগান সাজে নারে ভাই যেখানে সাজে সেখানেই রেখে এলাম ফুলরাণীকে, বলেই ভবানন্দদা চুপ করে গেলেন মেয়েটির নাম ছিল ফুলরাণী।

আজকের এই ভবানন্দদাকে এক সময় দেখেছি পাষাণের ন্যায় কঠিন। ভয় ডর বলতে কিছু তিনি জানতেন না। স্নেহ, প্রেমের কথা উঠলে তিনি বলতেন ওসব মানসিক দুর্ব্বলতা বিশেষ। ও সবের জন্যই নাকি মানুষ ছোট হয়ে রয়েছে।

আজ সেই ভবানন্দদা করে চলেছেন বিবাহিতের অভিনয়। দেখুন না, সারারাত জেগে থেকে খাবার তৈরী করবেন, কাল সকালে পাড়ার সকলকে ডেকে খাওয়াবেন। আপনাদের কাছে নিয়ে বলবেন, "তোদের বউদি করে দিয়েছে" এটা কি কম ট্রেজেডী।

ভোর না হতেই চুপিসারে কলকাতায় ফিরে এলাম। কাউকেও বললাম না ভবানন্দর কাহিনী। তিনিও রথাপূর্ব "বৌদি"র তৈরী খাবার নিয়ে রবিবার সন্ধ্যায় মেসে ফিরলেন।

কিছুদিনের পরেই চাকুরীর চিঠি পেলাম। অন্যত্র যেতে হবে। যাবার দিন ভবানন্দদার ঘরে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি জড়িয়ে ধরলেন, সজোরে চোখের ধারায় প্লাবিত বললেন, "চাকুরী পেলি বেশ, বিয়েটাও শিগ্‌গির করবি। এতে দেরী করবি না—আর বলতে পারলেন না।

সজল চোখে প্রণাম করে আমিও বিদায় নিলাম।

সাম্প্রতিক সাহিত্যে তরুণ-লেখকের ভূমিকা

গোপালকৃষ্ণ রায়

: ভালবা

: বাসি।

: কাকে?

: দেশকে।

: আর?

: মাটিকে।

: আর?

: মানুষকে।

দেশ মাটি আর মানুষকে বাদ দিয়ে কোন দিন কোন কোন দেশের সাহিত্য সম্পূর্ণায়িত হয়ে উঠতে পারে না। সাহিত্যিক মাত্রেই এই তিনকে বাদ দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টির কথা ভাবতে পারেন বলে আমি বিশ্বাস করিনে। যে দেশের মাটির সংগে সাহিত্যের যোগসূত্র থাকে না—দেশের মানুষের চরিত্র যে সাহিত্যে রূপায়িত হয় না—আর যে সাহিত্যিক আপন দেশের পটভূমিকায় সাহিত্য-সৃষ্টি করতে অক্ষম তাঁর সাহিত্য বা সাহিত্যে সৃষ্ট চরিত্র দুর্বল বিকলাঙ্গ হয় আর সেই সাহিত্যিক দেশের কাছে—মানুষের কাছে আর মাটির কাছে অকৃতজ্ঞ বলেই স্বীকৃতি পান। সে স্বীকৃতি তাঁর সাহিত্যিক স্বীকৃতি নয়—সে স্বীকৃতি বল-পূর্বক অধিকারলব্ধ।

দেশ-মাটি-আর মানুষের কথা—দেশ-মাটি আর মানুষের জীবনের ভাষা যে সাহিত্যিকের মনের গভীরতার সন্ধান দেয়, সেই সাহিত্যিক জীবন শিল্পী হন—সেই সাহিত্যিক মানুষের সাহিত্যিক হন। আর তাঁর সাহিত্য-প্রচেষ্টা শুধু সার্থকায়িতই হয় না—মানুষের মনে প্রাণের বিস্তার করে অনেক সংগ্রাম-বন্ধুর পথে আলোর সন্ধানী হয়। রবীন্দ্রনাথ তাই শুধু কবি ছিলেন না—শরৎচন্দ্র তাই শুধু ঔপন্যাসিক ছিলেন না—তাঁরা ছিলেন জীবন শিল্পী। তাঁদের শিল্পীমনের সামনে প্রজ্জ্বলিত ছিল আলো—তাই তাঁরা আলো হাতে জীবন-শিল্পী।

কিন্তু আমাদের দেশে এমন একটা যুগ এসেছিল (সেটা রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর পরই) তখনকার সাহিত্যিক (ঔপন্যাসিক, কবি গাত্রিক) প্রায় অনেকেই দেশ-মানুষ আর মাটিকে ভুলেছিলেন বিদেশী-ভাব-বুর্জোয়া মনোবৃত্তির আবর্তনে প'ড়ে স্বাদেশিকতাকে স্মরণ রাখতে পারেননি। দেশের মানুষের ওপর বৈদেশিক প্রভাব—বিদেশী সাংস্কৃতিকবোধ সঞ্চার করে দেওয়ার প্রচেষ্টা করেছিলেন। সেই সাহিত্য আমাদের দেশে কতটা প্রভাব বিস্তারিত করতে পেরেছিল সেটা আমার আলোচ্য বিষয় নয়—আলোচ্য বিষয় হ'ল পরকীয় অনুসরণের ফলে তাঁদের সাহিত্য কতটা সৃষ্টিধর্মী মর্মস্পর্শী হয়েছিল তাই কিছুটা উল্লেখ করা মাত্র।

(প্রসংগত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমি তদানীন্তন সময়ের সব সাহিত্যিকের কথা উল্লেখ করছি না। যেমন ঔপন্যাসিক হিসাবে তারাশংকর, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়—মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি হিসাবে প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ)

প্রথমেই ধরা যাক, রোমান্টিক কবি বুদ্ধদেব বসুর কথা। বুদ্ধদেব বসুকে রোমান্টিক কবি বলাই সংগত। কারণ রোমান্টিসিজমতা তাঁর কাব্যতে প্রাধান্যই শুধু পায়নি—ভাষুলতার পটভূমিকায়ই রচিত। নারীর দেহগত সৌন্দর্য বাসনাতপ্ত কামনা শিহরিত হৃদয়ে বুদ্ধদেব বসু মহাশয় রচনা করেছেন। নারীর দেহভাস্করে প্রবিষ্ট হয়ে যে রসের সৃষ্টি করেছেন—তত্ত্ব ভাষায় তাকে আমরা রোমান্টিসিজমই বলবো। 'কঙ্কাবতী'কে কাছে পেয়েই তিনি সন্তুষ্ট হননি। তার দেহের পরতে পরতে যৌবনের শিহরণ জাগিয়ে তুলে নিজেও শিহরিত হয়ে উন্মত্ত হয়ে 'কঙ্কাবতী সো' 'কঙ্কাবতী সো' করে তার পেছনে ছুটেছিলেন।

"মোর কাছে এসে আজ যে অকূল টানি যাও
সুন্দর লজ্জায়,
জানি, তাহা রয় হবে কোন এক রাতে;
(তখন কোথায় আমি?)

যে-শঙ্খার শিহরণ তব দেহলাবণ্যের ঘোর কাছে
করেছে মধুর,
(ওগো কন্যাবতী)
মধুর ! মধুর !
জানি, তাহা থেমে যাবে ধূসর প্রভাতে
যাবে চক্ষু মেলি'
পাষণ্ড আস্থর মূঢ় আত্মকন থেকে
আপনার কটি তট নেবে মুক্ত করি।"

আমরা তার কাছ থেকে শুনেছি দৈহিক যৌন বুভুক্ষার কাতোক্তি—যখন আর রতির কুৎসিত লীলা খেলা—যৌবনের আকাঙ্খার বিকৃত প্রকাশ সেই সংগে আমরা শুনেছি সুধীন্দ্র দত্তের 'অর্কেষ্ট্রা'। শুনেছি বিষ্ণুদের 'উর্বশী'র নূপুর-নিক্কণ। সমর সেনের 'গ্রহণ' এ সত্যিকারের আমরা চাঁদকে হারিয়েছি।

যদিও সুধীন দত্তের কাব্যে আভিধানিক অর্থ প্রায় বোধগম্য নয়। তবুও পড়লে কাব্য হিসাবে তাকে মানতে হয়। কারণ তাঁর কবিতা শুধু শব্দঘনই নয়—ভাব এবং আবেগ-ঘনও বটে। ভাব ঐশ্বর্যে সুধীন্দ্র নাথের 'অর্কেষ্ট্রা' আর 'ক্রন্দসী'-রসোত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু তাঁর কবিতার মধ্যে আমরা দেখতে পাই কতগুলি বৈদেশিক ছায়া। এলিয়ট-পাউণ্ড প্রমুখ পাশ্চাত্যের সাম্প্রতিক কবিদের বহু 'প্রতীক' তিনি গ্রহণ করেছেন—তার কাব্যে হস্তক্ষুট করা যায় না এমন শব্দ ও ধ্বনি-তরঙ্গের মধ্যে। তাঁর কবিতা এলিয়ট আর পাউণ্ডের পাণ্ডিত্যে মূর্ত্ত। যার ফলে কাব্যরস ব্যাহত হয়েছে—আর সর্বোপরি দেশ-মাটি আর মানুষের কাছে তাঁর কবিতা দুর্বোধ্য ও উদ্ভট হয়ে রয়েছে। দুর্বোধ্যতার একটা উদাহরণ দিলে সহজেই বোঝা যাবে—

'নিশ্চিহ্ন সে-মাচিকেতা, নৈরাশ্যের নির্বাণী প্রভাবে
ধূমায়িত চৈত্যে আজ বীতাগ্নি হেউটি ;
আশ্বত্থ-অমর্ষোলোক ; নক্ষত্রে ও লেগেছে নিষ্কৃতি।'
(উজ্জীবন)

শব্দচয়নে কুশলী সুধীন্দ্রনাথ মানুষকে মুগ্ধ করেছেন—কিন্তু অর্থ ও রস উদ্ঘাটনে পাঠককে হতাশ করেছেন। স্বীকার করি—কাব্যে পরিস্ফুট হয়েছে তার মনীষা প্রজ্ঞা এমন কী চরম আধুনিকত্ব। কিন্তু পাঠকের মনে রসে আপ্লুত করতে পারেনি। পাণ্ডিত্যই কবির সবচেয়ে বড় সম্পদ নয়—রসঘনতা আর তাবৈচিত্র্যই কবিতার প্রাণকেন্দ্র।

বিষ্ণু দে আর সমর সেনের কবিতা পাঠ করে আমাদের কাছে (অন্ততঃ আমার কাছে) ভীষণ খটকা লাগে দু'জনকেই সন্দেহ করি—দু'জনেই বুঝি দুইজনের কার্বন কপি। আঙ্গিকের দিক দিয়ে দু'জনের পার্থক্য থাকলেও ভাবে দুইজনের অদ্ভুত সাদৃশ্য। বিদেশী কবিদের অনেক কিছুই এঁরা হজম করেছেন তো বটেই—এমন কী রবীন্দ্র নাথ ও অনেক প্রাচীন কবিতা ও গানের লাইন জুড়ে দিয়ে নতুন কিছু ক'রেছেন তবে অনেকক্ষেত্রে হাস্যস্পদ হয়েছেন। মোটা কয়েক উপমা পড়লেই সহজেই বোঝা যাবে :

অনস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনধান
আসে আর পাসে, সামনে পিছনে
সারি সারি পিঁপড়ের সার
জানিনি আগেও ভাবিনি কখনো...
(বিষ্ণু দে)

কালিঘাট ব্রীজের উপরে কখনো কী শুনিতে পাও—
সম্পটের পদধ্বনি
কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
হে সমর হে ধূসর সহর।
(সমর সেন)

এ ছাড়া বিদেশী কবিদের কাছ থেকে শুধু ভাব নয় প্রতিরূপ পর্য্যন্ত ধার নিয়েছেন। যেমন—

আমার স্নায়ুতে এসে কাঁপে থরো থরো
দুয়ারে প্রতীক্ষারত উদ্যত ট্যাক্সির মতো ?
(বিষ্ণু দে।

সংগে সংগে দেখুন এলিয়টের একটি কবিতা—

..."When the human engine Waits
Like a taxi throbbing waiting."

এঁরা কবিতা লিখে পাঠককে যেমন নিরাশ ক'রেছেন—লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কবিতার মধ্যেও এঁদের 'হাহাকারত্ব' বেশী মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়েছে। এঁদের কবিতায় যেমন 'ধূসর' ছায়া—বাক্যবিন্যাসেও 'ধূসরের' ছড়াছড়ি হয়েছে। উদাহরণ আশা করি নিষ্প্রয়োজন।

এখন দেখা যাক এঁদের সমসাময়িক কবি—যিনি নিজের দেশকে ভালবেসেছেন—মাটির কথা শুনেছেন—মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন তার উদাহরণ দিলে আমার প্রবন্ধের প্রসঙ্গ সম্বন্ধে আশা করি ব্যাহত হবে না।

"কে বলিবে ওরা কে অদেখা প্রিয়া,
আমারেই চাহে বুঝি হৃদয় দিয়া
ভুবনের এই তীরে ও কি আসিবে?
ওই তীরে কেবা ও যে বেদন সহে
অতি দূর আকাশের নীল ওড়না
কাহার বিরাট তনু ঘেরিয়া রহে।

(ভালবাসা : নীহাররঞ্জন সিংহ)

কিন্তু সাম্প্রতিক কবিরা যদিও তাঁরা বয়সে তরুণ, কিন্তু এঁদের রচনা শৈলী বয়ঃজ্যেষ্ঠদের তুলনায় মোটেই কম নয়। অনেকে এঁদের সাম্যবাদী কবি ব'লে প্রচার করেছেন বটে—কিন্তু আমি বলবো, এঁরা দেশের কবি—মাটির কবি—মানুষের কবি। এঁরা কবিতায় মানুষের কথা ব'লেছেন—দেশকে ভালবেসেছেন—মাটির সঙ্গে যোগসূত্র রেখেছেন। এঁদের কবিতায় অনুভূতির গভীরতা আছে—বিদেশী ভাব আর 'প্রতীকে' কাব্যরস ব্যাহত করেনি।—

"আমরা চেয়েছি শান্তি, আজ তার অবসাদে ভারি
মুমূর্ষু রোগের মত ফিকানো জীবন;
আমরা পুষেছি আশা—বিহঙ্গ সে দূর নভোচারী
মাটিতে করেছে তার পালক চিকণ।

(অরুণ কুমার মিত্র)

অরুণকুমারের কবিতায় বালসুলভ চপলতা নেই—বর্তমানের সমস্যাবহুল মুহূর্তগুলির প্রতি তিনি সচেতন। এ ছাড়া সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নরেশ গুহ, নীরেন চক্রবর্তী, পরেশ সান্যাল, মণীন্দ্র রায়, বাণী রায়, অপ্রভা ভাদুড়ী প্রভৃতি এবং এঁদের চেয়েও যারা তরুণ তাঁদের মধ্যে অরুণ কুমার সরকার, কৃতী সোম, কৃতান্ত বাগচী, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, রবেন্দ্র মল্লিক, নবনীতা দেব এঁদের কবিতা মাটি—মানুষ—আর দেশের পটভূমিকায় রচিত। সাম্প্রতিক কালের সাহিত্যে এঁদের ভূমিকা মধ্যাহ্নসূর্য না হ'লেও স্বীয় মহিমায় উজ্জ্বল।

উপন্যাসের দিকে তাকালে দেখা যায়—আজকালকার ঔপন্যাসিকেরা দেশকে বাদ দিয়ে কিছু করছেন না—দেশের সমস্যার কথা সযত্নে রূপায়িত করছেন—দেশের মানুষকে দেশীয় চরিত্রেই রূপ দিচ্ছেন এখানে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। সমরেশ বসু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শংকর, অমিয় ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য্য, সুবোধ ঘোষ, গৌরীশংকর ভট্টাচার্য্য।

সমরেশ বসুর 'জাগুরী' আমাদের দেশ—মাটি আর মানুষকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

আজকের যাঁরা ঔপন্যাসিক—যাঁরা কবি তাঁদের উপন্যাসের গতি—কাব্যের সুরে—আমার দেশের মাটি—আমার দেশের মানুষের কথা বলেছে

যাঁরা আজ তরুণ—সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁদের এই ভূমিকা শুধু স্থির শিল্পীমনের পরিচায়ক নয়—দেশানুরাগের অন্যতম দৃষ্টান্ত। এঁদের চেয়ে যাঁরা অপেক্ষাকৃত আরো তরুণ—যদিও তাঁদের সম্পাদকের দ্বারে দ্বারে মাথা খুঁটতে হয়—কিন্তু ভাবীকালের সাহিত্যের মানদণ্ড এঁদেরই দায়িত্ব অধিক।

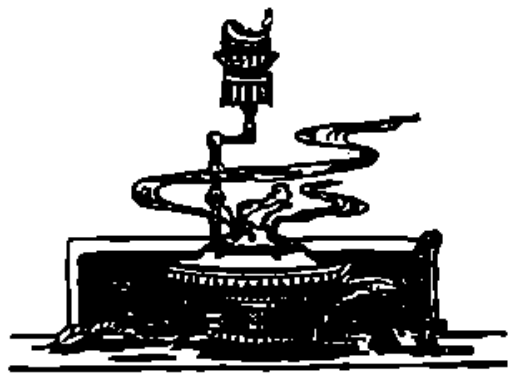

অন্নপূর্ণা স্মরণে

বিভা সরকার

স্বর্গীয়া অন্নপূর্ণা গোস্বামী সম্বন্ধে কিছু লিখতে অনুরোধ করেছেন বহুলস্থা পত্রিকার সম্পাদিকা শ্রদ্ধেয়া রূপপ্রভা দেবী। মন যেখানে স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে সেখানে কিছু লেখা বড় কষ্টসাধ্য। তাই মনে হয় যাঁরা নরজগতের সীমানা পার হয়ে চলে গেছেন তাঁদের আলোচনায় স্বভাবতই মন স্মৃতির বেদনায় বিধুর হয়ে পড়ে।

আজকের এই বস্তুসর্বস্ব সামাজিক জীবন যাপনের যুগে তাঁর মত মানব দরদী একান্ত অনাড়ম্বর সহজ সরল অথচ

তীক্ষ্ণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্না মহিলা আমি কমই দেখেছি। তাঁর আচারণে কথায় ব্যবহারে তিনি একান্তই একটি স্নেহশীলা ভারতীয়া মা ও গৃহিণী ছিলেন।

তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনটি থেকেই তাঁর এই খাঁটি মানব দরদী মন ও পরিচ্ছন্ন জীবন দৃষ্টি আমায় মুগ্ধ করেছিলো। তাঁর মন একান্ত ভাবেই কুসংস্কার মুক্ত বুদ্ধি দীপ্ত ছিলো—জীবন পথে তিনি সুযুক্তিকেই তাঁর পাথেয় স্বরূপ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর আর একটি মহৎ গুণ ছিলো এই যে তিনি অনায়াসে মানুষকে একান্ত আপনার জন করে নিতে পারতেন।

আজকের যুগ বাস্তববাদী তিনি এই যুগ ধর্মকে অস্বীকার করেননি কিন্তু সেই বাস্তবের কঠিনতাকে তিনি আপন মনের দরদ দিয়ে কোমল করে নিতে চেষ্টা করেছিলেন—এ সাক্ষ্য আমরা তাঁর লেখার ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট দেখতে পাই।

তিনি আমার অগ্রবর্তিনীদের মধ্যে একজন ছিলেন—আজ তাঁর কথা লিখতে বসে একান্ত শ্রদ্ধা ছাড়া আর কিইবা জানাতে পারি!

মানুষের অবহেলায় ধনীর অবজ্ঞায় যে সব মানব অবহেলিত তাদের সুখ দুঃখ বেদনা ভাবনাকেই তিনি মানবতার কোমল স্পর্শে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছিলেন—তাঁর শিল্পকর্ম সার্থক কিনা এ বিচার করবে ভবিষ্যকাল। শিল্পীর কর্তব্য তাঁর বক্তব্যকে মানব গোচর করা সে কর্তব্যে তিনি ত্রুটি করেননি—তিনি যা ভাল বুঝেছিলেন তাই অকপটে নির্ভয়ে প্রকাশ করে গেছেন, শিল্পীর স্বার্থকতা এইখানেই। বিজ্ঞানকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন এবং একান্ত ভাবেই জীবনে মেনে নেওয়ার পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি তাঁর পুরস্কার প্রাপ্ত সর্বজন পঠিত "স্বর্গ" ছোট গল্পটির মধ্যে এ সুযুক্তি রেখে গেছেন। এ গল্পটি সে সময় বেশ আলোড়ন তুলেছিলো এবং এটি পড়ে অনেকেরই মনে তাঁকে একটি অতীব আধুনিকা উগ্র আলোকপ্রাপ্তা মহিলা বলে ধারণা হয়েছিলো কিন্তু যাঁরাই কৌতূহলি হয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে গিয়েছিলেন তাঁরাই তাঁর দরদী মনের স্নেহধারায় বিগলিত মুগ্ধ হয়ে ফিরেছিলেন। বলতে দোষ নেই এ কৌতূহলিদের মধ্যে আমিও ছিলুম একজন।

———

আঙ্কুর মুক্তি

কবিকঙ্কন হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

যে হবেনা হবেনা করে এক শুভ সন্ধ্যায় নিশাবতীর বে হয়ে গেল। যে কয় বিঘা বেনো জমি ছিল বিধু খুড়ো'র কাছে বন্ধক দিয়ে শশিনাথ কন্যার বিবাহ দিলেন বরাহনগর গ্রামের সীতানাথ চাটুয্যের ছেলে অমরের সঙ্গে।

নিশার আনন্দ আর ধরেনা। একদিন পাড়ার অনেকেই বিদ্রূপ করে বলেছিল "নিশা তোর আর বিয়ে হবেনা—আর যা রূপের ছিরি, তোকে কে আর বিয়ে করবে বল?"—সে দিন নিশা শুধু একবার চেয়ে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল। অন্তের অলক্ষে কতনা চোখের জল তার পড়েছিল—আর আজ? তার মত সুখি কে? ক'জনের স্বামী এত করে তার পত্নীকে ভালবাসে? তার স্বামী আজ গরীব হলেও সে আজ রাজ রাণী। বিবাহ বাসরে বসে অমর বলেছিল "নিশা আমি তোমায় কখন অসুখি করব না সাধ্যমত চেষ্টা করব যাতে তুমি সুখি হও।" কিন্তু করে একটু হেসে নিশা অমরের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে উত্তর দিলে "তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ কর যেন কখন তোমার স্নেহ থেকে বঞ্চিত না হই। তুমিই আমার একমাত্র উপাস্য দেবতা।" বিধাতা অলক্ষ্যে বুঝি একটু হাসলেন।

বি, এ পাশ করবার পর থেকেই চাকরীর চেষ্টায় অমর কলিকাতার সমস্ত সওদাগরী অফিস ও বিভিন্ন কারখানার দরজায় ঘুরে ঘুরে কোন ব্যবস্থাই করে উঠতে পারলে না। সংসারের আয় কিছুই নাই সংসার চলা দায় হয়ে উঠলো। শেষে অনেক চেষ্টার পর বরাহনগর পাট কলে একটি চাকরী পাওয়া গেল নিশা দক্ষিনেশ্বর কালিবাড়ী গিয়া ভবতারিণীর পূজা দিয়া আসিল।

•

পৌষ মাস শীতের রাত্রি। অমরের রোজই কারখানা থেকে বাড়ী ফিরতে রাত হয়ে যায়। নিশা চায়ের পেয়ালাটা এগিয়ে দিতে দিতে বললে "দেখ রোজ এত রাত্রি পর্য্যন্ত কাজ করে তোমার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সাহেবকে বলে কাজ একটু কমিয়ে নিতে পার না?" পাশে অমরের ছোট বোন বিজয়া দাঁড়িয়ে ছিল সেও বৌদির সুরে সুর মিলিয়ে বলে উঠলো "সত্যি দাদা যেন কষ্টকে কষ্ট বলেই মনে করেন না। এতে কি আর শরীর থাকে? যখন অসুখে পড়বে তখন বুঝবে?"

অমর শুধু একটু ঘাড় নেড়ে সায় দিলে "হুঁ" তারপর পেয়ালা থেকে এক চুমুক চা খেয়ে একটু হেসে বললে "তোরা শুধু আমার শরীর খারাপের আশঙ্কাই করছিস আর একদিন কাজে না বেরোলে হাঁড়ি যে কি করে চড়বে তাত ভাবছিস না। রোজগার করে টাকা না নিয়ে এলে খাবি কি বল দিকিনি তোরা শুধু আমার শরীর দেখছিস্-হ্যাঃ।"

নিশা কি বলতে যাচ্ছিল। বিজয়া তাড়াতাড়ি নিশার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে উঠলো, "তুমি থাম বৌদি, আমিই দাদাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি আমরা যে কথা বলতে চাইছি—শোন দাদা, আমরা তো বলছিনা যে তুমি চাকরী ছেড়ে দেও, আর সত্যিই তো চাকরী ছেড়ে দিলে আমাদের যে সংসার চলবে না। আমরা খাব কি? আমরা বলছি আগে ত শরীর তারপর পয়সা রোজগার। শরীরই যদি ভেঙে পড়লো অতিরিক্ত পরিশ্রম করে তো খাটবে কে? পয়সাই বা আসবে কোথা থেকে?"

একটু ঘাড় নেড়ে অমর উত্তর দিলে "সবই বুঝি বিজয়া, কিন্তু একে পাটের কল তায় আবার বছরের শেষাশেষি তার উপর উপর ওয়ালারা এমন কড়া মেজাজের যে দু' চারদিন কামাই করলেই এমন কি যদি দু' চারদিন একটু দেরী হলেই বাস অন্য একজন লোক এসে সেখানে ভর্ত্তি করে নেবে, কোন ওজর আপত্তি আর চলবে না, চাকরীটি চলে যাবে। আমি কি সাধ করে এত রাত করি, তোরা

আমায় ভুল বুঝিসনি বিনু, ভুল বুঝিসনি। বি, এ পাশ করলুম। বাবা মার কত আনন্দ। সার্থক হ'লো তাঁদের পয়সা খরচ। তাঁদের কত আশা, আমি এত টাকা নিয়ে আসব রোজগার করে। বাবা, মা তো চলে গেলেন তারপর কলিকাতার আফিসে ঘুরে বেরিয়েছি কিন্তু কোন ফলই তো হ'লো না। কোন যায়গায় এতটুকু আশা পর্য্যন্ত পাইনি তাই নিরুপায় হ'য়ে এই পাটকলেই চাকরী নিতে হয়েছে সবই আমার অদৃষ্ট রে সবই আমার অদৃষ্ট!"

নিশা চায়ের পেয়ালাটা সরিয়ে নিতে নিতে বললে "থাক তোমায় আর অত দুঃখ করতে হবেনা, আর কোন দিন আমরা আর কোন কথা তোমায় বলবো না। তুমি যা ভাল বুঝবে তাই করবে। তবে যদি ঠাণ্ডা লেগে অসুখে পর তাই আমার এত ভাবনা।"

অমর আড়চোখে একবার নিশার দিকে চেয়ে উত্তর দিলে, "তোমার মত লক্ষ্মী যার সেবায় ও যত্নে দর্ব্বদা রত তার আবার অসুখ করে নাকি? অসুখ—অসুখ আমার কখন করবে না তোমরা নিশ্চিন্ত থাক বিনু?"

"যা ও" বলে নিশা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বিজয়া ও ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললে "তুমি যাকে যাকে কেষ্ট ডাক্তারের কাছ থেকে একটু অষুধ খেও দাদা, তা হ'লে শরীর ভাল থাকবে।"

চেঁচিয়ে হো হো করে হাসতে হাসতে "হ্যাঁরে হ্যাঁ" বলে টেবিলের উপর থেকে একটা খবরের কাগজ টেনে নিয়ে আলোটা একটু উস্কে দিয়ে অমর পড়তে বসলো।

পাটের কলের কাজ বৈকাল সাড়ে চারটে অবধি তার পরই ছুটী হয়ে যায় কি বাবু কি মজুরদের। অমর কিন্তু নিশা ও বিজয়ার কাছে দেরী করে বাড়ী আসার কৈফিয়ত বাবদ জানিয়ে দেয় কাজ বড় বেশী পড়েছে তাই কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ অনুযায়ী তাকে অধিক রাত্রি অবধি খাটতে হয় সুতরাং রোজই বোন ও স্ত্রীর নিকট সে নানা রকম যুক্তি-পূর্ণ কথার জাল বিস্তার করে কাটিয়ে দেয়।

এত রাত করে বাড়ী আসার মূলে কিন্তু ছিল আড্ডা কারখানার পাশেই ছিল একটি ছোট্ট হোটেল খানা এবং রোজই সন্ধ্যায় সেখানে জনকয়েক তরঘুরে যুবক জড় হয় অর্থাৎ এই যুবকগুলির কাজ কর্ম্ম কিছুই নেই। আজগুবি গল্প, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা এবং এখানে ওখানে বিড়ি ফুকে বেড়ানো এই হলো এই যুবকদের পেশা সুতরাং রোজই ছুটির পর এই হোটেলখানায় জড় হতো। অমরও কি রকম করে এদের সংস্পর্শে এসে পড়েছে তাই বাড়ীতে না পেরে রোজই ছুটির পর এই হোটেলখানায় এসে আড্ডা জমায়।

আজ মাসের শেষ তারিখ মাইনে বাবদ সাতাত্তরটি টাকা পকেটে পুরে অমর যখন হোটেলের দরজায় এসে উঠলো তখন বেশ বেলা গড়িয়ে গেছে এই কটি টাকাতেই তাকে সারা মাস চালাতে হবে সংসারের খরচা। পাটকলে ওর চেয়ে বেশী মাইনে আশা করা বৃথা তবে আগে এর উপর দুচার পয়সা উপরি ছিল কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের কড়া নজরে সে পথও বন্ধ হয়ে গেছে আজকাল। বাবুদের তাই এরই উপর নির্ভর করতে হয়।

অমরের হোটেলে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই যুবকগুলি চেঁচিয়ে উঠলো, "আরে এই যে অমরবাবু, এত দেরী হলো যে?" একটি যুবক বলে উঠলো "আজ যে মাইনের দিন, দিন মশাই খাইয়ে দিন"—আর একজন পাশ থেকে বলে উঠলো" "যতই করিবেন দান তত যাবে বেড়ে—বুঝলেন?" অমর হাসতে হাসতে বলে উঠল "সবই বুঝি মশাই কিন্তু পেয়ে উঠি কই—ভাগ্য তো তেমন করিনি। আপনাদের খাওয়াব সেত ভাগ্যের কথা।"

অগত্যা অনেক বাদানুবাদের পর শেষে অমরকে খাওয়াতেই হলো। এবং তার বিল বাবদ সাতটি টাকা দোকানদারের হাতে জমা দিয়ে অমর বাড়ী ফিরল রাত এগারটায়। নিশা তখন একটি ঘরে গালে হাতটি রেখে বসে ছিল বিজয়া ঘুমিয়ে পড়েছিল পাশের ঘরে। রোজের মত নিশা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলে "হ্যাগা, এত দেরী হলো কেন?" গম্ভীর ভাবে অমর উত্তর দিলে "হ্যাঁ।" সুতরাং নিশা আর কোন কথা বলতে সাহস পেলে না। হাত পা ধুয়ে খাওয়া দাওয়া সেরে অমর শুয়ে পড়লো। নিশা কিন্তু আর একটি কথাও বললে না।

এর পর কেটে গেছে অনেকগুলো দিন। অমরের অধঃপতন আরও চরমে উঠেছে এবং মাঝে মাঝে বাইরে

রাতকাটাতেও আরম্ভ করেছে। সুতরাং সংসারেতে যথেষ্ট টানাটানি এবং অশান্তির হাওয়া সর্ব্বদাই বয়ে চলেছে। নিশাবতীর কান্না বিজয়ার কাকুতি মিনতি কোন ফলই হলো না। দিনের পর দিন এমনি করেই দুঃখের মধ্য দিয়ে কেটে চলেছে।

সে দিন অনেক রাত্রি অবধি বাইরে কাটানোর ফলে অনেক বেলায় ঘুম থেকে উঠে অমর যখন কারখানার দরজায় এসে হাজির হলো তখন দরোয়ান দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। অনেক হাঁকা হাঁকির পরও সে দরজা খুললো না বাজখাঁই সুরে জানিয়ে দিলে, উপর ওয়ালার আদেশ অনুযায়ী তাকে দরজা বন্ধ করতে হয়েছে এবং পুনঃ আদেশ না পাওয়া অবধি দরজা খুলতে পারেনা। সুতরাং অমর বাড়ী ফিরে এল। নিশা তখন সবে উঠান ঝাঁট সেরে পুকুরে কাপড় কাচতে যাচ্ছে। ঘরকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে "ফিরে এলে যে"—অমর তখন কাজ কামাই হ'লো বলে রাগে ফুলছিল সামনে দাঁড়িয়ে নিশাকে এই প্রশ্ন করাতে যত রাগ গিয়ে পড়লো তার উপর—"সকালে ডেকে দিতে পারনি রাক্কেস" বলে সজোরে এক লাথি মারলে নিশার পেটে। "মাগো" বলে নিশা ছিটকে গিয়ে পড়লো উঠানের পশ্চিম দিকে তুলসী মঞ্চের উপর: ইটের কোন লেগে রগ কেটে রক্তের নদী বয়ে গেল। অমর একবারটি মাত্র সেদিকে তাকিয়ে দেখলে তারপর যে পথে বাড়ী ঢুকেছিল সেই পথেই বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে।

বিজয়া ঘুম হতে উঠে রোয়াকে বেরতেই দেখতে পেলে নিশা এক ধারে জড়সড় হ'য়ে দু হাতে মাথা চেপে ধরে বসে আছে, আর দু হাতের কনুই বেয়ে ঝুঁকিয়ে রক্ত পড়ছে। সে চেঁচিয়ে উঠলো—"একি বৌদি?"

নিশার যেন বিশেষ কিছুই হয়নি এমনি ভাবে উত্তর দিলে, "হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেলুম তাই তাই রগটা কেটে গেছে। এমন কিছুই হয়নি ও এখনই সেরে যাবে এখন।"

বিজয়া খানিকটা জল নিয়ে এল এবং বৌদিদির ক্ষতস্থান ধুয়ে দিয়ে বেশকরে ব্যাণ্ডেজ করে দিলে। রগটা কেটেছেও অনেকখানি।

ক্রমশঃ দুপুরের রোদ গড়িয়ে পড়লো ঘরের পিছন দিকে কিন্তু অমর সেই যে সকাল বেলা বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে এখনও বাড়ী ফেরবার নামটি নেই। নিশা কোলের কাছে ভাতের থালাটি বেড়ে নিয়ে বসে সারা হয়ে যাচ্ছে। বিজয়া খাবনা খাবনা করছিল, কিন্তু নিশার তাড়ার চোটে সে দুটি খেয়ে নিয়েছে নিশা কিন্তু তখনও খায়নি কারণ অমর যে এখনও অভুক্ত অবস্থায় বাইরে রয়েছে।

বিজয়া কয়েকখানা বাসন পুকুর হতে মেজে নিয়ে এসে রান্নাঘরের দাওয়ায় রাখতে রাখতে বললে, "আচ্ছা বৌদি, দাদা আজ এখনও কাজ থেকে ফিরছে না কেন? বেলা যে দু'টো বাজতে চলল?"

নিশা শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর দিলে "কি জানি ভাই?" ক্রমশঃ বিকেল, তার পরে সন্ধ্যে অমরের এখন পর্য্যন্ত বাড়ী ফেরার নামটি নেই। নিশা পা দু'টো ছড়িয়ে দিয়ে কাঁদতে বসলো। বিজয়া গিয়ে বাইরের দরজায় দাদার প্রতিক্ষায় রইল। যাকেই সে সামনে দেখতে পায় তাকেই দাদার কথা জিজ্ঞাসা করে কিন্তু কেহই ঠিক করে কিছুই বলতে পারে না।

এবারে অমর সেই যে নিশাকে লাথি মেরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল, পথে পা দিতেই সে হোটেলখানার একটি তরফুরে ছেলের দেখা পেলে এবং সোজা একদম হোটেলে গিয়ে উঠলো। নানারকম খোস গল্প ও আড্ডা দেয়ার পর বেলা বারটার সময় সে হোটেল থেকে বাইরে বেরুতেই সে খবর পেলে তার চাকরীটি গেছে এবং তার যায়গায় অন্য লোক নেওয়া হয়েছে। তার মাথা ঘুরে গেল। পাগলের মত হয়ে অমর ছুটে চললো দক্ষিনেশ্বরের দিকে—তার তখন মাথার ঠিক ছিল না. তার বউ, তার বোন সে নিজে আজ খাবে কি? এই প্রশ্ন আজ তার মনে জাগলো। বিগত দিনের ইতিহাস আজ তার চোখের সামনে ফুটে উঠলো। আরও সকালের ব্যবহারে তার বুকের ভিতরটা রি রি করে উঠলো। বাড়ীতে সে কি করে মুখ দেখাবে? চারি দিকে তার জিজ্ঞাসার প্রশ্ন তাকে পাগল করে তুললো। দক্ষিণেশ্বর ষ্টেশনের কাছ বরাবর এসে সে সুধীরকে দেখতে পেলে। এই সুধীর অমরের বাল্যবন্ধু এবং এক সঙ্গেই কলেজের পড়া শেষ করেছে সুধীর

এখন কী কাঁর একটি অস্ত্রখনির মালিক। সে কয়েক দিনের জন্যে বাড়ী এসেছিল আজ আবার খনিতে ফিরে চলেছে। অমরকে এই রকম পাগলের মত পথ চলতে দেখে, সে তাকে চেঁচিয়ে ডাকলে।

সুধীর অমরের মুখে সব কথা শুনে বলল "তবে তো খুব মুস্কিলে পড়েছিস্—আচ্ছাই তোর কাল, আজকাল চাকরী পাওয়া যায়না তার তুই বেলায় চাকরীটা হারালি—যাই হোক এখন কি করবি মনে করেছিস্?"

বিষণ্ণ মুখে অমর উত্তর দিলে "দু'চোখ যে দিকে যায় চলে যাব আর কি করব?"

সুধীর খানিক্ষণ কি ভাবলে তারপর বল্‌লে—"তুই আমার সঙ্গে কাঁ কাঁ যাবি? তোকে আমি যা হয় একটা ব্যবস্থা করে দেব।" অমরের আর দেরী সইল না, সে আবেগ ভরে দু'হাতে সুধীরের গলা জড়িয়ে ধরে বলে উঠলো "আমি এখনই যাব ভাই—তোর সঙ্গে।" অমরের আর বাড়ী ফিরে যাওয়া হ'লো না কারণ ট্রেণ এসে পড়েছিল। সে বাড়ী-ঘর, বউ, বোন সব ভুলে গিয়ে সুধীরের সঙ্গে কাঁকাঁয় চলে গেল।

পরদিন সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গেই নিশা চীৎকার করে কেঁদে উঠলো। বিজয়া কত করে বোঝাতে লাগলো "দাদা নিশ্চয় কোন বন্ধুর সঙ্গে কোথাও গিয়েছেন, দু'এক দিনের মধ্যেই ফিরে আসবেন"—কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'লো না। নিশার কান্না থামান গেল না।

দিনের পর দিন যায়, আহার নিদ্রা ত্যাগ করে নিশা কেঁদেই চলেছে। শেষে অতিরিক্ত কান্নার চোটে তার চোখ দু'টো অসম্ভব রকম ফুলে উঠলো এবং চোখের ভিতর যা হয়ে চোখ দু'টি অন্ধ হয়ে গেল পাষা জীবনের মত তবুও যখন খুব কষ্ট হত তখন ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বিজয়াকে বল্‌তো "দেওনা ভাই তোমার দাদার ছবিখানা একবার?" বিজয়া আঁচলের খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে দেয়ালে টাঙ্গানো অমরের ছবিখানা পেড়ে এনে নিশার হাতে দিত। নিশা দু'হাতে ছবিখানা বুকে চেপে ধরে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠতো—দুটি অন্ধ চোখ বেয়ে তার জলের ধারা নেমে টপ টপ করে মেঝে ভেসে যেত।

এমনি ভাবে কেটে গেল বহু দিন। অমর কাজের ভিড়ে বাড়ীতে চিঠি দিতে পারেনা। সারাদিন হাড় ভাঙ্গা খাটুনির পর দুই বন্ধুতে হিসাব নিকাশ করে অনেক রাত অবধি, তারপর খাওয়া দাওয়া সেরে শুয়ে পড়ে। আবার ভোর না হতেই আবার কুলি খাটতে যেতে হয়। কিছুদিনের মধ্যেই অমরের শরীর ভেঙ্গে পড়লো। সেদিন সারাক্ষণ অক্লান্ত পরিশ্রমের পর অমর সুধীরের সঙ্গে যখন বাসায় ফিরল তখন তার সমস্ত শরীর খুব জ্বালা করছিল এবং চোখ দু'টো বেশ লাল হয়ে উঠেছে। সুধীর কপালে হাত দিয়ে বল্‌লে "তোর যে জ্বর হয়েছে রে অমর?" একটু ম্লান হাসি হেসে অমর বল্‌লে,—"হ্যাঁ ভাই, শরীরটা যেন কেমন করছে।" বাসায় এসে খাওয়া দাওয়া না করেই অমর শুয়ে পড়লো বিছানায়।

• • বার দিনের দিন অনেক রাত্রে অমর বিকার ঘোরে চীৎকার করে উঠলো, 'নিশা—নিশা, আমার আঘাত ভুলে যাও নিশা, আমায় তুমি ক্ষমা কর। পাশের বিছানা থেকে সুধীর উঠে জলপটি বদলে দিয়ে মাথায় হাওয়া করতে লাগলো। কিন্তু অমরের ভুল বকুনির কিছু মাত্র উপশম হ'লো না। পরদিন সকাল বেলাই সুধীর অমরের বাড়ী টেলিগ্রাম করে দিলে—"বৌদি, অমর ভয়ানক অসুস্থ শীঘ্র আসুন।"

দুপুর বেলা রোয়াকের এক কোনে বসে নিশাবতী ও বিজয়া অমরের কথা নিয়েই আলোচনা করছিল। নিশা বেচারী আর চোখেও দেখতে পায় না, সামান্য যা কিছু কাজকর্ম করে সবই হাতড়ে হাতড়ে। বিজয়ার সাহায্য ব্যতীত সে এক পাও আর নড়তে পারে না।

কথার ফাঁকে বিজয়া বল্‌লে,—"আচ্ছা বৌদি তুমি কিছু দেখতে পাওনা বলে কত কষ্ট হয়, না ভাই?" নিশাবতী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর দিলে—"কষ্ট কিছুই হ'তো না বোন যদি তাঁকে কাছে পেতাম। যদি একবারটি তাঁর সেবা করতে পারতাম তা হলে স্বর্গ সুখ পেতাম। আমার সমস্ত কষ্ট সমস্ত যন্ত্রণা লাঘব হয়ে যেত। জানত তাই স্বামীই স্ত্রীলোকের দেবতা, স্বামীই নারীর স্বর্গ, এ স্বর্গ, এ দেবতা আমার থেকেও নেই। আমার বুকে যে কতকষ্ট তা তোমায় কি করে বুঝাব? আমি দিন রাত ভগবানকে ডাকছি যে তিনি ফিরে

অ'ন্থন—এর চেয়ে বেশী আমার জীবনে কোন সাধ নেই আমি শুধু তাঁর পা ধরে পড়ে থাকব।"

এমন সময় বাইরের দরজায় জোরে জোরে কড়া নাড়া উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে পিয়নের চীৎকারও ভেসে এলো—"বাড়ীতে কে আছেন? জরুরী টেলিগ্রাম আছে।"

"ঐ ভাই পিয়ন এসেছে, যাই দেখি?" বলে বিজয়া উঠে ছুটতে ছুটতে বাইরের দরজা খুলতে চলে গেল।

নিশার মনে যেন একটা আলোর ঝলকানি ছুটে গেল, চেঁচিয়ে বলে উঠলো,—"কার চিঠি ভাই ঠাকুর ঝি?"

বিজয়া ধরা গলায় উত্তর দিলে, চিঠি নয়, টেলিগ্রাম, দাদার বড় অসুখ। তিনি কাঁকরায় আছেন, সুধীরদা শীঘ্র যেতে লিখেছেন।" নিশার যেন মুখ থেকে আর কথা বেরয় না। শুধু মুখখানি উঁচু করে অন্ধ চোখ দুটি যত দূর সম্ভব প্রসারিত করে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল।

বিজয়া বসে পড়ে দু'হাতে নিশার দুটী কাঁধে কাকুনি দিয়ে বলে উঠলো, "কি হবে বৌদি?"

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় নিশা চীৎকার করে উঠলো, "কি আর হবে ভাই, এখনই বাক্স-কাপড়গুলো গুছিয়ে নেও"—

কাঁকরা ষ্টেশনের বাইরে রাস্তায় পা দিয়েই বিজয়া বলে উঠলো, "তুমি আমার হাতটা একটু শক্ত করে ধর বৌদি? দেখি কাউকে জিজ্ঞাসা করে যদি কেউ সুধীরদার বাসাটা দেখিয়ে দিতে পারে?" এমন সময় পিছন হতে সুধীর সাইকেলের ব্রেকটা চেপে ধরে নেমে জিজ্ঞাসা করলে "বিজয়া না? হ্যাঁ বিজয়াই তো!"

সম্মুখে সুধীরকে দেখে—ভয়চকিত কণ্ঠে বিজয়া বললে, "দাদা কেমন আছ সুধীরদা?"

—"খুব ভাল না, এই তো ডাক্তারের বাড়ী গেছলুম—চল্ চল্ শিগ্‌গির চল্।"

কোন রকমে নিশাকে টেনে নিয়ে বিজয়া জোরে জোরে হেঁটে চললো। সুধীরও এগিয়ে এগিয়ে চললো পথ দেখিয়ে।

ছোট্ট একটি বাংলোর বারান্দায় উঠতে উঠতে সুধীর বিজয়াকে বললে "ওই ওষারের ঘরে অমর আছে। এস এই দার দিয়ে এস।"

ঘরের মধ্যে পা বাড়িয়েই বিজয়া আঁৎকে বলে উঠলো "ওকি সুধীর দা, দাদা অমন করে শুয়ে কেন?" সঙ্গে সঙ্গে নিশাবতী হুড়মুড় করে অমরের বুকের উপর কাঁপিয়ে পড়লো। পাশের ঘর থেকে খনির ম্যানেজার বেরিয়ে এসে সুধীরকে বললো, আপনি ডাক্তারের বাড়ী যাবার পরই উনি হার্টফেল করেছেন। জোরে আছাড় খেয়ে পড়ার ফলে নিশাবতী অজ্ঞান হয়ে গেল—কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় সুধীর তাড়াতাড়ি নিশাবতীকে ধরে তুলতে গিয়ে দেখে তার দেহে প্রাণ নেই অন্ধ জীবনের সমস্ত কষ্ট সে স্বামীর বুকেই জুড়িয়ে নিলে।

অধিক রাত্রে সকলে যখন সৎকার করে বাংলোয় ফিরে এল তখন বিজয়াকে কেহ দেখতে পেলেনা শুধু বহু দূরে সুধীর কাতর কণ্ঠের দু'টি ডাক শুনতে পেলে, "দা—দা, বৌ-দি"—তখনই লোক ছুটলো খুঁজতে কিন্তু বিজয়াকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। একটি বর্ষীয়সী গৃহস্থ ঘরের ইতিহাসে এমনি করে ছেদ পড়ে গেল।

একটি রাজপথের আত্মকাহিনী

কুমারী অনুরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়

বহুদিন আগেকার একটি দিনের কথা মনে পড়ে। যেদিন আমার চারপাশ ছিল শুধুই কাঁটাঝোপে ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ আমি ছিলাম বটে, কিন্তু "আজকের আমি"র সঙ্গে "সেদিনের আমি"র কোন সাদৃশ্যই আর নেই। তখন আমি ছিলাম সেই ঘন জঙ্গলের মধ্যে নুড়ি অবস্থায়। আজ নিজের দিকে চেয়ে সেই আগেকার দিনগুলো মনে পড়ে। একেক সময় মনে হয় কোন অবস্থায় বেশী সুখে ছিলাম? সেই অজ্ঞাত জনহীন অরণ্যের মধ্যে, না আজ? তোমরা হয়ত বলবে সেই অজ্ঞাত জনহীন অরণ্যের মধ্যে নুড়ি অবস্থাতেই যদি চিরদিন কাটত তাহলে তো আমার নাম কেউই জানতে পারতনা। তা অবশ্য সত্যি কথাই। আজ আমার নাম আর কে না জানে? আমার এই বিস্তৃত কাল পিচ্ ঢালা দেহের উপর মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মহানগরীর বিরাট বিরাট প্রাসাদ তাদের বিশাল বপু নিয়ে। ক-ত লোকজন সারাদিন আমারই ওপর দিয়ে যাতায়াত করছে। কত বিভিন্ন ধরণের যানবাহন চলাফেরা করছে।

ইলেকট্রিক আলোর ছটা আমার দেহকে করছে আলোকিত পোষ্টাফিস দোকান, বাজার আরও কত কি সৃষ্টি হয়েছে। সারাদিন আমার চারিধার লোকজনের কোলাহলে হয়ে থাকে মুখরিত। আমি অবাক হয়ে এই ইটসুরকির বিরাট জগতের দিকে তাকিয়ে থাকি। অবাক হয়ে ভাবি মানুষ কি বিচিত্র জীব! কি না তারা করতে পারে। এত অদ্ভুত ধরণের গাড়ী, ঘোড়া, বাড়ী, ইলেকট্রিক আলো এ সব তো তাদেরই সৃষ্টি। মানুষই বা কত রকমের! কেউ ধুতি পাঞ্জাবী পরা কেউ বা কোট প্যান্ট পরা। তাদের পোষাকের বিভিন্নতার সঙ্গে আছে ভাষারও বিভিন্নতা!

সারাদিন ধরে এই সব বিস্ময়কর পরিবেশে নিজেকে হারিয়ে ফেলি সারাদিনের শেষে গভীর রাত্রে যখন আমার চারিদিক কিছুটা শান্ত হয়ে যায় তখন পৃথিবীর বুকে আমিই একা জেগে থাকি। এত কিছুতেও আমি আজ সুখী নই। যখনই মনে পড়ে বহুদিন আগের সেই দিনগুলো তখন মনে হয় তখনই ছিলাম সুখী।...

কারণ তখন জগৎ জননী আমায় সাজিয়েছিলেন। শ্যামলিম পোষাকে বহু যত্নে তিনি আমায় সাজিয়ে দিয়েছিলেন। কত রাত্রে শুভ্র জ্যোৎস্না ধারা ঝরে পড়ত আমার দেহে। মনে হত যেন জননীর আশীর্বাদের সঙ্গে সন্তানের মঙ্গল কামনায় দুই ফোঁটা অশ্রুবিন্দু পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়েছে। আজ এই ইলেকট্রিক আলোর সঙ্গে তার তুলনা হয়না। সারাদিন আমার দেহ রোদের তাপে পুড়ে যায়, পীচগুলো গরম হয়ে ওঠে। আবার অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা সহ্য করে দাঁড়িয়ে থাকি। গভীর রাত্রে নির্জন পৃথিবীর দিকে চেয়ে শুধুই ভাবি। ভাবতে ভাল লাগে। যেদিন চলে গেছে সেদিন তো আর আসবে না তবু কল্পনায় যেটুকু আনন্দ লাভ করা যায়। বড় দুঃখ হয় ভেবে যে জগৎ জননী আমায় পরম স্নেহে নিজে হাতে যে পোষাকে সাজিয়ে দিয়েছিলেন মানুষ তা খুলে দিয়ে নষ্ট করে দিয়েছে তারা চেয়েছে আমাকে উন্নত সভ্য করে তুলতে তাই আজ এই বিজ্ঞানের যুগে তোমাদের মুখে কেবলই শুনি আমাদের নাকি খুব উন্নতি হচ্ছে। কিন্তু তোমাদের এই উন্নতিতে আমার মন সায় দেয় না। জগৎ জননীর নিজের হাতে সজ্জিত যে জগৎ তাকে ভেঙে মানুষ নিজে হাতে তাকে গড়ে তুলছে। তা যত বিস্ময়জনক সৃষ্টিই হোক্ না কেন মায়ের সেই স্নেহপূর্ণ হাতের সৃষ্টির সঙ্গে তোমাদের সৃষ্টির তুলনা করতে পারি কই?...

———

কৃষ্ণকলি

(উপন্যাস)

ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

(১৪)

দীর্ঘদিন পরে কোলকাতায় ফিরে এসে কৃষ্ণার সবকিছুই কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকতে লাগল। কিছুতেই তার মন বসে না। সহপাঠিনীদের কাছে প্রয়োজন সত্ত্বেও তার যেতে ইচ্ছা করে না। সকল সময় ঘরের মধ্যে বসে থাকে চুপচাপ। মাঝে মাঝে তরুর সঙ্গে ঘরসংসারের কাজকর্ম করে; কিন্তু কথা খুব কমই বলে। দিন দিন সে যেন কোন্ অজানার অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। তার হাবভাব দেখে তরু মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

একদিন চুল বেঁধে দিতে বসে বললেন, হ্যাঁ রে কৃষ্ণা, তোর হোল কি? পড়াশুনায় মোটে মনিস না, এ বছর পরীক্ষা দিবিনে না কি?

কৃষ্ণা বললে না পিসিমা, পরীক্ষা আমি আর দেব না।

তরু বললেন, কেন রে, শরীর ভাল আছে ত?

হ্যাঁ পিসিমা, কৃষ্ণা বললে, শরীর ভালোই আছে, কিন্তু আমার কিছু ভাল লাগে না। কোন কাজে মন বসে না। কেবল মনে হয় আমিও হয়ত দিদির মত কোনদিন হঠাৎ মরে যাবো; তোমরা আমার জন্য কত দুঃখ করবে, কিন্তু আমি আর তোমাদের মাকে ফিরে আসতে পারব না।

তার কথা শুনে তরুর বুকের মধ্যে তোলপাড় উঠল; হায়। মেয়েটার শেষে মাথা খারাপ হয়ে যাবে নাকি? আর তিনি বেঁচে থাকবেন এই সব দেখবার জন্য? কিন্তু চিত্ত সংযত করে তিনি বললেন, ছিঃ কৃষ্ণা! তোর মন এত দুর্বল, তা তো আমি জানতুম না। মরা বাঁচা ত মানুষের হাত নয়, মা! তবে তার জন্যে এত মন খারাপ করে লাভ কি? মরণকে যত ভয় করা যায়, সে তত জোরে মনের ওপর চেপে বসে। কাজেই মনের মধ্যে একটা ভয় নিয়ে কি ভালভাবে বেঁচে থাকা যায়?

কৃষ্ণা কাঁদো কাঁদো স্বরে বললে, কি করব পিসিমা, আমার যে কিছু ভাল লাগে না।

তরু বললেন, আমি যা বলি, কর—দেখবি, ধীরে ধীরে আবার সব আগের মত হয়ে যাবে। আজ চল আমার সঙ্গে শঙ্করের বাড়ী। বেচারা বুকে ঠাণ্ডা লেগে ভয়ানক ভুগছে। রোজ তোর কথা জিগ্যেস করে। তোর কি একবার ওকে দেখতে ইচ্ছে করে না?

না পিসিমা, কৃষ্ণা বললে, ওকে দেখলেই আমার দিদির কথা মনে পড়ে যায়।

তুই বড় স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছিস কৃষ্ণা—তরু রাগতস্বরে বললেন। ও পরের ছেলে, ওর কথাই আমাদের বেশী করে ভাবা উচিত; তা নয় তোর সব তাতে বাড়াবাড়ি। কৃষ্ণাকে নীরব দেখে তিনি আবার বললেন—আজ আমার একাদশী; হাত পা গুলো বড় ব্যথা করছে; আজ আমার আর বেরোতে ইচ্ছে করছে না। বিকেলবেলা ওদের গাড়ী এলে তুই গিয়ে শঙ্করকে দেখে আয়, বুঝলি?

তরুর একাদশীর কথা স্মরণ করে, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কৃষ্ণা বললে, আচ্ছা, যাবো।

নিশ্চিন্ত হয়ে তরু তার খোঁপার কাঁটা গুঁজতে গুঁজতে বললেন—এই ত লক্ষ্মী মেয়ের মত কথা হোল। বাইরে বেরো, লোকজনের সাথে মেলামেশা কর, দেখবি আস্তে আস্তে মন ঠিক হয়ে যাবে। দিন কারো জন্য বসে থাকে না, সে চলে যায়; কিন্তু সময়মত কাজ করে নিতে না পারলে তার জন্য মানুষকে অনুশোচনা করতে হয়।

কৃষ্ণা চোখ তুলে তরুর পানে তাকাল, কোনও উত্তর করল না। তরু বললেন—পড়া তোর যা হয়েছে, তাই নিয়েই পরীক্ষা দিয়ে দে; পাশ করিস ভালো, না করিস্ পরের বছর আবার দিবি। মিছেমিছি বসে থেকে লাভ কি?

কৃষ্ণা মৃদুকণ্ঠে বললে—পড়ার জন্য আমি ভাবছিনে, পিসিমা; সে আমার হয়ে গেছে।

তরু বললেন, তবে আর ভাবনা কি? নে, এখন যা—গা ধুয়ে এসে তৈরী হয়ে নে; একটু পরেই শঙ্করের গাড়ী এসে পড়বে। তুই চলে যা, ওদের সঙ্গে দেখা করে আয়।

তরুর তাড়ায় কৃষ্ণা উঠে কাপড় গামছা হাতে নিয়ে কলঘরে গেল।

অনেকদিন পর কৃষ্ণা আজ বাগানে নেমেছে। শঙ্করের পাড়ী আসার অপেক্ষায় সে মাঠে আনমনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেয়ারির পাশে কৃষ্ণকলির ঝাড়ে ফুটেছে রাশি রাশি লাল, সাদা আর হলুদ রঙের ফুল। মাঠ আলো করে থরে থরে ফুটে রয়েছে গোলাপী ফুল। তাদের মৃদু সুগন্ধ একত্রিত হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে অপরাহ্নের মন্দ বাতাসে। কৃষ্ণা কৃষ্ণকলির ঝাড় থেকে একটা সদ্যপ্রস্ফুটিত ফুল ছিঁড়ে নিয়ে খোঁপায় পরলো। তারপর কি মনে করে মাথা থেকে টান মেরে ফুলটী খুলে নিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে, মাঠে একটি বিলাতী সুপারীঝাড়ের নীচে বসে পড়ল। তার মন তখন নানান সংশয়ের দোলায় অবিশ্রান্তভাবে দুলছিল। শঙ্করের অসুখ করেছে; তার বন্ধু রঞ্জন নিশ্চয়ই তাকে দেখতে আসে এবং কর্মশেষে সে নিশ্চয়ই এই সময়ে আসবে। কিন্তু এর মধ্যে কৃষ্ণা গিয়ে কি করবে? রঞ্জনের সঙ্গে আকস্মিক সাক্ষাতের ভয়েই কৃষ্ণা এতদিন শঙ্করের পীড়ার সংবাদ পেয়েও, পারিবারিক অসুবিধার অজুহাতে তাকে দেখতে যায়নি। আজ কিন্তু সে তরুর আদেশকে কিছুতে অমান্য করতে পারলনা। অথচ কর্তব্য পালনের সম্মুখীন হয়ে আশঙ্কায় তার হৃদয় কাঁপছে। রঞ্জনকে সে মনে মনে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও স্নেহ করে, কিন্তু তার সকরুণ আবেদনকে সে কিছুতেই সমর্থন করতে পারে না। একমাত্র শঙ্কর ভিন্ন অন্য কোনও পুরুষের কথা চিন্তা করতেও কৃষ্ণা মনে মনে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করে। কোনও পুরুষকে বিয়ে করে, তার ঘরসংসার করার কথা সে কখনো মনেও স্থান দেয় না। শৈশবাবধি অত্যন্ত স্বাধীনভাবে লালিতপালিত হওয়ার জন্য কারও অধীনতা স্বীকারকে সে অত্যন্ত ভয় করে। সে মনে মনে স্থির করে রেখেছে—এম-এ পাশ করে কোনও কলেজে অধ্যাপিকার কাজ নিয়ে সে জীবনটা বেশ শান্তিতে কাটিয়ে দেবে। শঙ্কর তার আশৈশবের বন্ধু। মানুষকে ভালবাসায় কোনও পাপ নেই। কাজেই শঙ্করকে সে মনে মনে চিরদিন ভালবাসবে তার এই পবিত্র ভালবাসায় কোনও গ্লানি নেই। এ ভালবাসায় শুধু আত্মার আলোকতীর্থের পথ উন্মুক্ত হয়, দৃষ্টির স্বচ্ছতা পরিবর্দ্ধিত হয়। এই ছিল তার ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনা। কিন্তু এর মধ্যে অকস্মাৎ রঞ্জন ধূমকেতুর মত উদয় হয়ে তার জীবনে এক জটীল সমস্যার সৃষ্টি করে বসে আছে। কৃষ্ণা কিছু বুঝতে পারে না, সংসারে এত মেয়ে থাকতে রঞ্জনের হঠাৎ তার উপর কেন এই শুভদৃষ্টি পড়ল? ছেলে ত সে অসৎ বা অবিবেচক নয়, তবে? সে বুঝতে পারে তরুই রঞ্জনের মনে এই বাসনার বীজ উপ্ত করে দিয়েছেন। তরুর প্রতি রুদ্ধ আক্রোশে সে মনে মনে গর্জাতে থাকে। কেন, কি দরকার ছিল কৃষ্ণাকে এই রকম অবাঞ্ছিত ঘটনার মধ্যে ফেলবার? সে কি বাড়ী থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল? মাঝে মাঝে তার ইচ্ছে করে, এই সব সমাজবন্ধন ত্যাগ করে কোনও দূর বিদেশে চলে গিয়ে ইচ্ছামত জীবনযাপন করতে। কিন্তু মাতৃসমা তরুর মুখের পানে চেয়ে মনের ইচ্ছাকে সে সংযত করে রাখে। তথাপি রঞ্জনের ম্লান মুখ সে কিছুতে ভুলতে পারে না। রঞ্জনকে দুঃখ দিয়ে সেই দুঃখ সে অহরহ নিজের হৃদয়ে অনুভব করে। কিন্তু এই দুঃখ দেওয়া আর দুঃখ পাওয়া ছাড়া তার আর করণীয় কিই বা আছে? এই কারণেই সে রঞ্জনের সম্মুখীন হতে ভয় পায়। কিন্তু বিধাতার লীলা অবর্ণনীয়, অকল্পনীয়। তাঁর অযোঘ বিধান গ্রহণ করবার জন্য মস্তক সকল সময় অবনত রাখতে হবে। তাঁর আশীর্বাদ, অভিসম্পাত মানবজীবনে দুইটিই শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

অতি সন্তর্পণে বাহির হতে শঙ্করের কক্ষমধ্যে ঝুঁকে দেখে কৃষ্ণা আশ্বস্ত হোল। না, সেখানে রঞ্জন উপস্থিত নেই। শয্যায় নিমীলিতনয়নে শুয়ে আছে শঙ্কর, এবং শিয়রে বসে আছেন তার বৃদ্ধা জননী। কৃষ্ণা ঘরে ঢুকে বৃদ্ধাকে প্রণাম করতেই, তিনি সচকিত হয়ে তার চিবুক স্পর্শ করে বললেন, 'আহা! বেঁচে থাকো, মা; হ্যাঁ মা, তুমিই ত কৃষ্ণা, না?'

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে কৃষ্ণা শঙ্করের পানে দৃষ্টিপাত করতে দেখলো—সে অপলকে তার পানে চেয়ে আছে। কৃষ্ণা নত হয়ে তার ললাট স্পর্শ করে বললে—এখন কেমন আছ, শঙ্কর?

শঙ্করের কিছু বলার আগেই বৃদ্ধা বললেন, কাল থেকে জ্বরটা বন্ধ হয়েছে, মা, তবে বুকে পিঠে বেদনা ও কাশিটা এখনও আছে। আমার যা ভয় হয়েছিল যাছা, যে কি বলবো! তোমার পিসিমা আসেন নি আজ?

কৃষ্ণা বললে, পিসিমার আজ একাদশী, হাত পা কাম-

ডাকছে, তাই তিনি আসতে পারলেন না ; আমায় আসতে বললেন।'

বৃদ্ধা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আহা ! অল্প বয়স, কষ্ট ত হবেই ! তা তুমি এখানে বোস মা—আমি কাপড় ছেড়ে জল সন্ধ্যাটা করে আসি।

কৃষ্ণা তাঁর পরিত্যক্ত স্থানে বসে বললে—'আচ্ছা মাসীমা, আমি বলছি—আপনি জল সেরে আসুন।

বৃদ্ধা চলে যেতে কৃষ্ণা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললে —কেমন আছ শঙ্কর ?

শঙ্কর তার প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে, হাত বাড়িয়ে তার একখানা হাত টেনে নিয়ে নিজের ললাটের উপর চেপে ধরে পূর্ববৎ শুয়ে রইল।

(১৫)

বিকাশবাবুর দীর্ঘ গৃহের উত্তোদিক দীর্ঘ চৌকির উপর বসে আছে রঞ্জন। তার সামনে বই খাতা ছড়িয়ে বসে আছে শীলু এবং তার আরও দুটি ছোট ভাই। তারা ঝুলে ঝুলে পড়া মুখস্থ করছে, কখনও রঞ্জনকে মানে জিজ্ঞেস করছে। রঞ্জন অভিনিবেশ সহকারে দেখছে তাদের পাঠাভ্যাস। তারা শিশু, তারা ফুলের কুঁড়ি। তাদের ফোটার জন্য যতটুকু শ্রম, যতটুকু উৎকণ্ঠা ব্যয় করা হবে, তারা ঠিক ততখানি সফলতা ও সৌন্দর্য নিয়ে ফুটে উঠবে। তথাতীত অযত্নে অকালে ঝরে যাবে, নচেৎ জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকবে। আর উপযুক্ত যত্নে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়ে সংসার বিপিনের শ্রী বর্দ্ধন করবে। রঞ্জন একদিন কথায় কথায় বিকাশবাবুকে বলেছিল, আচ্ছা, বিকাশবাবু, আপনি শিক্ষিত এবং উপার্জনক্ষম হয়েও আপনার সন্তানগুলিকে এমন অযত্নে প্রতিপালন করছেন কেন ?

কারখানার ঘণ্টা এই প্রশ্নের জন্য বিকাশবাবু প্রস্তুত ছিলেন না। প্রথমটা তিনি একটু আমতা আমতা করে পরে বললেন, কি করি বলুন স্যার ! জানেনই ত আমার অবস্থা। সকালে আমার মোটেই সময় থাকে না। আপিসে আসার আগে যেটুকু সময় বাড়ীতে থাকি, একটা তরকারির বাগান করেছি, সেটা দেখাশোনা করতেই কেটে যায়। তারপর সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরে যদি একটু ওদের নিয়ে বসলুম, অমনি গিন্নী এসে সুরু করবে—সংসারের এটা নেই, ওটা নেই। তার মধ্যে আবার পাড়া-প্রতিবেশীর যাতায়াত আছে এর মধ্যে কখনও ছেলেদিকের লেখাপড়ায় মন বসে ? একটা ইস্কুলে দিয়েছি ; তা সেখানে মাসে এত টাকা করে দিয়ে রোজ যাওয়া-আসাই সার হয়। মাষ্টারেরা রোজ আসেই না, তা ছাত্রেরা পড়বে কি ?

রঞ্জন বললে, 'ও গ্রাম্য স্কুলের রীতিনীতি আমি জানি। এ বিষয়ে অনুযোগ করলে শিক্ষকরা বলবেন—তাঁরা মাষ্টারী করে যা বেতন পান তাতে তাঁদের পেট ভরে না ; তাই অন্য উপায়ের ধান্ধায় তাদের এদিকে ওদিকে চেষ্টা দেখতে হয় এবং সেই জন্য শিক্ষকতার কাজও অসময়ে থেকে যায়। এ সব আমি জানি। এই জন্যই, সন্তানকে ভাল করে শিক্ষা দিতে হলে গৃহশিক্ষার ভিত্তি দৃঢ় হওয়া চাই। আপনার সময় হয় না ঠিক—কিন্তু আপনার স্ত্রী ত এ বিষয়ে কিছুটা সচেতন হতে পারেন ?'

বিকাশবাবু একটি নিঃশ্বাস ফেলে বললেন হায় ভগবান ! স্ত্রীর দৃষ্টি যদি এদিকে সতর্ক হত তবে ছেলেটাকে এই বাচ্চা বয়সে কারখানায় মিস্ত্রী করে ঢোকাতে হোত না আমাকে। এই ত মেয়েটার সবে বছর এখনও পার হয়নি, এখন থেকেই ওর বিয়ের জন্য ওর মা আমাকে দুই সন্ধ্যে তাগাদা দিয়ে অস্থির করে তুলেছে।

রঞ্জন আঁৎকে উঠে বললে, বলেন কি, শীলুর বিয়ে ? ও কি জানে ? পরের বাড়ী গিয়ে কি করবে ও ?

করবে আর কি ?—বিকাশবাবু বললেন, 'দু'বেলা হাঁড়ি ঠেলবে, বাসন মাজবে আর বোকামির জন্য পরের কাছে লাথি ঝাঁটা খাবে। বুঝতেই পারছেন স্যার, আমার যা অবস্থা তাতে এমন কিছু সৎপাত্রে মেয়ে দিতে পারব না। স্যার, আপনি আমার মনিব হলেও, বয়সে প্রায় ছেলের সমান, তাই আপনার কাছে দুঃখের কথা বললুম ; কিছু মনে করবেন না।

রঞ্জন বাধা দিয়ে বললে, না না, এতে মনে করবার কি আছে ? আপনার দুঃখ আমার নিজের পারিবারিক দুঃখ বলেই মনে হচ্ছে। না বিকাশবাবু, আপনি এভাবে আপনার সন্তানদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দেবেন না—স্ত্রীর অন্যায় আব্দারে কাণ না দিয়ে আপনি ওদের নীতিশিক্ষা ও চরিত্র গঠনের দিকে দৃষ্টি দিন। আমিও মাঝে মাঝে আসবো. এসে ছোটগুলিকে নিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে বসবো। ওদের মানুষ হতে দিন বিকাশবাবু।

বিকাশবাবু মনিবের কাছে এতটা আশা করেন নি। তাই তিনি রঞ্জনের প্রস্তাবে আনন্দে গদ্‌গদ্ হয়ে বললেন, আপনাকে কি আর বলব স্যার, সে আপনার দয়া! কিন্তু গরীবের কুঁড়েঘরে বলতে আপনার অনেক কষ্ট হবে.

রঞ্জন কঠোর স্বরে বললে, হোক কষ্ট; আমার এক-জনের কষ্টের বিনিময়ে যদি আরও পাঁচজন সুস্থ সবল হয়ে বাঁচবার সুযোগ পায় তাহলে সে কষ্টও পরম লাভ।

বিকাশবাবু কি আর বলবেন। হাত কচলাতে কচ-লাতে কর্ম্মান্তরে গমন করলেন।

সেই থেকে রঞ্জন সময় পেলেই বিকাশবাবুর গৃহে এসে তাঁর ছেলেমেয়েগুলিকে নিয়ে বসে নানারূপ নীতিশিক্ষা গল্পচ্ছলে দিয়ে থাকে। বিকাশবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করে নেবেছে—তিনি নিতান্তই সাদাসিধা রমণী; নিজের সাধ্য বুদ্ধিতে যা ভাল বোঝেন সেইটাই জোর করে সংসারে চালিয়ে যেন। রঞ্জনকে আত্মীয়ের মত পেয়ে তিনিও খুব খুসী হয়েছেন। এদের অভাব নিরসনের জন্য রঞ্জন যখনই আসে, প্রচুর খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে নিয়ে আসে। এতে সকলেই তার উপর খুসী। রঞ্জনেরও বান্ধবহীন ব্যথাকাতর চিত্ত এদের সংস্পর্শে এসে অনেক সান্ত্বনা পায়। শঙ্করের সঙ্গে সে সাধ্যমত দূরত্ব বজায় রেখে চলে। এতে উভয়েই মনে প্রচণ্ড আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও সে তাকে দূরে রাখে। কেননা সেদিন সন্ধ্যার পর থেকে সে এখন দৃঢ় নিশ্চিত হয়েছে যে, কৃষ্ণা ও শঙ্কর পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে; সে সামনে থাকলে তাদের মিলনে হয়ত বিঘ্ন উপস্থিত হতে পারে, এই আশঙ্কায় সে বন্ধু বর্জ্জন নীতি গ্রহণ করেছে। শঙ্করের অসুস্থতার সংবাদ শোনা সত্ত্বেও সে তাকে একবারও দেখতে যায়নি। অবশ্য প্রত্যহ সে সংবাদ সংগ্রহ করে থাকে এবং ভগবানের কাছে তার নিরাময়ের জন্য কাতর প্রার্থনাও করে থাকে, কিন্তু তার সামনে যায় না।

রঞ্জন শীলুকে ইতিহাস দেখাচ্ছে, এমন সময় চা ও খাবার নিয়ে শীলুর মা ঘরে এসে বললেন, চা-টা আগে খেয়ে নিন। ওদের জন্য আপনার জীবনপাত হল, এখন মানুষ হলে আপনার শ্রম সার্থক হয়।

রঞ্জন দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'কেন মানুষ হবে না, নিশ্চয় হবে! আপনি আশীর্ব্বাদ করুন—ওরা যেন প্রকৃত পরিশ্রমী হয়। তবেই ভবিষ্যতে নিজে সুখী হয়ে অন্যকে সুখী করতে পারবে।

'আহা! তাই হোক, তাই হোক—আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক'—বলতে বলতে গৃহিণী কক্ষ ত্যাগ করলেন, রঞ্জন চায়ের পেয়ালা হাতে তুলে নিল।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছে না। ছেলেমেয়েগুলো বই পাতা গুছিয়ে নিয়ে ওঠবার জন্যে উসখুস করছে দেখে রঞ্জন বললে, এবার যাও, তোমাদের ছুটী। রাতে কিন্তু সমস্ত পড়া তৈরী করে রাখবে।

'রাখবো মাষ্টার মশাই, ঠিক রাখব'—বলে হুড়দাড় করে ছেলেরা ছুটে পালাল।

এক সময় চুলের মধ্যে কোমল করস্পর্শ অনুভব করে রঞ্জন চমকে চোখ চেয়ে দেখল—তার শিয়রে মৃদু প্রদীপ-শিখার মত বসে আছে শীলু। রঞ্জন বললে, সকলে চলে গেল, তুমি গেলে না শীলু?

শীলু বললে, না মাষ্টার মশাই, আপনি চোখে হাত দিয়ে শুয়ে আছেন দেখে ভাবলুম আপনার মাথা ধরেছে; তাই চুলের মধ্যে একটু হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

রঞ্জন বললে, তা ভাল করেছ। মাথা আমার একটু ধরেছে ঠিক; কিন্তু শীলু?—

'কি মাষ্টার মশাই?'—শীলু সামনের দিকে সরে এসে বসল রঞ্জন তার দিকে চেয়ে দেখল, বন্যফুলের মত সরল সুষমাময়ী একটি কিশোরী মেয়ে তার কাছে বসে আছে। মনের স্বাভাবিক সারল্য ও দেহের অনাবৃতরক্ষিত সৌন্দর্য্যে তার জীবনের কিশোর অধ্যায় ঝলমল টলমল করছে। তার পানে চেয়ে রঞ্জন মুগ্ধ হোল, কিন্তু তৃপ্ত হোল না। এর সুচারু শোভায় দীপ্তি কৈ? তখনি তার মনে মনে কে যেন বলে উঠল—আছে আছে, দীপ্তি আছে—মেঘের তলায় যেমন বিদ্যুৎ ঢাকা থাকে; তেমনি তার সারল্যের নীচে ঢাকা আছে স্ফুলিঙ্গ, উপযুক্ত বায়ুর প্রভাবেই সে স্ফুলিঙ্গ বিকশিত হয়ে উঠবে। রঞ্জনের ব্যর্থ প্রণয়ক্লিষ্ট আর্ত্ত হৃদয় সংগোপনে হাহাকার করে বেড়ায়; একটু স্নেহস্পর্শের জন্য, একটু প্রশান্ত নিবৃত্তির সুযোগের জন্য সর্ব্বত্র সে নিজের এই পরম আশ্রয় খুঁজে বেড়ায়। প্রেমের

সমাধির উপর ফুল রোপণ করে সে তাতে পুষ্প প্রস্ফুটন করতে চায়। চোখ থেকে হাত তুলে নিয়ে উঠে বসে সে আবার ডাকলে—'শীলু!'

শীলু নিকটেই বসে ছিল। সে ভাবল, মাষ্টার মশাই বোধ হয় তার প্রথমবারের কথা শুনতে পান নি, তাই এবার সে একটু উচ্চস্বরে বললে—'এই যে মাষ্টার মশাই, আমি এখানেই আছি।'

রঞ্জনের পাশের খোলা জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল, শীলুদের ফটকের পুকুর পাড়েটির উপর সন্ধ্যার ছায়া মেদুর হয়ে এসেছে। কাঁটা মনসা ঝাড়ের নীচে কতগুলি সর্বজয়া ফুলের গাছে ফুটে উঠেছে লাল, হলুদ, গোলাপী রংএর ফুল। অন্য বর্ণহীন বলে ফুলে ও গাছে কোনও শ্রী, সুষমা নেই। সেইদিকে আঙুল দেখিয়ে, রঞ্জন বললে, দেখেছ শীলু কেমন ফুল ফুটেছে? শীলু জানালার দিকে সরে এসে বললে, হ্যাঁ মাষ্টার মশাই, ফুলগুলো সুন্দর, কিন্তু পোকায় কিছুতে ভালো করে ফুটতে দেয় না। ভেতরে ভেতরে খেয়ে ফেলে।

রঞ্জন বললে, কাল থেকে তুমি ওই গাছগুলির গোড়া পরিষ্কার করে একটু গোবর মাটী ছড়িয়ে দিয়ে নিয়মিত জল দিও; দেখবে কয়েকদিনের মধ্যে পোকা মরে যাবে, আর কেমন সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটবে,—সে ফুল তুলে তুমি ঘর সাজাতে পারবে।

শীলুর চোখদুটি কৌতূহলে বড় হয়ে উঠল। সে বললে, সত্যি মাষ্টার মশাই, তাহলে ত আমি গাছগুলোর রোজই যত্ন কোরবো—

রঞ্জন বললে, হ্যাঁ কোরো, শুধু গাছের না, নিজেরও একটু যত্ন কোরো; দেখবে, তোমার সমস্ত জীবন ওই রকম ফুলের মত সুন্দর হয়ে ফুটে উঠবে।

ঘরের মধ্যে তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে; কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না, তথাপি, উভয়ে উভয়ের মুখের প্রতি চেয়ে রইল পরম নির্ভরতায়, পরম প্রশান্তি ভরে।

শঙ্করের শরীর এখন আগের থেকে অনেক সুস্থ হয়েছে; তবে দুর্বলতা এখনও কাটেনি। তাই ডাক্তারের কথা মত সে এখনও গৃহে বিশ্রাম করছে। যদিও রঞ্জন আসেনা, কিন্তু বিকাশবাবু প্রত্যহ সকালে এসে শঙ্করকে হ্যাক্টরীর যাবতীয় সংবাদ দিয়ে যান। নিজের প্রিয় প্রতিষ্ঠানে যাবার জন্য শঙ্কর ছটফট করে; কিন্তু জননী তাকে যেতে দেন না। রক্তাকরচের মত তাকে নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঘরের মধ্যে আগলে রেখেছেন। তখন সবে মাত্র ভোর হয়েছে। সূর্যোদয় তখনও হয়নি। উষার রক্তিমাভায় পূর্বাকাশ রাঙ্গা রঙীন। গাছে গাছে পাখীরা কলকাকলি করছে; শঙ্করের বাগানে জবা, গাঁদা, আর চন্দ্র মল্লিকা ধীরে ধীরে দল মেলে ফুটে উঠছে, আর আলোর স্পর্শে স্নিগ্ধমান হয়ে, অজস্র ধারে গাছের তলায় ঝরে পড়ছে রাশি রাশি শিউলী আর হেনা, আর কৃষ্ণকলি। নূতন দিনের সম্ভাবনায় সমস্ত বিশ্ব সজাগ। শঙ্করের বারান্দার রেলিং ধরে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়েছিল কৃষ্ণা। প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্যের মধ্যে তার মন হারিয়ে গিয়েছিল। শঙ্কর প্রত্যহ ভোরে শয্যাত্যাগ করে বারান্দায় এসে বসে। সেদিনও সে বারান্দায় এসে পিছন থেকে কৃষ্ণাকে দেখে প্রথমে বিস্মিত হলেও, পরে অত্যন্ত পুলকিত হয়ে উঠল। সন্তর্পণে গিয়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে মৃদুকণ্ঠে আবৃত্তি করলে—"প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ দেখিনু

দিন যাবে আজ ভালো—

সবী দিন যাবে আজ ভালো।'

কৃষ্ণা চকিত হয়ে মুখ ফেরাতেই পাশে শঙ্করকে দেখে, লজ্জিত মুখে একটু চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে, নত হয়ে শঙ্করকে প্রণাম করল। শঙ্কর ব্যস্ত হয়ে তার হাত ধরে ফেলতেই, সে মৃদু কণ্ঠে বললে, আজ আমার জন্মদিন শঙ্কর, তাই পিসিমাকে প্রণাম করেই এখানে চলে এলুম, তোমার কাছে আশীর্বাদ নিতে—

শঙ্কর ফুল্লকণ্ঠে বললে, আজ তোমার জন্মদিন? তোমায় ত মনে মনে সব সময় আশীর্বাদ করছি কৃষ্ণা; কিন্তু আজ তোমায় কি দিই বলতো? এস আমার পাশে এসে বোস। দেখ আমার বাগানে কৃষ্ণকলির ঝাড়ে কত কুঁড়ি থরে থরে ফুটে উঠেছে, আশীর্বাদ করি, ওদের মত তোমার জীবনও সুন্দর হয়ে মধুর হয়ে ফুটে উঠুক। রাত্রি শেষের এই নতুন ভোর বেলাটির মত তুমি নতুন আলোক তীর্থের সন্ধান লাভ কর। তুমি সুখী হও কৃষ্ণা; আমার আশীর্বাদ।

সাদা গরদের শাড়ীর আগুনের মত রাঙা আঁচলটী গায়ে জড়িয়ে কৃষ্ণা সঙ্কুচিত হয়ে শঙ্করের পাশে সোফার একাংশে গিয়ে বসল। স্নান সিক্ত চুলগুলি তার লতার মত এঁকে বেঁকে বুকে পিঠে ছড়িয়ে পড়েছিল; মুগ্ধ চোখে সেইদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে শঙ্কর বললে, আজ এমন শুভদিনে একটা গান শোনাবে কৃষ্ণা?

না শঙ্কর গান নয়, কৃষ্ণা বললে, কবিতা।

বেশ কবিতাই শোনাও তবে—শঙ্কর বললে।

কি শুনবে? কৃষ্ণা বললে, চণ্ডিদাস, জয়দেব, না রবীন্দ্রনাথ?

শঙ্কর বললে, যা তোমার খুশী।

কৃষ্ণা বললে "তবে এস, আজ আমরা রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করি।

একটি শ্বেত পুষ্পেভরা রাইটোপা গাছের পানে চেয়ে কৃষ্ণা অনর্গল কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি করে যাচ্ছে, আর তার পাশে নিশ্চল হয়ে বসে শুনছে সেই কাব্যসুধা শঙ্কর। সুরে ভাবে, ছন্দে, রসে, সকালটি হয়ে উঠেছিল মনোরম। এমন সময় মদন প্রাতঃরাশ নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হোল। তার পিছন পিছন পূজার নির্মাল্য নিয়ে এলেন শঙ্করের জননী। প্রত্যহের মত শঙ্করের মাথায় নির্মাল্য স্পর্শ করিয়ে কৃষ্ণাকে দিলেন। কৃষ্ণা তাঁকে প্রণাম করে বললে, মাসীমা আজ আমার শুভদিন, তাই আপনাদের প্রণাম করতে এলুম।

তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বৃদ্ধা বললে, আহা বেঁচে থাকো মা, চির আয়ুষ্মতী হও।

কৃষ্ণা মৃদুকণ্ঠে বললে, মাসীমা, আজ আমি নিজে হাতে রান্না করে এখানে সকলকে খাওয়াবো। পিসিমাও একটু পরে আসবেন, আপনাকেও যেতে হবে।

বৃদ্ধা সজল কণ্ঠে বললেন, বেশ ত মা, সে তো খুব ভালো কথা, আমি ত এই চাই। এখন তোমরা দুজনে বসে চা খাও; আমি জলটা দেরে আসি। তারপর দুজনে মিলে ছেলেকে খাবো, কি বল? কৃষ্ণা খুশী হয়ে বললে, হ্যাঁ মাসীমা, তাই ভালো।

চা খাওয়া শেষ হলে কৃষ্ণাকে উঠতে দেখে, শঙ্কর বললে, যেওনা, কৃষ্ণা বোস, আগে ঘর থেকে আমার সিগারেটের কেসটা নিয়ে এস। সিগ্রেট এনে শঙ্করের হাতে দিয়ে, কৃষ্ণা তার পাশে চেয়ে চুপ করে বসে রইল। একটি সিগ্রেট ধরিয়ে ঠোঁটে চেপে শঙ্কর বললে, রঞ্জনের খবর তুমি কিছু জানো কৃষ্ণা? আবার সেই রঞ্জনের কথা? কৃষ্ণার বুকের মধ্যে ধক ধক করে কেঁপে উঠল, প্রচণ্ড পিপাসায় তার ঠোঁট দুটো শুকিয়ে উঠল। মাটীর দিকে চেয়ে সে বললে, "না শঙ্কর জানি না।" শঙ্কর তার চোখের দিকে স্থির ভাবে চেয়ে থেকে বললে "কিছুই জানোনা"?

সেই দৃষ্টিতে বিব্রত হয়ে কৃষ্ণা বললে, "কি জিজ্ঞেস করছো তুমি তাই বলনা"? শঙ্কর বললে, "রঞ্জনকে তুমি প্রত্যাখান করেছো কেন? তুমি কি জানোনা, ও তোমায় কি গভীরভাবে ভালোবাসে?"

কৃষ্ণা করুণ কণ্ঠে বললে, "জানি শঙ্কর।" শঙ্কর বললে, "তবে"? কৃষ্ণা বললে, "আমায় মাপ কর শঙ্কর, আমি বিয়ে করতে পারবো না।"

বিয়ে করতে পারবে না? শঙ্কর বিস্মিত হয়ে বললে, সেকি কথা, কাউকেই বিয়ে করবে না? সে প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে কৃষ্ণা নতমুখে বসে রইল। শঙ্কর অধৈর্য্য হয়ে বললে, চুপ করে থেকোনা, কৃষ্ণা, আমার কথার জবাব দাও।

কৃষ্ণা পূর্ববৎ নতমুখে বসে রইল। শঙ্কর ঝুঁকে পড়ে তার কাঁধে নাড়া দিয়ে বললে, কথা কও কৃষ্ণা; বিয়ে তুমি করবে না; রঞ্জনকেও না, অন্যকেও না?

কৃষ্ণা মুখ তুলে শঙ্করের পানে চেয়ে বললে, "না"—শঙ্কর বললে "কেন? তুমি অন্য কাউকে ভালোবাসো? কৃষ্ণা ঘাড় নেড়ে বললে, "হ্যাঁ"—শঙ্কর গম্ভীর হয়ে বললে, "কে সে"?—হঠাৎ কৃষ্ণা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে দুই হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে বললে, "সে আমি বলতে পারবোনা শঙ্কর, তুমি আমায় আর দুঃখ দিও না।"

এই উত্তরে শঙ্করের দেহ থেকে সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষে অন্তর্হিত হয়ে গেল। সে বুঝতে পারল রঞ্জনের সন্দেহ তাহলে অলীক নয়, খাঁটী সত্য। কিন্তু এখন উপায়? কৃষ্ণার পাশে অসহায় দৃষ্টি মেলে সে দেখল, দুই হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে সে আকুল হয়ে কাঁদছে। চোখের জলে, সাদা শাড়ীর একাংশ ভিজে কালো হয়ে উঠেছে।

শঙ্করের মন বিচলিত হয়ে উঠল। আহা, এই শুভদিনে তাকে এমন ভাবে দুঃখ দেওয়া শঙ্করের কখনও উচিত হয়নি। অনুতপ্ত হয়ে শঙ্কর তার পাশে সরে গিয়ে বসে, পিঠে হাত দিয়ে ডাকলে, "কৃষ্ণা কেঁদোনা, লক্ষ্মীটি কেঁদোনা, আমি তোমাকে আর কখনও কিছু বলব না—জোর করে সে কৃষ্ণার মুখ থেকে হাত সরিয়ে দিল। কৃষ্ণা তখন নিরুপায় হয়ে অসহায়ের মত নিজের অশ্রুপ্লাবিত মুখখানি, শঙ্করের দুই হাঁটুর মধ্যে চেপে ধরে আর্তকণ্ঠে বললে, "শঙ্কর আমায় তুমি ক্ষমা কর, আমার অপরাধের সীমা নেই।"

শঙ্কর তার পিঠে গভীর স্নেহে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে, "না কৃষ্ণা, অপরাধ তোমার নয় অপরাধ আমার। আমার জন্যই তোমার ও রঞ্জনের এই একই অবস্থা। কৃষ্ণা, লক্ষ্মীটি, আমায় তুমি ভুলে যেতে পারবে না?"

কৃষ্ণা মুখ তুলে দৃঢ় স্বরে বললে "না"।

এমন সময় যখন সেখানে এসে শঙ্করের হাতে একটি তারের চিঠি দিল। ক্ষিপ্র হাতে খাম খুলে চিঠি পড়েই, গভীর নিরাশায় শঙ্করের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সেই দেখে, কৃষ্ণা তার হাত থেকে চিঠিখানি নিয়ে পলকের মধ্যে পড়ে ফেলল। তাতে লেখা ছিল, "প্রিয় শঙ্কর, আমি বিকাশবাবুর মেয়েকে বিয়ে করেছি; তুমি সুস্থ হয়ে আমাদের এসে আশীর্বাদ করে যেও"—তোমার প্রিয় বন্ধু—সূর্যের আলোয় তখন বারান্দা ভরে গিয়েছিল। কৃষ্ণা ধীরে ধীরে শঙ্করের পানে দৃষ্টিপাত করতে দেখল সে একাগ্র ভাবে তার দিকেই চেয়ে আছে।

—শেষ—

সঙ্কোচ কেন বা এত অভিসারে হবে?

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

মন-ঘরা আঁখি দুটি অশ্রুভরা কেন অবিরল?
যৌবনের ঢেউ লেগে ভেসে-যাওয়া দিনে!
হর্ষোচ্ছল মুখপানে চেয়ে চেয়ে আমি যে বিহ্বল,
কেমনে হেথায় তুমি এলে পথ চিনে?
নিজেরে হারিয়ে খেলা—প্রণয়ের এই মর্মবাণী,
শুনেছিলে একদিন বাতায়ন দ্বারে:
ভালোবাসা দিও নাকো'—দুঃখ সাথে, করেছিনু বাণী!
নয়নে নামিবে বর্ষা মেঘে অন্ধকারে।

কামনা-বহ্নিরে তুমি জেলেছ যে বহুদিন আগে
কুসুম-কোরক-সম পীনোন্নত বুকে;
অনিন্দ্যসুন্দর দেহে বাসনার তীব্র অনুরাগে
বিলাস লোলুপ চিত্তে এসেছ কি সুখে?
নিরুদ্ধ প্রবৃত্তিগুলি কুণ্ঠাভরা বৈশ-আশা লয়ে,
লজ্জিত বেদনা সাথে এনেছ কি আজ?
ঘুমের সঙ্গীতে যেন স্বপনের স্বরলিপি বয়ে
সোহাগ জানাতে কেন খুলে যায় সাজ?

তোমার কুহকী মায়া রঙের মশালে দেখি হান,
মেঘে আসে উষা-মিশা নীলাকাশ হোতে।
রূপসী সাহসিকা কুতূহলী প্রহরের গান
ভাসাতে চেয়েছ বুঝি জ্যোছনার স্রোতে?
এ রাতে হবেনা ঘুম, ক্লান্ত হয়ে ওঠে তনু তব;
পরশ-পিয়াষা বাধা সহিয়া নীরবে।
চুপে চুপে কথা কওয়া মোর কাছে যেন অভিনব:
সঙ্কোচ কেন বা এত অভিসারে হবে?

যে কথাটি ভাবনায় কহিবার ছিল অবকাশ:
তাহারে হারায়ে ফেলে আমি আত্মহারা।
রূপের তরঙ্গ তুলে প্রণয়ের রচি অধিবাস
তুমি কেন দিতে এলে প্রাণে বসুধারা?
অনিন্দ্য কৌতুক সনে লক্ষ্য বুঝি গাঢ় আলিঙ্গন,
কবরী শিথিল হয়ে লুটায় সুবাসে।
মোর ওষ্ঠাধরে কেন দিয়ে রাঙা-চিহ্ন আলিঙ্গন
বেপথু হয়েছ রাণু! মোর শয্যাপাশে?

মহিলা সমাচার

শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ

১। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতী বাঙ্গালী ছাত্রী :

(ক) **বিশ্ব-ভারতী** বিশ্ববিদ্যালয়ে : স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন সুনীতি মুখোপাধ্যায়। সুরুলমার গ্রামের ১৫ বৎসর বয়স্কা বালিকা।

(খ) **গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয় :** শ্রীমতী চিত্রা দত্ত শিলংএর সেন্ট মেরী কলেজের ছাত্রী ; নবম স্থান অধিকার করিয়াছেন আই-এ পরীক্ষায়।

ঐ কলেজের ছাত্রী ১০ম স্থান অধিকার করেন শ্রীমতী সত্য শর্ম্মা। মিস্ লক্ষ্মী কুমারী ডোরা এম. বি. বি. এস. পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

(গ) **পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় :** ১৩ জন প্রথম শ্রেণীতে পাশ করেন ; তাহার মধ্যে ৫ জন ছাত্রী। মজুলা মল্লিক (মগধ বালিকা কলেজ) ২য়, বুল্ বুল্ দাস (ওমেন্স কলেজ) ৪র্থ, প্রতিমা সিংহ (ঐ কলেজ) ১০ম, শর্ম্মিলা চক্রবর্ত্তী (ঐ) ১২শ, ডি সুজা মার্গরেট (ঐ কলেজ) ১৩শ স্থান অধিকার করেন।

(ঘ) **নাগপুর-রায়পুর :** অঞ্জলি দাস গুপ্ত বি. এ. বি টি উত্তীর্ণ হইয়া কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

(ঙ) **দিল্লী :** উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কলা বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন কুমারী মঞ্জুলা চাটার্জ্জি। তিনি ৫টি বিষয়ে ডিষ্টিংশন লাভ করিয়াছেন।

২। বিমান চালনায় বঙ্গ রমণী :

শ্রীমতী দুর্গা বন্দ্যোপাধ্যায় বেসরকারী এক কোম্পানীর বিমান চালক। তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর লাই-সেন্স পাইয়াছেন। মাসে ৮০।৮৫ ঘণ্টা বিমান চালনায় দক্ষ। তিনি সর্ব্ব প্রথম বঙ্গরমণী বিমান চালক।

৩। বিমান প্যারাস্যুট অবতরণ-এ দক্ষ বঙ্গললনা :

ডাঃ কুমারী গীতা চক্ষ বিমান বিভাগে একজন দক্ষ ডাক্তার এবং ফ্লাইট লেফ্‌টেনেন্ট অফিসার তিনি সম্প্রতি বিমান হইতে প্যারাস্যুট যোগে অবতরণে দক্ষতা ও অনেক লড়াইয়ের কায়দা অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি জুলাই মাসে আগ্রাতে নিখিল ভারতীয় বিমান কসরৎ শিক্ষা শিবিরে শিক্ষা লাভ করিয়া সার্টিফিকেট পাইয়াছেন গত ১০ই জুলাই আগ্রাতে প্যারাস্যুট যোগে অতি উচ্চাকাশ হইতে ভূমিতে অবতরণ করিয়া প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন।

৪ বালিকার অদ্ভুত স্মৃতি-শক্তি :

ইণ্ডিয়া ব্রডকাষ্টিং সোসাইটির উদ্যোগে যে শিশু বিভাগের মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হইয়াছে তাহাতে কুমারী ঈপ্সিতা দত্ত ২৪টি শব্দ না দেখিয়া নির্ভুল বলে।

পুণাতে নিঃ ভাঃ জিমনাষ্টিক খেলায় বঙ্গবালা :

পুণাতে জাতীয় জিমন্যাষ্টিক খেলায় যে শীর্ষ ব্যালান্স কসরৎ দেখান হয় তাহাতে চ্যাম্পিয়ন শিপ লাভ করিয়াছেন বাঙ্গলার এক ১৯ বৎসর বয়স্কা বালিকা অরুণা দাসগুপ্তা ৮ জন বিভিন্ন জাতীয় প্রতিযোগিদের মধ্যে প্রথম হইয়াছেন বিভিন্ন স্থানের ৮৮ জন খেলোয়াড় প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়াছিল।

৬। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আই-এ-তে কৃতী ছাত্রী

বর্ত্তমান বর্ষের আই-এ পরীক্ষায় লোরেটো মেমোরিয়াল কলেজ হইতে কুমারী দেবযানী দাস ৮ম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে। কৃষ্ণা সেনগুপ্তা (বহরমপুর হইতে) ৮ম স্থান অধিকার করিয়াছে।

বিদেশে উচ্চ শিক্ষার্থিনী :

শ্রীমতী অঞ্জলি বাগচী : লণ্ডনে তাহার স্বামী ডাঃ দেবব্রত বাগচীর সহিত উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য গিয়াছেন।

শ্রীমতী আরতি দত্ত : Hague International Institute of Social Service প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করিয়া Nellinland Technical help for Plan-

ning Fellowship Deploma লাভ করিয়াছেন। তিনি নিজ আকারের রাষ্ট্রগুলিতে সমাজ কল্যাণ নীতির উপরও ডিপ্লোমা পাইয়াছেন। তাহার এই কৃতিত্বের জন্য আমরা গৌরব বোধ ও প্রীতি লাভ করিতেছি। শ্রীভগবান তাঁহাকে সুদীর্ঘ গৌরবময় জীবন দিন।

কুমারী ডাক্তার মীরা পুরকায়স্থ : এম, এস সি, ডি. ফিল (কলিকাতা) তিনি Texas Boier University U. S. A তে স্কলারশিপ লইয়া M.A-Ecclobiology অধ্যয়ন করিতেছেন তিনি কলিকাতার কৃতি ছাত্রী Indian Institute of Biochemistry and Experimental Medicineএর জন্য গবেষক।

৮ অশীতি বর্ষীয়া নারীর জ্ঞান স্পৃহা :

শ্রীযুতী পুণ্যবতী দেবীর বয়স বর্ত্তমানে ৮০, প্রপৌত্রের পিতামহী। ৭৭ বৎসর বয়সে কৃত্তিবাসের রামায়ণ নিজে পাঠ ও রসাস্বাদন করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা হয় নিরক্ষরা রমণী এক অন্তর্নিহিত প্রেরণায় আক্ষরিক জ্ঞান লাভে সচেষ্ট হইলেন। ৩ বৎসরের মধ্যেই তিনি রামায়ণ ভাল ভাবেই পাঠ করিতেছেন।

৯। তামিল মহিলার কীর্ত্তনে কৃতিত্ব :

নিখিল ভারত বঙ্গ ভাষা প্রসার সমিতি কুমারী জি যোগাম্বল (২১ বৎসর বয়স্কা সুললিত, মধুর ও সুস্পষ্ট কণ্ঠে পদাবলী কীর্ত্তন শুনিয়া বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির সম্মাবর্ত্তন উৎসবে ২রা মে) শ্রীরাম কুমার তাওলকার স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছেন। ১১ই জুলাই এই সমিতি বঙ্কিম উৎসবে বঙ্কিমের মধুরা বাসিনী মধুর ভাষিণী শ্যামবিলাসিনী কীর্ত্তন করিয়া জ্যোতির্ময়ী স্বর্ণপদক লাভ করেন।

বৈঠকের সভাপতি যুগান্তর সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রধান অতিথি জ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বিচারপতি পাঁচকড়ি সরকার প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তির প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন

বৃষ্টিতে

শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক

এসো এসো, চলে এসো,—বৃষ্টির আবার
হাওয়া এলো, হাওয়া এলো, ভিজে ভিজে আর
কতনা শীতল স্পর্শ রেখে শুধু যায়,
এখানে এসো না তুমি আমার খেলায়।

বৃষ্টি যে, বৃষ্টির ছাটে ভিজে যাক প্রাণ
আমরা দু জনা এসো ধরি মিষ্টি গান ;
মনের পর্দায় এসো ধরে রাখি যত
মেঘের করানো কৌটা কান্নারই মত।

আমার কল্পনা আসে তোমার শরীরে
সমুদ্রের ঢেউ নিয়ে যে শরীরে ভিড় ;
আমি লক্ষ্য করি শুধু আমার চোখেই
কতনা সমুদ্র মেশা বৃষ্টিতে ভিজেই
খুঁজে নিতে চায় আজ মাঠের ওধারে
সমুজ সজীবতায় জীবন আধারে।

সরোজ নলিনী নারীমঙ্গল সমিতি

কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন বিভাগীয় সাহায্য

কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীযেহের চাঁদ খান্না বিশেষ আমন্ত্রণ ক্রমে গত ২০শে মে, ১৯৫৯ সরোজ নলিনী সমিতি পরিদর্শন করিতে আসেন। সরোজ নলিনী শিল্প বিদ্যালয় এবং সরোজ নলিনী সমিতির অন্তর্ভুক্ত মহিলা সমিতি সমূহে যে সকল শিক্ষার্থী শিল্প শিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহাদের ভিতরে শতকরা প্রায় ৭৫ জন পূর্ববঙ্গের অসহায়া উদ্বাস্তু। উপযুক্তরূপ সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি অভাবে শিল্প শিক্ষা প্রদানে অসুবিধার বিষয় পুনর্বাসন মন্ত্রী মহাশয়কে জ্ঞাপন করা হয় এবং যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য তাঁহার নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করা হয়।

মাননীয় মন্ত্রী শ্রী খান্না উক্ত প্রার্থনা ক্রমে যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য ১৫০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহাতে শত শত উদ্বাস্তু উদ্যোগী শিক্ষার্থীর অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। মাননীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী মহাশয়ের এই সহৃদয়তার জন্য আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

মহিলা সমিতির কথা

চাকদহ নারীমঙ্গল সমিতির বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী

১৯৫৮—৫৯

সমিতির প্রতিষ্ঠা ও পরবর্ত্তী সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১৯৫৪ সালের ১লা জুন এই অঞ্চলের একমাত্র মহিলা সংগঠনী এই সমিতি স্থাপিত হয়। স্থানীয় মহিলা ও বালিকাদের বৃত্তিমূলক শিক্ষাদান নারীদের শিক্ষা স্বাস্থ্য ও অর্থ-নৈতিক সমস্যার সমাধান ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি প্রভৃতিই ছিল এই সমিতির লক্ষ্য। ঐ বৎসরের ১৬ই জুলাই কলিকাতা সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৯৫৮ সালে এই সমিতি নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের শাখার অনুমোদন লাভ করিয়াছে ও ১৮৬০ সালের ২১নং ধারাবলে সোসাইটি রেজিষ্ট্রেশন আইনে রেজিষ্ট্রীকৃত হইয়াছে।

সমিতির বিভিন্নমুখী কার্য্যসূচী :—

(ক) শিল্প শিক্ষণালয় :—সরোজনলিনী সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্স অনুযায়ী এই কেন্দ্রে বস্ত্রশিল্প, চর্ম্মশিল্প, উল, বুনন, দর্জ্জির কাজ, অঙ্কণ ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। বহু মহিলা ও বালিকা এই কেন্দ্রে শিক্ষালাভ করিতেছেন এবং অনেকে শিক্ষা-সমাপনান্তে কিছু উপার্জ্জনক্ষম হইয়াছেন। আলোচ্যবর্ষে এই বিভাগের ছাত্রী সংখ্যা পরীক্ষা ও পাসের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল।

ছাত্রী সংখ্যা	সার্টিফিকেট	২১	ডিপ্লোমা
পরীক্ষার্থিনীর সংখ্যা	,,	৬	,,
পাসের সংখ্যা	,,	৪	,,

(খ) বয়স্কা শিক্ষা ও সমাজ শিক্ষণালয়

মধ্যবিত্ত ও স্বল্পবিত্ত পরিবারের নারীদের নিরক্ষরতা দূরীকরণার্থে ও সমাজ সেবা ক্ষেত্রে তাহাদের উপযুক্ত শিক্ষাদানের জন্য ১৯৫৫ সাল হইতে একটি বয়স্কা শিক্ষা কেন্দ্র চালু আছে। এই কেন্দ্রের কার্য্যক্রম দ্বারা নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে প্রাথমিক অভিযান সফল হইয়াছে। শিক্ষিকাদের বেতন পুস্তক ও অন্যান্য সরঞ্জাম ইত্যাদি ব্যয় বাবদ অধিকাংশ আর্থিক সাহায্য আমরা সরোজনলিনী হইতে পাইয়াছি।

ছাত্রী সংখ্যা	অক্ষর পরিচয়	সমাজসেবা শিক্ষায়	মোট
	১৪ জন	১৫ জন	২৯
পরীক্ষা দিয়াছে—	১৫	১২	
পাস করিয়াছে—	১২	৮	

(গ) অক্ষর চর্চ্চা শিক্ষণ শ্রেণী :—

স্থানীয় এম, এল, এ ডাঃ সুরেন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে দুঃস্থ মহিলাদের অর্থ-নৈতিক বিষয়ে কিছুটা স্বাবলম্বী করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৫৮ সাল হইতে অক্ষর চর্চ্চা শিক্ষণালয় স্থাপিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত ৬০ জন মহিলা অক্ষর চর্চ্চা পরিচালনায় কৃতিত্ব দেখাইয়া নিজস্ব চর্চ্চা লাভ করিয়াছেন। সাংসারিক কার্য্য সমাপনান্তে অবসর সময়ে মাসিক ৩০৲ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারায় মহিলাদের প্রভূত উপকার হইতেছে ইহা নিঃসন্দেহ। বর্ত্তমানে ১৫ জন ছাত্রী শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে।

(ঘ) শিশু বিভাগ

আলোচ্য বর্ষে আমাদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অন্যতমা সদস্যা শ্রীমতী মায়ারাণী তলাপাত্রের উদ্যোগে ও আর্থিক সাহায্যে শিশুদিগের একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে এবং সব পেরেছির আসরের অনুমোদন লাভ করিয়াছে।

(ঙ) গ্লাস্ ব্লোয়িং শিক্ষণালয় :—

১৯৫৮ সাল হইতে দুঃস্থ অবলম্বনহীন মহিলাদের জন্য গ্লাস্ এম্পুল প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষণ ব্যবস্থার উপযুক্ত শিক্ষকের নির্দ্দেশনায় এই শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান বৎসরের ১৪ জন শিক্ষায়িনী শিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন।

সমিতির নিজস্ব গৃহ :—

বিভিন্ন শিল্প শিক্ষাকেন্দ্র সহ সমিতির নিজস্ব গৃহ নির্মাণের প্রয়োজন আজ সর্বাপেক্ষা বেশী। নিজস্ব গৃহ না থাকায় বিভিন্ন শিক্ষা বিভাগ গুলিকে একত্রিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিবার খুবই অসুবিধা আছে। গৃহ নির্মাণকল্পে সমিতির নিজস্ব জমি সংগ্রহ আছে। লোক্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ডের নিকট ও সরকারী পুনর্বাসন বিভাগের গৃহ নির্মাণকল্পে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া ২০,০০০৲ টাকা অনুমিত ব্যয়ের এক পরিকল্পনা পেশ করা হইয়াছে। বিষয়টি কিছুকাল যাবত তাহাদের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। সর্ত্তানুযায়ী মোট ব্যয়ের অর্দ্ধাংশ সমিতির বহন করিবার কথা। সমিতি মোট ব্যয়ের ½ অংশ বহন করিতে প্রস্তুত আছেন এবং অবশিষ্ট ½ অংশ উপরিলিখিত সেই বিভাগকে দান করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

সাহায্য লাভ :—

আলোচ্য বৎসরে সমিতি যে সব উল্লেখযোগ্য সাহায্য লাভ করিয়াছেন তাহার বিবরণ (১) ছুইটি সেলাই কল ক্রয়ের জন্য মাননীয় মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন মহাশয়ের এককালীন সাহায্য ৪৫০৲ টাকা। (২) মাননীয়া শ্রীঅমিতা চৌধুরীর চেষ্টায় ও চাকদহ লক্ষ্মী সিনেমার সত্ত্বাধিকারী শ্রীনিবেশ চন্দ্র রায় মহাশয়ের আনুকূল্যে একটি চিত্র প্রদর্শনী হইতে প্রাপ্ত অর্থ ৫০২৸০। (৩) ভারতীয় রেডক্রস সোসাইটি ৬৫২৲ টাকা মূল্যের পোষাকাদি প্রভৃতির অর্ডার আমাদের এই সমিতির কাছে দিয়াছেন। ইহার লভ্যাংশ হইতে কর্ম্মীদের পারিশ্রমিক দান করা হইয়াছে।

ইহাছাড়া সরোজনলিনীর নিয়মিত দান, স্থানীয় বন্ধুবর্গ ও সজ্জন ব্যক্তিগণের দান আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেছি।

স্থানীয় B. D. O মহাশয়ের আনুকূল্যে দুঃস্থদের মধ্যে ঘি দুধ রুটী ইত্যাদি বিতরণের জন্য মধ্যে মধ্যেই পাইয়া থাকি এবং উহা যথাযোগ্য বিতরিত হইয়াছে।

মাননীয় মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রদত্ত শিশু ও দুঃস্থ নারীদের সাহায্যের জন্যে কম্বল শাড়ী ছোট ছোট জামা কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিয়াছি এবং উহাও যথাযোগ্য স্থানে বিতরিত হইয়াছে।

নীলিমা ঘোষ
সম্পাদিকা
চাকদহ মহিলা সমিতি

নৈহাটী রেলওয়ে মহিলা সমিতি
১৯৫৮ সালের রিপোর্ট

ইং ১৯৪৯ সালে নৈহাটী রেলওয়ে মহিলা সমিতি স্থাপিত হয়। রেলওয়ে কর্ম্মচারী পরিবারের মেয়েদের সম্মুখে সমিতির মাধ্যমে এক উন্নত ধরণের পথের নির্দ্দেশ দেওয়াই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। এর পিছনে সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল সমিতির প্রচেষ্টা যথেষ্ট রহিয়াছে। আমাদের সমিতি ক্রমশঃই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। আজ আমরা ১৯৫৮ নবম বর্ষ অতিক্রম করিয়া ১৯৫৯ সালে দশম বর্ষে পরিণাম। আলোচ্য বর্ষে সমিতির ছাত্রীসংখ্যা জুনিয়র ও সিনিয়র ক্লাসে যথাক্রমে ২১ ও ১০ জন ছিল। ফাইনাল পরীক্ষা দিয়াছে জুনিয়র ১২ জন ও সিনিয়র ১০ জন এবং পাশ করিয়াছে জুনিয়র ৬ জন ও সিনিয়র ৮ জন।

সমিতির সভ্যা সংখ্যা ৫০ জন। সমিতির সভ্যাদের জন্য বিনা বেতনে প্রত্যহ ছ ঘণ্টা করে শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এ বছরে ১৪ জন সভ্যা উক্ত শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে এবং প্রত্যেকেই পারিবারিক অর্থনৈতিক সাহায্যের সহায়ক হইয়াছে।

রেল ও সমবায় সপ্তাহ অনুষ্ঠানে স্থানীয় রেল ইনষ্টিটিউট হলে শিল্প-প্রদর্শনী খোলা হয়। উহা উদ্বোধন করেন শিয়ালদহ বিভাগীয় (রেলওয়ে) অধিকর্ত্তার স্ত্রী শ্রীযুক্তা মনোরমা কলিঙ্গা। রেলকর্তৃ পক্ষ রেল সপ্তাহ উপলক্ষে দিল্লী ও কলিকাতায় প্রতিযোগিতামূলক শিল্প প্রদর্শনী খোলেন। দিল্লীর প্রদর্শনী ছিল সর্ব্বভারতীয় রেলওয়ে ভিত্তিতে এবং কলিকাতায় ছিল পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব রেলওয়ের ভিত্তিতে। ইহাতে নৈহাটী সমিতির সভ্যা দিল্লী ও কলিকাতা হইতে যথাক্রমে ১টা ও ২টা পুরস্কার পাইয়াছে। সরোজ নলিনী সমিতি কর্তৃক পরিচালিত বাৎসরিক (১৯৫৮) জুনিয়র পরীক্ষায় আমাদের ছাত্রী শ্রীমতী ইলা দত্ত প্রথম ও শ্রীমতী নীলিমা ঘোষ গুপ্তা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে এবং সিনিয়র পরীক্ষায় শ্রীমতী বেলা ঘোষ প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে এবং উহারা কেন্দ্রীয় সমিতি কর্তৃক বিশেষ পুরস্কার পাইয়াছে।

বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিভাগীয় অধিকর্ত্তা মাননীয় শ্রীযুক্ত সুবাইয়া ও তাঁহার স্ত্রী মাননীয়া শ্রীযুক্তা সুবাইয়া যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রজাতন্ত্র দিবস, নেতাজী সুভাষ, রবীন্দ্র-জয়ন্তী, বিজয়াসম্মেলন, নববর্ষ, স্বাধীনতা দিবস ও শিক্ষা দিবস সমিতির মাধ্যমে পালন করা হয়।

রেবা গুপ্তা
সম্পাদিকা

৪র্থ সংখ্যা] শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬৬ [৩৪শ বর্ষ

শ্রীশ্রীদুর্গা

—স্বামী সচ্চিদানন্দ

স্থূল-সূক্ষ্ম চরাচর বিশ্বের যিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তিনিই মহামায়া শ্রীশ্রীদুর্গা। অপর কথায় তিনি আদ্যাশক্তি। এই আদ্যাশক্তি উমা, কাত্যায়নী, গৌরী, কালী, হৈমবতী, শিবা, ভবানী, রুদ্রাণী, শর্ব্বাণী, সর্ব্বমঙ্গলা, অপর্ণা, পার্ব্বতী প্রভৃতি সহস্র নামে ভক্তের নিকট পূজা পাইয়া থাকেন।

স্মরণমাত্রে ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে শত্রুসঙ্কট হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া দেবীর এক নাম দুর্গা। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে দেখা যায়—দুর্গ নামক দৈত্য মহাবিঘ্ন, সংসার বন্ধন, কর্ম্ম, শোক, দুঃখ, নরক, যমদণ্ড, ভয়, মহাভয়, অতিভয় এবং ভক্তাকেও যিনি হনন করিয়া থাকেন তিনি দুর্গা বলিয়া পূজিতা। দেবী সকলের হৃদয়ে থাকিয়া শুভ ও অভিলষিত ফলদান করেন বলিয়া তিনি সর্ব্বমঙ্গলা। দেবীর আর এক নাম মঙ্গল্যা। তিনি তাঁর ভক্তকে শ্রেষ্ঠ ফলদান করেন আর তাহাদের দুঃখ দূর করেন বলিয়া তাঁহার এই নাম। শিব শব্দের অর্থ মুক্তি। দেবী যোগিগণের মোক্ষ-দান করেন বলিয়া তাঁহার আর এক নাম শিবা। চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু—এই তিনকে দেবীর ত্রি-নেত্র কল্পনা করিয়া মুনিগণ তাঁহাকে ত্র্যম্বক বলিয়া থাকেন। যোগানলে তিনি আপনার দেহ দগ্ধ করিয়া হিমালয়ে পূর্ণ সূর্য্যেন্দু সদৃশ রূপ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম গৌরী। ব্রহ্ম ও শিব দেবীকে ধারণ করিয়া আছেন এবং অম্বিকার তাঁহার বদন বলিয়া তিনি কাত্যায়নী নামে পূজিতা। যথা—

"কং ব্রহ্মা বং শিব প্রোক্তমম্বারক মতম্।
ধারণাদুভয়োরাপি কাত্যায়নী মতা বুধৈঃ।"

(দেবী পুরাণ)

এইরূপ বিভিন্ন নামে অভিহিতা শ্রীশ্রীদুর্গাই মহামায়া বা আদ্যাশক্তি। তাঁহার শক্তিতেই সব শক্তিমান। তিনিই ক্ষুধা, নিদ্রা, তৃষ্ণা, তৃপ্তি, তৃষ্ণা, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, শান্তি, লজ্জা প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবরূপে প্রকটিতা। এই দুর্গাই বৈকুণ্ঠে গোলোক ধামে ও মর্ত্ত্যে মহালক্ষ্মী রাধিকা সতী, তিনিই ক্ষীরোদ সমুদ্রে লক্ষ্মী, তিনিই দক্ষকন্যা সতী, আবার মেনকার কন্যা দুর্গা। এই দুর্গাই গায়ত্রীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী সাবিত্রী, অগ্নির দাহিকাশক্তি, সূর্য্যের প্রভা-

শক্তি, জলের শীতলাশক্তি, ধরিত্রীর ধারণা ও সস্ত উৎপাদিকা শক্তি; তিনিই ব্রাহ্মণের ব্রহ্মশক্তি, দেবগণের দেবশক্তি, ওষধিগণের ওষধী, গৃহীর গৃহলক্ষ্মী, মুক্তগণের মুক্তি, আবার সংসারের মায়া বা আসক্তি।

যজুর্বেদের সংহিতায় যজুর্বেদে (৩।৫৭) অম্বিকার উল্লেখ দেখা যায়। যথা—"এষ তে রুদ্রভাগঃ সহ স্বস্রাম্বি-কয়া তং জুষস্ব স্বাহা।" ইহার অর্থ—হে রুদ্র, তোমার ভগিনী অম্বিকার সহিত আমাদের প্রদত্ত এই পুরোডাশ অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ কর। (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১।৬।১০।৫)

মহীধর কৃত ভাষ্য হইতে আমরা অম্বিকার সম্বন্ধে জানিতে পারি—অম্বিকা রুদ্রের ভগিনী। শ্রুতিতে উহা আছে; রুদ্রের সহিত তাঁহার ভগিনী অম্বিকারও যজ্ঞভাগ আছে। রুদ্র নামক ক্রূর দেবতা তাঁহার বিরোধিগণকে হনন করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন এবং তাঁহার ভগিনী অম্বিকা সেই হনন কার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকেন। সেই অম্বিকা শরস্তম্ব গ্রহণ পূর্ব্বক জরাদির সৃষ্টি করিয়া বিদ্বেষি-গণকে বিনাশ করিয়া থাকেন। রুদ্র ও অম্বিকার উদ্দেশ্য হাবর্ধারা প্রদর্শিত হউক।

শ্রুতির উক্ত প্রমাণ হইতে আমরা প্রথমে অম্বিকাকে রুদ্রের ভগিনীরূপে দেখিতে পাই। তৎপরে তলবকার উপনিষদে উমা হৈমবতীর উৎপত্তির কারণ অন্যরূপ দেখা যায়।

দেবাসুর সংগ্রামে ব্রহ্মই দেবতাদিগের জন্য বিজয় করিলেন; সেই ব্রহ্মের বিজয়ে দেবতারা বিজয়গৌরব লাভ করিলেন; কিন্তু তাঁহারা মনে করিলেন—"এই বিজয় আমাদেরই কৃতিত্ব।" (ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে; তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা মহীয়ধ্বম্। ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি।" কেনোপনিষৎ ৩।১)

ব্রহ্ম দেবতাদিগের মিথ্যা অভিমান দূর করিবার জন্য দেবতাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। অজ্ঞাত একজন পুরুষকে সম্মুখে বর্ত্তমান দেখিয়া দেবতারা তাঁহার পরিচয় লাভের জন্য প্রথমে অগ্নিকে পাঠাইলেন। অগ্নি পূজ্যস্বরূপ যক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে যক্ষ প্রত্যুত্তর করিলেন—"তুমি কে?" উত্তরে অগ্নি বলিলেন—"আমি অগ্নি নামে প্রসিদ্ধ, আমি পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু দগ্ধ করিতে পারি।" অগ্নির এবম্বিধ শক্তির কথা শুনিয়া যক্ষরূপী ব্রহ্ম মনে মনে ঈষৎ হাসিয়া অগ্নির শক্তি পরীক্ষার্থে একগাছি তৃণ সম্মুখে স্থাপন করিয়া বলিলেন —"এই তৃণটীকে দগ্ধ কর।"

আশ্চর্য্য! অগ্নি তাঁহার সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়াও ঐ ক্ষুদ্র তৃণটীকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না। লজ্জায় অধোবদনে অগ্নি প্রস্থান করিলেন। এইবারে আসিলেন অন্য দেবতা, বায়ু। যক্ষরূপে প্রকাশমান ব্রহ্ম কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বায়ু নিজের পরিচয় ও শক্তি প্রসঙ্গে বলিলেন—"আমার নাম বায়ু; আমি জগতের যাবতীয় বস্তুকে উড়াইয়া লইয়া যাইতে পারি।" "এবম্বিধ তোমার শক্তি!" —যক্ষ মনে মনে হাসিয়া সেই তৃণটীকে উড়াইয়া লইবার জন্য বলিলেন বায়ু তাঁহার সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়াও তৃণটীকে একচুল পরিমাণ ব্যবধানেও সরাইতে পারিলেন না। লজ্জায় তাঁহার মুখ মলিন হইয়া গেল। তিনি বিষণ্ণ মনে ফিরিয়া গিয়া বলিলেন—"এই পূজনীয় স্বরূপ যে কে, তাহা আমি জানিতে পারিলাম না।" ("স তত এব নিবৃত্তে—নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষ-মিতি।") (কেনোপনিষৎ ৩।৬)

অতঃপর দেবগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ইন্দ্র যেই যক্ষ-সমীপেতু গমনোদ্যত হইলেন, সেই মুহূর্ত্তে যক্ষ অন্তর্হিত হইলেন। ইন্দ্র তখন ধ্যানের দ্বারা অদৃষ্ট যক্ষের বা স্বরূপ জানিবার জন্য ব্যাপৃত হইলেন। তিনি ধ্যানে দর্শন করিলেন শুশোভনা স্ত্রীরূপিণী উমাকে। (স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়-মাজগাম বহু শোভমানাম্ উমাং হৈমবতীম্। কেনোপনিষৎ ৩।১২)

অতঃপর ইন্দ্র সেই হৈমবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিমেতদ্ যক্ষমিতি?"—এই পূজনীয় স্বরূপ কে?

উমা তখন উত্তর করিলেন—"ইনি ব্রহ্ম; ব্রহ্মের এই বিজয়ে তোমরা আপনাদিগকে মহিমান্বিত মনে করিতেছ।" (সা ব্রহ্মেতি হোবাচ, ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি। কেনোপনিষৎ ৩।১)

এই বলিয়া উমা ব্রহ্মে লীন হইলেন। কেনোপনিষদের এই বিবরণ হইতে জানা যায়—উমা হৈমবতীই ব্রহ্মবিদ্যা

ব্রহ্মবিদ্যালাভের শক্তি। তাঁহার সহায়তা বা কৃপা ব্যতীত 'ব্রহ্ম কি' বুঝা যায় না।

উপনিষৎ সমূহের রচনাকাল সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও দেখা যায়—উপনিষৎ সমূহ খৃষ্ট জন্মিবার অন্ততঃ ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। "ম্যাক্ডনালের মতে সর্ব্বপ্রাচীন উপনিষৎ অন্ততঃ ৬০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে রচিত হয়। আর রাধাকৃষ্ণণের মতে খৃষ্টপূর্ব্ব ১০০০ হইতে ৪০০-২০০ অব্দের মধ্যে উপনিষৎ সমূহ বিরচিত হয়।"* সুতরাং বেদোপনিষদের ঋষির দর্শন হইতে বুঝা যায়—জগৎকারণ বিশ্বনিয়ন্ত্রী মহাশক্তিকে নারীরূপে দর্শন অন্ততঃ আড়াই হাজারেরও পূর্ব্বেকার ঘটনা। তখন হইতেই ভারতের আর্য্য সন্তানগণ ব্রহ্মশক্তিকে নারীরূপে দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার ভূগর্ভস্থ প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে—বৈদিক আর্য্য যুগের বহু পূর্ব্বে প্রাক্ আর্য্যসভ্যতা উন্নতির চরম শিখরে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিকদের মতে প্রাক্ আর্য্যজাতি শিব-শক্তির উপাসক ছিলেন। উক্ত দুই স্থানে প্রাপ্ত শিবের প্রতীক শিবলিঙ্গ আর শক্তির প্রতীক সৌরীপট্টই উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

প্রতিমায় দুর্গাপূজা এই মহাশক্তি বা মহামায়ারই পূজা। প্রতিমায় মহামায়ার পূজার সূচনা কবে হইতে?— এই প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক অশোক শাস্ত্রী বলেন—সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতেই বাংলা দেশে প্রতিমায় দুর্গাপূজা হইয়া আসিতেছে।(১) দেবী মাহাত্ম্য বা দুর্গাসপ্তশতী বা চণ্ডীতে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ৫১৮টী শ্লোক আছে। উহার ত্রয়োদশতম অধ্যায়ের দশম ও একাদশতম শ্লোকে আছে—

"স চ বৈশ্যস্তপস্তেপেদেবীসূক্তং পরং জপন্।
তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্ত্তিং মহীময়ীম্ ॥১০
অর্হণাকল্পযুক্তাভ্যাং পুষ্পধূপাগ্নিতর্পণৈঃ।
নিরাহারৌ যতাহারৌ তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ ॥১১

অর্থাৎ সুরথ ও সমাধি উভয়ে সেই নদীতটে দুর্গাদেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পুষ্প, ধূপ, হোম ও নৈবেদ্যাদির দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন।

ডাক্তার ভাণ্ডারকারের মতে চণ্ডী সপ্তম শতাব্দিতে রচিত। তিনি বলেন—ঐ সময় গথ্, মঙ্গলইড্ (Goth Mongloid) অক্ষরে লিপিতে চণ্ডীর প্রসিদ্ধ শ্লোক সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে.....ইত্যাদি লিখিত হইয়াছিল।(২) হর্ষচরিত, ভবভূতি ও বাণভট্ট কৃত গ্রন্থাদিতে চণ্ডীর উল্লেখ আছে। বাণভট্ট হর্ষবর্দ্ধনের সভাকবি সপ্তম শতাব্দির লোক। ভবভূতি প্রথমে কনোজরাজ যশোবর্ম্মণের সভাকবি ছিলেন। তিনি অষ্টম শতাব্দির লোক। হর্ষ ষষ্ঠ শতাব্দির অলঙ্কারশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃতাধ্যাপক এফ্ ইডেন পার্জিটার সাহেবের মতে শ্রীশ্রীচণ্ডীর রচনাকাল খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দি।(১) সুতরাং পার্জিটার সাহেবের মতে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দি হইতেই প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গা পূজার সূচনা; অর্থাৎ প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গা পূজার ইতিহাস সতেরোশত বৎসরেরও অধিক প্রাচীন।

শ্রীশ্রীদুর্গার এই পূজা তাঁহার বরাভয়দায়িনী, করুণাময়ী, স্নেহময়ী মাতৃমূর্ত্তির উপাসনা। শত্রুও তিনি মিত্রও তিনি, দুঃখও তিনি আবার সুখও তিনি। লীলার কারণে মহামায়ার অসংখ্য রূপ, অসংখ্য ভাব, আবার তিনি রূপাতীত, ভাবাতীত—শুদ্ধচিত্তে শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর। অবাঙ্মনসোগোচরম্। 'সত্ত্ব, রজ, তম—তিন গুণের পার, প্রকৃতির পার'। ভক্ত সন্তানেরা তাঁহার ভীষণরূপ চিন্তা না করিয়া তাঁহার করুণাময়ী মূর্ত্তির পূজা করিয়া দুঃখদৈন্য ও ত্রিতাপজ্বালা হইতে মুক্তি পাইতে বাসনা করেন। দুর্ব্বলচিত্ত আমরা তাঁর রুদ্রাণী রূপ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার মধ্যে আমাদের মাকেই চাই। সন্তান বিপদে পড়িয়া মায়ের কথাই মনে করে, মাকেই ডাকে, মায়ের কোলেই আশ্রয় প্রার্থনা করে। মায়ের স্নেহরূপ বর্ম্মাবৃত হইয়া মহাসুখে নিশ্চিন্তমনে দিন কাটায়। ত্রিতাপদগ্ধ জীব সংসার-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের ভয়ে মহামায়া দুর্গার মাতৃমূর্ত্তির অভয় চরণে আশ্রয় গ্রহণ করে। সন্তানের আন্তরিক

* উপনিষৎ গ্রন্থাবলী (স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত) ১ম ভাগ, ভূমিকা ১১শ পৃষ্ঠার পাদটীকা।

(১) স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সম্পাদিত শ্রীশ্রীচণ্ডীর ভূমিকা পৃষ্ঠা—১০

(২) ঐ পৃষ্ঠা—৯

ব্যাকুলতায় মা তাহাকে নিজের কোলে আশ্রয় দিয়া সংসার-তাপ দূর করিয়া দেন। সেই জন্যই মাতৃমন্ত্রের উপাসক বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে মায়ের পূজার বহুবিধ আয়োজন। মাতৃভক্ত সন্তান নিজ গর্ভধারিণী মাতৃজ্ঞানে বিশ্বপ্রসবিনীকে পূজা করিয়া বিমল আনন্দে ভাসিতে থাকে। বাঙ্গালীর এই মাতৃ উপাসনা তাহার শ্রেষ্ঠ উপাসনা।

আবার বৎসর ঘুরিয়া শরৎ আসিল। আবার মায়ের আগমনের শুভ বার্ত্তায় আকাশ-বাতাস মাতিয়া উঠিয়াছে। মহালয়ার শুভ লগ্নে আবার ঐ বাজিতেছে সানাই। পূজা-মণ্ডপের দ্বারদেশে স্থাপিত ত্রিপুণ্ড্রক অঙ্কিত বারিপূর্ণ মঙ্গলঘটকে সম্মুখে রাখিয়া কদলীবৃক্ষের পত্র আনন্দে যেন দুলিতেছে। চতুর্দ্দিকের এই আনন্দময় পরিবেশে আমরা তাঁর সন্তানেরা প্রার্থনা করি—

মা, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তুমি যা আর যাহাই কিছু হও, তুমি আমাদের মা, সত্যিকারের মা—এই বুদ্ধিতে আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমাদিগকে ধন্য কর, তোমার মাতৃত্বস্তন্যের সুধাপানে আমাদিগকে মুগ্ধ কর।

দুর্গতিহরা দুর্গার আবাহনে

কবিকঙ্কণ হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

এস জগজ্জননী দুর্গতিহরা মা! এই শরৎ কালের সোনালী আলো রূপ তোমার চরণ কমলের আভায় আজ সারা ভারতবর্ষ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। মাগো! তুমি সাকারা না নিরাকারা? যখনই তোমাকে মা মা বলিয়া ডাকি তখনই ত তোমার স্নেহমাখা অপূর্ব্ব রূপ আমার চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া ওঠে। তুমি যেন তোমার দুই বাহু বাড়াইয়া সন্তানকে বুকে লইবার জন্য আসিতেছ। আর তোমার সন্তানগণ মা মা বলিয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছে।

সমস্ত জগৎই ত তোমার সন্তান। অনন্ত আকাশ তোমার অবয়ব। সূর্য্য, চন্দ্র ও বহ্নি তোমার তিনটি নয়ন তাই ত মা তুমি ত্রিনয়নী। তুমি যে অতি বিরাট, তুমি যে সর্ব্বচরাচরে ব্যাপ্ত রহিয়াছ। তোমাকে স্থূল চক্ষে না দেখিতে পাইলেও বুঝিতে পারিতেছি—তোমাকে সাকার বলিব না নিরাকার বলিব?

তুমি কখনও সাকার হও, যখন সৃষ্টিকর, যখন জগতকে পালন কর। তোমার স্নেহধারার মত জল ধারায় জগতকে অভিসিক্ত কর। তখন তুমি ত জননীর মতই অভিব্যক্তি-লাভ কর। আবার যখন সমস্ত জগৎ তোমার অঙ্কে মিলিয়া যায়, জগত যেন সুপ্ত—অবশ, অলস ভাবে তোমার অঙ্কে লিপ্ত হয় তখন থাকে না তোমার কোন নিদর্শন। তখনই তোমাকে নিরাকার স্বরূপে চিন্তা করি।

কিন্তু ওগো জননী তুমি যুগে যুগে সাকার রূপে অবতীর্ণা হইয়া দানব কুলের বিনাশ সাধন করিয়াছ—তুমি নিজ মুখে বলিয়াছ—

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্।

তোমার এই বাণী চিরন্তনী। তাই দেখা যায় জগতে দানব কুল কখন চিরস্থায়ী হইতে পারে নাই। তোমার অমোঘ অস্ত্রাঘাতে তাহারা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। একদিন দেবগণের আকুল আহ্বানে তুমি সাকারা হইয়াছিলে। সেদিন তোমার সেই বিরাট রূপ দশদিকে সহস্র ভুজে ব্যাপ্ত করিয়া অধর চুম্বী কিরীট শোভিত মস্তকদ্বারা স্বর্গ লোক স্পর্শ করিয়া রেখা দিয়াছিলে। দেবগণ যুক্ত করে স্তব করিয়াছিল—

দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষ জন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্য দুঃখ ভয়হারিণী কা ত্বদন্যা
সর্ব্বোপকার করণায় সদার্দ্র চিত্তা॥"

সমস্ত দেবশক্তির সমষ্টিরূপে তুমি উদ্ভূতা হইয়াছিলে।

তুমি তাই দৈবী শক্তি—আসুরী শক্তি বিনাশের জন্য তোমার আবির্ভাব ঘটে। অসুর শক্তি বলিতেছে আত্মকৃতি ও ধন বুদ্ধির প্রতীক আর দৈবী শক্তি চেতনশীল ও বহুজন পোষক। দৈবীশক্তি অমরত্বের প্রতীক। তাই দেবাসুর সংগ্রাম চিরন্তন রহিয়া আছে।

বর্তমান যুগে এই আত্মকেন্দ্রিকতা ও ধন বুদ্ধির প্রভাব সমস্ত বিশ্বকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে।

তাই মা আজ তোমাকে আকুল কণ্ঠে আহ্বান করি। এই ভারতের ঘোর দুর্দিনে শারদ প্রভাতে নব বর্ষাবারি বিধৌত শ্যামল তৃণ ক্ষেত্রে তোমার চরণ অর্পণ কর। তোমার আগমনে আজ বিশ্বভুবন শান্তিময় হউক, নির্মল হোক মানব হৃদয়। সকলে সমবেত কণ্ঠে যেন তোমার পূজা বেদী তলে দাঁড়াইয়া বলিতে পারি—

যা দেবী সর্বভূতেষু শান্তি রূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

মুসলমান যুগে দুর্গাপূজা

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

কালীবিলাস তন্ত্র গ্রন্থে গণেশ, কার্তিক ও লক্ষ্মী, সরস্বতীর পূজা বর্ণিত হয়েছে। এ গ্রন্থের অষ্টাদশ পটলে দেবী প্রশ্ন করছেন—

"দেবদেব মহাদেব সংসারার্ণবতারক।
পূজ্যানাং কার্তিকেয়ঞ্চ তথা মন্ত্রং জগৎপতে।
ধ্যানঞ্চ কার্তিকেয়স্য তথা মন্ত্রং জগৎপতে।
ধ্যানঞ্চ বিজয়াদেব্যা জয়াদেব্যা বদ প্রভো।
মূলবাহনং তস্য গণেশস্য চ মূষিকম্।
শরৎকালীনমহিমাং পূজনঞ্চ কথং প্রভো।
কালিকায়াঃ পুরাণেষু তথা দেবীমতে প্রভো।
পূজনং কার্তিকাদীনাং ন চ কুত্রাপি সংস্থিতম্।"

ইহার উত্তরে মহাদেব এই সকল দেবতার ধ্যান ও মন্ত্র বলে ২০ পটলে বলছেন—

"আদৌ দশভুজাপূজা ঘটস্থাপনপূর্বকম্।
পঞ্চদেবং প্রপূজ্যাদৌ পশ্চাদ্দুর্গাদিনীম্।
ততশ্চ কার্তিকাদীনাং পূজাঞ্চ যত্নতশ্চরেৎ।
ততশ্চ পত্রিকা পূজা দেবীপুরাণসম্মতা
সারাৎসারং মহেশানি চতুর্বর্গেষু সম্মতম্"।

স্মার্ত ভট্টাচার্য রঘুনন্দন হুসেন সাহার সময়ের লোক। তিনি দুর্গাপূজা প্রয়োগ তত্ত্বে মূলদেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠার পরে "এষমন্ত্রেণাং গণেশাদীনাং" দেবতার পূজার কথা বলেছেন এবং মূলদেবতার পূজার পরে "ততো মহিষাসুর-সিংহ-গণেশাদীনাং যথাশক্তি পূজা কার্যা" এই নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর পূর্ববর্তী শূলপাণির দুর্গাপূজাবিবেক এবং আরো পূর্ববর্তী গ্রন্থে লক্ষ্মীসরস্বতী, কার্তিকগণেশ সমন্বিত দুর্গাপূজার উল্লেখ নাই।

মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে কুলুকভট্টের পিতা উদয়নারায়ণ একটী মহাযজ্ঞ সম্পাদনের নিমিত্ত রাজসাহীর অন্তর্গত তাহিরপুরের রাজপুরোহিত রমেশ শাস্ত্রীর পরামর্শ চান। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে হিন্দু শাস্ত্র-মতে চারিটী মহাযজ্ঞ—বিশ্বজিৎ, রাজসূয়, অশ্বমেধ ও গোমেধ। কলিযুগে ঐ সব নিষিদ্ধ বলে তিনি উদয়-নারায়ণকে দুর্গোৎসব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা প্রদান করেন। অনন্তর কুলুকভট্টের পুত্র রাজা কংসনারায়ণ প্রায় নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করে বাসন্তী দুর্গোৎসব সম্পন্ন করেন। রমেশ শাস্ত্রী দুর্গাপূজাপদ্ধতিও লিখেছিলেন।

মুসলমান যুগে নানাবিধ বিপর্যস্ত সামাজিক ব্যবস্থার এবং বাৎসল্যরসের পরম অভিব্যক্তির ফলে বঙ্গান্তর্গিনী বিশ্বজননীর বর্তমান ষষ্ঠাধিষ্ঠিত দেবতাগণের সঙ্গে পূথক্ আসন গ্রহণ।

শুভ-শরৎ

ইন্দিরা দেবী

বর্ষার ঘনঘটার আকাশের অবিশ্রাম বর্ষণের শেষ হলো —এলো শরৎ—স্নিগ্ধ উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত শরৎ। মাটির বুক ভরে উঠলো সবুজের সমারোহে—মানুষের মন ভরে উঠল প্রসন্ন স্নিগ্ধতায়। উজ্জ্বল শরতের নীলাকাশে সারি বাঁধা বকের শ্রেণী, লঘু গতিতে পাখা মেলে স্বচ্ছন্দ গতিতে চলে, মানুষের মনেও প্রসন্ন প্রশান্তি, বাতাসে স্নিগ্ধ স্পর্শ; মানুষের মনে ধ্বনিত হয় বার বার—

আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে
না জানি পরাণ কারে চায়।

শরতের প্রথম পদক্ষেপেই যেন সমস্ত বাতাস্নিগ্ধ সুর হয়ে গেল। তারপর এলো দেবীর পূজা। সাধারণতঃ আশ্বিনের মাঝামাঝি বা শেষের দিকে পূজার বাদ্য শোনা যায়—কিন্তু এর সূচনা হয় শরতের প্রথম পদক্ষেপের দিনটি থেকেই।

সহরের পূজা, গ্রামের পূজা উৎসব হিসেবে এক হলেও এর অনুষ্ঠান অনেক প্রকারে বিভিন্ন। বারো মাসে তেরো পার্বণ হয় বাংলাদেশে, কিন্তু দুর্গোৎসবের সঙ্গে অন্য কোনো উৎসবের তুলনা হয় না। ছোট বড় ধনী নির্ধন সকলেই কি গভীর আগ্রহ নিয়ে উৎসুক হয়ে থাকে—এই উৎসবটীর জন্য অভাব অভিযোগ, অনটন, শোকতাপ সব ভুলে গিয়ে এই উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠে সকলে। এটিকে অনায়াসে তাই জাতীয় উৎসব বলে ধরা যায়। অবিশ্যি আমরা যে উৎসব পালন করছি—এইভাবে উৎসব দেড়শো দুশো বছর ধরে চলে আসছে, তার আগেও এ উৎসব পালন করা হতো। কিন্তু ঠিক এমনি ভাবে পালন করা হতো না। শাস্ত্রে দেবী দুর্গার কল্পনা যাই করা হোক না কেন—আমরা কিন্তু এই উৎসবটিকে আমাদের মনের মত করে নিয়ে পালন করি। দেবীর সঙ্গে সুর ঘুচিয়ে দিয়ে তাঁকে আমরা ঘরের মানুষ করে তুলেছি। তিনি আসছেন—তিন দিন তাঁকে আমাদের মধ্যে পাবো—এই বিশ্বাসটি কেন্দ্র করে কী উৎসাহ আর আনন্দকোলাহল করি আমরা। তিন দিন পরে কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে আমরা বিসর্জন দিই। আর বলি—পুনরাগমনায় চ—আবার ফিরে এসো মা। সহর থেকে একটু বাইরে এলেই বৈরাগীর একতারার সঙ্গে শোনা যাবে—সেই গান—মার আগমনী—

গা তোলো গা তোলো বাঁধো মা চুলটি
ঐ এলো তোর পাষাণী, ঈশানী।
পরে দুকূল দিও কোলে মা কৈ মা কৈ বলে
আসছে তোর ঐ শ্বশুর বসনী
মাগো ত্রিভুবন মাঝে, ত্রিভুবন যজ্ঞে
তোর মেয়ে সাধারণ নয় গো রাণি।
আমরা ভাবতাম ভবের প্রিয়ে, মা সাকি তোর মেয়ে
তিনি সাকি ভবের ভয় হারিণী।
ধরিলি যে রত্ন উদরে তোর মত সংসারে
রত্নগর্ভা এমন নাই রমণী।

মা তোমার ঐ তারা, চন্দ্রচূড়ধারা, চন্দ্রবদনিয়া চন্দ্রাননী
এমন রূপ দেখি নাই কারু, মনের অহঙ্কার
হরে মা! তোর হর মনো মোহিনী।

এমনি ধরনের আগমনী সহরে বড় একটা শুনতে পাওয়া যায় না। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রুচির পরিবর্তন এসেছে। তবু আসলে আনন্দময়ী সম্পর্কে আমাদের চিন্তাধারার সত্যিকারের কোন পরিবর্তন আসেনি। শাস্ত্রের পুঁথির পাতা থেকে মা এসে আরম্ভ করে নিয়েছেন আমাদের মনে। এই উৎসব উপলক্ষ্য করে ধর্ম আর সমাজ মিশে গিয়েছে। এক হয়ে গিয়েছে আমাদের মনে। পূজার বোধন থেকে সুরু করে বিজয়াদশমী পর্যন্ত পরস্পরের মেলা মেশা, হাস প্রতিহাস, সুখদ কামনা, প্রীতি শুভেচ্ছার বিনিময় কোলাকুলীর ভিতর দিয়ে কী এক অপরূপ বহুৎ পরিবেশের সৃষ্টি হয়—আর আমরা পরস্পরের কত কাছাকাছি চলে আসি! ছেলেবেলায় দেখেছি যেদিন থেকে প্রতিমা তৈরীর কাজ সুরু হলো সেদিন

থেকেই সকলের মনে কি উৎসব। দিনের পর দিন চলতো এই কাজ, মাটি বং তুলি ডাকের সাজ। যাদের বাড়ীতে পুজো হতো তারাই শুধু মাকে নিয়ে আনন্দে মেতে উঠতেন না। সকলের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন তাঁর পুজোর আনন্দ—সবাই ভাবতেন ঃ আমাদের নিজেদের পুজো। মন্ত্রপাঠ, পুষ্পাঞ্জলি, খাওয়া দাওয়া, গান বাজনা, ঢাকের বাজনা—সব মিলিয়ে আনন্দ মুখর হয়ে উঠতো গ্রামগুলি সহরে চলতো সর্বজনীন পুজার হিড়িক, আনন্দোৎসবের ঘটা একটু স্বতন্ত্র। আর তা হওয়াই স্বাভাবিক। প্যাণ্ডেল মাইক, বিজলী বাতি, প্রদর্শনী সহরের উৎসবের অপরিহার্য অঙ্গ। ঘটার দিক থেকে যত পার্থক্যই থাকুক, আনন্দের দিক থেকে সহরে আর গ্রামের মধ্যে কিন্তু কোনো তফাৎ নেই। এইখানেই আমাদের উৎসবের সার্থকতা। এই উৎসব উপলক্ষ্যে কেউ দিয়ে খুসী, কেউ পেয়ে খুসী। আমাদের সমাজ জীবন থেকে অনেক আনন্দই নির্বাসিত হয়েছে কিন্তু আনন্দের এই ধারাটি এখনও বয়ে চলেছে আমাদের জীবনে।

সেকালে শরৎকালে রাজারা দিগ্বিজয়ে বার হতেন—তখন তারা শক্তির উপাসনা করতেন। শত্রু বধের জন্য তারা কামনা করতেন শক্তিরূপিনী দেবীর আশীর্বাদ। তারপর তারা পালন করতেন বিজয়া উৎসব। সেকাল আর নেই, এখন আর দিগ্বিজয় নেই, তবু দেবীর উপাসনা আছে—বিজয়া আছে। প্রতিদিনকার কাজে পরস্পরের সঙ্গে আচার ব্যবহারে প্রাত্যহিক জীবনে এখনও আমরা কামনা করি দেবীর আশীর্বাদ। উৎসবের শেষে সকলের সঙ্গে করি প্রীতি আর শুভেচ্ছার বিনিময়। বাঙ্গালীর জীবনে এই উৎসবটী তাই সুন্দর ও উৎসব মুখরিত—আর শরৎকাল তাই শুভ ও সার্থক।

ছেলে

পুষ্প দেবী

সাংসারিক নিদারুণ আঘাতে মন সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হয়তো বিবেচনা শূন্যও। আজ কালকার ছেলেরা যে অত্যন্ত রুঢ়, অত্যন্ত ধারা মমতা হীন, এমন কি কর্ত্তব্যজ্ঞান হীন এ বিষয়ে মনে কোনই দ্বিধা ছিল না। গভীর ঘৃণায়, গভীর বিদ্বেষে মন পরিপূর্ণ। মনে হয়েছিল ভগবানের কি অসীম করুণা তাই অপদার্থ পুত্র সন্তান আমার কোলে আসেনি। বারে বারেই মনে জাগে অতীত দিনের কথা, মনে পড়ে বাবা—কাকাদের অন্তরঙ্গতা। মায়াদের ঐকান্তিকতা, নিজেদের শিশু কালের সঙ্গে জড়ান তাঁদের কত গভীর মমতার কথা। সে সব কিশোর—তরুণদের চোখে ছিল বিদ্যার দীপ্তি, ব্যবহারে ছিল বিনীত শালীনতা। কথায় ছিল গভীর সংযম, শিক্ষায় দীক্ষায় সে সব ছেলেরা আজ কোথায় হারিয়ে গেল? তাঁদেরই বংশধরদের মাঝে আজ একি পরিবর্ত্তন? আজকের আমাদের ছেলে মেয়েরা কি কাকা—মামাকে তেমন করে পাবে কোন দিন? এ সব ছেলেরা জানে না স্নেহের শাসন। চায়না অন্তরের ভালোবাসা, বোঝেনা যে তাদেরও করণীয় কিছু আছে। চোখ রাঙ্গিয়ে নিজের দাবী করেই তারা খুসী। গুরুজনদের অন্তরের গভীর মমতার দুর্ব্বলতা ছাড়া তাদের যে দাবীর যে কোনই মূল্য নেই, এ তারা মানতে চায় না বা জেনেও স্বীকার করে না। ছেলেরা যে অকৃতজ্ঞ, ছেলেরা যে অত্যন্ত অসংযমী ও উদ্ধত এ সম্বন্ধে মনে তখন বিচারেরও প্রয়োজন ছিল না।

এমনি সময়ে পেলুম অমিয়কে—ভালোবংশ, ভালো ঘরের ছেলে। শুধু তার প্রতি মনে একই মত নিয়ে এগিয়ে গেলুম—তাই হয়তো বিচার পক্ষপাত শূন্য হয়নি। একদিন সামান্য সূত্রে এমন বুঝি অকারণে তাকে করলুম শাসন। অনায়াসে সে শাসন সে না মানতে পারতো। পারতো আমায় অত্যন্ত সহজে এড়িয়ে যেতে। কিন্তু তা

সে মেল না তক্ষুণি নেবে এল. ডাকলো—মাসিমা! দুচোখে তার গভীর বিস্ময়—সেই বিস্মিত দৃষ্টি আমায় নিজের ভুল বুঝিয়ে দিলেও। ছেলে যেন মানতে চায় না—মুক্ত কণ্ঠে বলে—"বলুন কি দোষ করেছি? আমি ঠিক কথা বলতে বোধহয় জানি না।" তখন আমার মনের শেষ সিঁড়িটে কেটে গেছে—আমি বল্লুম, কি দোষ তা যদি তুই না জানিস তো আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি। অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে বারে বারে মাথা নাড়তে নাড়তে সে অফিস গেলো। যাবে—যাবেন নাতো মণীষা, আজ আমি একটুও কাজ করতে পারব না। ছাদে গিয়ে দাঁড়ালুম, অমিয় চলে গেল অফিস, কিন্তু আমি কিছুতেই নিজেকে কোন কাজে ডুবিয়ে দিতে পারলুম না বারে বারে মনে হল—তাতো নয়? এ ছেলের বিশেষত্ব; আছে—আধুনিকতা এর সহজ আভিজাত্যকে ম্লান করেনি, শিশুর সরলতা কৈশোরের প্রান্তে এসেও তার মাধুর্য্য হারায়নি।

এরপর লক্ষ্য করেছি, তার প্রতি কাজে প্রতি কথায় বাবা-মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা—গভীর অনুরাগ। তাঁদের ইচ্ছা ও আদেশ সে বর্ণে বর্ণে মেনে চলতো—কথায় ব্যবহারে, আহারে আচরণে, তার গভীর সংযমের পরিচয়ে মুগ্ধ হয়েছি তার বাবা-মার নির্দ্দেশ খুব ভালো হলেও মোটেই আপাত সুখকর নয়! সে নীরবে সেগুলি মেনে চলতো শীতের শেষ রাতে উঠে পড়তে বসতো—কিন্তু কখনোও এককাপ চা খেত না। পড়া শেষ হলে খুব খানিকটা হেঁটে এসে খাবার খেতো—শুধু ফল ও মুগ ভেজা। তার সঙ্গে একটা বিস্কুট অবধি না ফলের সঙ্গে রান্না কোন জিনিষ খাওয়া তার বাবা-মার বারণ ছিলো। আর রবিবার খেতো নিরামিষ। কিন্তু এ সব বিষয় সম্পূর্ণ সংস্কার মুক্ত ছিল সে—যদি রবিবার তাকে কারুর অনুরোধে পড়ে আমিষ খেতে হতো, তবে সোমবার নিরামিষ খেয়ে সেটা পুষিয়ে নিতো।

আমাদের পাশের ফ্লাটে সে থাকতো—আদরের ছেলেকে মার এই প্রবল স্নেহে ঢাকা। মা সঙ্গে এসে তার সংসার গুছিয়ে দিয়ে গেলেন। তাঁর থাকার উপায় ছিল না। ছোট ছেলেটির স্কুল খোলার সময় হল। যাবার দিন, আমার দুটো হাত ধরে বারে বারে সজল চোখে বল্লেন—চল্লুম ভাই—অমিয় রইল তোমারই ভরসায় ওকে রেখে চল্লুম। তুমি মাঝে মাঝে ওর খোঁজ খবর নিও। ও ছেলে মা ছাড়া দুনিয়ায় কিছু জানে না। আমি বল্লুম—কিন্তু আমার যে সিঁড়ি ওঠা-নামা ডাক্তারের বারণ দিদি। তিনি আমার দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যা তপুকে দেখিয়ে বল্লেন—কেন তপু নেবে তার দাদার খোঁজ। আমি একটু দ্বিধাগ্রস্থ ভাবে বল্লুম, না দিদি ওকে পাঠাতে পারবনা। আজকালকার দাদা দেখে দেখে আমার আর দাদা জাতের ওপরই শ্রদ্ধা নেই। সাস্ত্বনাচ্ছলে হেসে তিনি বল্লেন—না ভাই ওরা সত্যিকারের ভাই বোনই হবে।

তারপর এক বছর ধরে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের মধ্যে বিশেষ করে লক্ষ্য করেছি অমিয়র ব্যবহারে তার মায়ের সে কথার সত্যতা এক বিন্দুও ম্লান হয়নি। ছোট বোনের প্রতি তার গভীর স্নেহ-মমতা বাৎসল্য প্রতি ব্যবহারে ফুটে উঠতো—কিন্তু তাতে সংযম ও শোভনতার অভাব ছিল না।

ধীরে ধীরে আমার মনের পরিবর্ত্তন আমিই টের পাইনি। হঠাৎ নোটিশ এল অমিয় অন্যত্র বদলী হয়েছে। সেদিন দেখলুম কবে ও কেমন করে জানি না আমাদের সংসারের সুখ-দুঃখ প্রতিটি ব্যাপারে সে জড়িয়ে গেছে অবিচ্ছেদ্য ভাবে। বুঝলুম নির্ভর আমার ওপর তাকে করতে হয়নি—তারি ওপর আমরা করেছি।

বিকেলবেলা সবাই আশা করে থাকি, কখন অমিয় আসবে। সহজ হাসি গল্পে মুছে যায় সকলের সারাদিনের ক্লান্তি যে দিন অমিয় আসে না, আমাদের সেদিনের সন্ধ্যেটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

কোন দিন কোন সময় আমার এ রুক্ষ মন তাকে নিয়ে বিব্রত বা তার বোধ করেনি। আমরা থাকি দোতলার ফ্লাটে, সে থাকতো তেতলায়। যখন সিঁড়ি দিয়ে উঠতো আমাদের দরজার কাছে তার পায়ের আওয়াজ একটু মন্থর হয়ে আসতো। আমরা বলতুম—এই যে অমিয়। তবে ঘরে আসতো—নইলে সোজা উপরে চলে যেত। তার কথা বলার ধরণ ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। সামান্য ছোট একটি কথায় এত সহজে যে সে মনের সব গ্লানি নিঃশেষে মুছিয়ে দিতে পারতো তা বলা সম্ভব নয়।

আমার স্বামীর একান্ত স্নেহাস্পদ ছিল এই ছেলেটি। দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করে ছেলেদের সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতার অভাব ছিল না। অমিয়র বিষয় অকুণ্ঠ চিত্তে তিনি অভিমত প্রকাশ করতেন যে অমন ছেলে আর দেখিনি। এই শান্ত সংযত মানুষটির এ প্রশংসার মূল্য বড় কম ছিল না।

হয়তো কোন দিন কোন কারণে আমার মন ক্ষুব্ধ বা ক্ষুণ্ণ—অমিয়র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তা গোপন থাকার উপায় ছিল না—খানিক বাদেই কথা প্রসঙ্গে সে বলতো—আমরা ছেলেরা দিনে রাতে কত ভুলই তো করেই যাচ্ছি, কিন্তু তা আপনারা ছাড়া কে সইবে মাসিমা?

আজকালকার ছেলেরা দেখেছি স্বাধীনতাটাই বেশী পছন্দ করে কিন্তু অমিয়র স্বভাবে তার পার্থক্য বিশেষ ভাবে নজরে পড়তো। তার অফিস থেকে বাড়ী ফেরার সময় প্রায় নির্দিষ্ট সময়ই থাকত এবং সে সময়টা পথের দিকে আমারও নজর থাকতো। একদিন অমিয়র ফিরতে একটু বেশ দেরী হল. গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিও পড়ছিলো।

মনে একটু উদ্বেগ এল—অমিয় ফিরতেই বল্লুম এত দেরী যে ফিরতে? বেশ কুণ্ঠিত নম্র স্বরে অমিয় বললো—হেঁটে আসলুম মাসীমা, বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা দিন ছিলো। আর মোটা হয়ে যাচ্ছি তো? তাই একটু হাঁটা দরকার মনে হল। আপনি ভাবছিলেন না? আমার বলে যাওয়া উচিত ছিল।

যতদিন সে আমার কাছে ছিল—আমার মনেও ছিল না যে সে আমার কেউ নয়: বুক আমার ভরে উঠেছিল কানায় কানায়। তাকে ছাড়ার দিনে তার অভাব গভীর ভাবে নাড়া দিলো আমাদের ছোট্ট পরিবারটিকে। তবু ধরধরে মুখের দিকে চেয়ে অমিয় বললো - যারও তো আমায় ছাড়তে হয়েছে—যেদিন যখুনি দরকার ডাক দেবেন 'অমি' বলে, দেখবেন ঠিক এসে হাজির হবো। তখন মনেই হবে না যে দূরে চলে গেছলুম।

আমার সৌভাগ্য যে তার ছাড়ার দিনে আমায় বাড়ীতে থাকতে হয়নি! ওঁর অসুস্থতার জন্য আমাদের পশ্চিমে যাবার কথা হচ্ছিল। অমিয় নিজের যাবার দিন পেছিয়ে দিয়ে, গাড়ী রিজার্ভ করে ষ্টেশনে ষ্ট্রেচারে করে ওঁকে গাড়ীতে তুলে আমাদের বিছানা পত্তর অবধি পেতে দিয়েও যেন সে শান্তি পেলো না। বারে বারে বললো রিজার্ভ পেতে দেরী হয়ে গেল, আর ছুটী পাবার উপায় নেই, নইলে আপনাদের সেখানে পৌঁছে দিয়ে তবে আমার যাওয়া উচিৎ ছিল। এতে আমি একটুও স্বস্তি পাব না। শুধু লোকজনের ভরসায় মেসোমশাইকে নিয়ে যাওয়া আমার একটুও ভালো লাগছে না। ট্রেণ ছেড়ে দিলো।

সেই দিন প্রথম আমার মনে হল কেন ভগবান আমায় ছেলে দিলেন না! ঠিক এমনি ছেলেই তো আমায় দিতে পার্তেন। ট্রেণ তখন চলতে আরম্ভ করেছে—জানালাটা ধরে অমিয়ও সঙ্গে সঙ্গে এগুচ্ছে।

অনুভূতি

কল্পনা মল্লিক

গভীর সুপ্তির মাঝে শুধু ছুঁয়ে যায়
মন তাকে পেতে চায়, আরো পেতে চায়।
ডেকে ডেকে বলি তাকে, শোন শোন শোন,
তোমার ও মুখে কেন কথা নেই কোন।
কাছে এলো একবার, অনুরোধ রাখো
অভিমানে ঢেকে তুমি পরিচয় ঢাকো।
চুপি চুপি কানে কানে বলে সে তখন
"চেয়ে দেখ সাথে আমি এইতো এখন"
কোথায় লুকাও তুমি দেখতে না পাই,
একবার রূপ ধর আমি দেখা চাই।
"রূপ নেই কায়া নেই আমি নিরাকার
তোমাদের প্রেমে হবে আমার আকার,
প্রেমের দেবতা আমি তোমাদের প্রিয়
প্রেম দিয়ে প্রীতি দিয়ে নব রূপ দিও।"

'সিঁদুর খেলা'

রমা দেবী

ও শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে
সর্ব্বস্যার্ত্তি হরে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে।

মহাদেবীর মহাশক্তিতে হৃত স্বর্গরাজ্য ফিরে পেয়ে একদা স্বর্গের দেবতারা দেবী দুর্গাকে যে মন্ত্রে প্রণাম কোরেছিলেন আজ বিশ্বচরাচর ও সেই মন্ত্রে দেবীর বন্দনা গান গেয়ে উঠলেন।

আবার এলো বিজয়া দশমী—বড় করুণ অথচ মধুর। বাংলার প্রতি মায়ের হৃদয়ের ও প্রাণের কথা আজ আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হোয়েছে। মফঃস্বলের ছোট শহর। অসুস্থ অবস্থায় বসে আছি। সামনে খোলা মাঠ। সেই মাঠে আটচালা বেঁধে প্রতি বছর শহরের বাঙালীরা জগজ্জননী মাকে এখানে নিয়ে আসে। যদিও ছোট শহর তবুও ১ মাস আগে থেকে যে আনন্দের সাড়া আবাল বৃদ্ধ বণিতার মধ্যে বইতে থাকে তার রেশ প্রায় ১ মাস ধরে চলে। ঘরের মেয়ে উমা ঘরে আসেন আবার নবমী নিশি পোহালে সকলকে কাঁদিয়ে তিনি চলে যান। প্রতি মা আজ এই প্রবাসী মেয়ের জন্যে অশ্রু ফেলেন। কত দিনের কত আয়োজন মুহূর্ত্তেই শেষ। আজ রাতেই মণ্ডপ শূন্য হোয়ে যাবে ভাবতেও মনটা ব্যাথায় টন্‌টন্ করে। বসে আছি বারান্দায়। এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পূজা মণ্ডপ। পুরোহিত দুজন বসে আছেন এখনই হবে দর্পণ বিসর্জ্জন। দেখতে পাচ্ছি মায়ের মুখ। মায়ের মুখেও আর সে হাসি নেই। চোখে যেন জল চিক্ চিক্ কোরছে সেই দিকে চেয়ে মনে মনে বল্লুম, মাগো! এত যদি তোমার মায়া তবে কেন এত দুঃখ দারিদ্র কেন? কেন তুমি আমাদের এই অভাব অনটনের মধ্যে রেখে আমাদের মন এত নীচু কোরে দিচ্ছো।

বেজে উঠলো বিসর্জ্জনের বাজনা। মার মুখের দিকে তাকিয়ে ভেবে চলেছি আমার এক বন্ধুর কথা:-সে বলে এ নাকি পুতুল খেলা। কথাটা যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারিনি কোনো দিন কেননা আমার সে ক্ষমতা অর্থাৎ তর্ক করার ক্ষমতা যা নেইনি তাই বারে বারেই চুপ কোরে থেকে তর্কে হেরে গিয়েছি। সে বন্ধুটি আবার সায়েন্সের ছাত্রী। প্রতি বছর এই পূজার সময় আমার কাছে এসে তর্কের বড় বহায়। এবারে তার স্বামী প্রোফেসার ঘোষের খুব অসুখ, কাল রাতে শেষবার খবর নিয়ে জেনেছি বাঁচবার আশা নেই, শুনে মনটা ভারি খারাপ হোয়ে গেছে। ডাক্তার বোলেছে যে কষ্টা কাটে। সকাল থেকে কাউকে আর খবর জিজ্ঞেস্ কোরতে সাহস পাচ্ছিনা তবে বেশ বুঝতে পারছি ভেতরে ভেতরে পাড়ার কর্ম্মী ছেলের দল শবযাত্রার জন্য তৈরী হোচ্ছে। মার মুখের দিকে চেয়ে ভেবে চলেছি কত কথাই। ছোট্ট থেকে এক সঙ্গে মানুষ হোয়েছি যে বন্ধুর সাথে সেই বন্ধুর আজ ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কথা ভেবে বারে বারেই মনে হোচ্ছে, মাগো তুমি কি সত্যই পুতুল? এত লোকের একাগ্রতার মধ্যে কোথাও কি ছিলো খাদ? তাই কি তুমি জাগনি? মায়ের অসুরের দিকে চেয়ে মনের অসুর ও বলে সত্যি এ সবই মায়া সবই মিথ্যা। বেজে চলেছে বিসর্জ্জনের ঢাক। চারিদিকে মেয়েদের ভীড়। এইবার আরম্ভ হবে সিঁদুর খেলা হঠাৎ দেখি আমার সেই বন্ধুটিকে পাড়ার আর একটি ভদ্রমহিলা ধরে ধরে নিয়ে আসছে। কাঁপতে কাঁপতে সে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো প্রতিমার সামনে হাত জোড় করে; দেখলাম ভেরে আগেকার অবিশ্বাসের হাসির বদলে ফুটে উঠেছে পরম নির্ভরতা। সমবেত জনমণ্ডলী যেন স্তব্ধ হোয়ে ওকে দেখতে লাগলো। পুরোহিত অবাক হোয়ে ওকে চেয়ে দেখে আমিও দেখি। মনে মনে বলি "শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে মাগো!" তুমি জাগো মা। দর্পণ বিসর্জ্জন হোয়ে গেলো। পুরোহিত মায়ের কপালের সিঁদুর নিয়ে কয়েক

অন এয়োস্ত্রীর কপালে দিয়ে সিঁদুরের পাত্র এগিয়ে দিলো সকলের জন্য। বন্ধুর দিকে চেয়ে দেখি সে উপুড় হোয়ে প্রণাম কোরছে; তার সে প্রণামের মধ্যে আত্মোৎসর্গের ভাব পরিস্ফুট। সঙ্গের ভদ্রমহিলারা তাকে ধরে তুললো। চোখে তখন তার জলের ধারা। কম্পিত হস্তে সেসকলের সিঁথিতে সিন্দুর দিতে আরম্ভ কোরলো, পরে সে হস্ত মহিলারাও প্রত্যেকে ব্যথিত হৃদয়ে তার সিঁথিতে ও কপালে সিঁদুর দিতে লাগলো। এলো চুলে সিঁথিতে ও কপালে সিন্দুরের রক্তে রাঙা আর চোখের জলে ধোয়া মুখখানার দিকে চেয়ে আমার চোখের জলও আর বাধা মানলো না। অশ্রুভরা চোখে পাখাটী তার দিকে চেয়ে দেখি, একি! তার মুখে যে হাসি। আমার বন্ধুর সিঁথির দিকে ডান হাতখানি তুলে যেন বোল্লেন "চিরায়ুষ্মতি ভব।" বার বার চোখের জল মুছে ভাল কোরে দেখি হ্যাঁ তাতো বোলেছেন ঐ তো হাসি মাখা মুখ চোখে স্নেহ ধারা। এমন সময় হঠাৎ কয়েকটী ছেলে এসে বন্ধুকে ডেকে নিয়ে গেল সে টলতে টলতে পাগলের মত চলে গেলো। খানিক পরে আনন্দের কলরবে চেয়ে দেখি উৎসাহী ছেলের দল কোমরের গামছা খুলচে আর বোলছে আশ্চর্য্য মানুষটা কি কোরে বেঁচে গেলো! তার দিকে তাকিয়ে দেখি তার মুখেও হাসি। আর একবার লুটিয়ে আমি বলি—

"সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে
শরণ্যেত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে।"

———

স্বপ্ন বাসর

মীরা দেবী

লক্ষ্মীটি খুলে ফেল তোমার ঐ সব জরির-জরু সোনার গহনা। আজ আমি তোমায় সাজাব ফুলের গহনায়। যেমন ক'রে সাজিয়ে ছিলাম ফুলশয্যার রাতে।

আবেশে চোখ দুটো বন্ধ করে আসে অসীমার, ধরা গলায় বলে—"আমায় তুমি এত ভালবাস কেন বলতো! আমায় সাজিয়ে কি তোমার আশ মেটেনা?"—

—না রাণী তোমায় সাজিয়ে সত্যিই আমার আশ মেটেনা। তুমি যে আমার পূর্ণিমা। আমার বসন্তের রাণী।

অপরূপ সাজে সাজিয়ে তোলে সুবিমল অসীমাকে। তারপর নিজের হাতে ঠাণ্ডা কফি তৈরী করে অসীমার মুখের সামনে তুলে ধরে। অসীমা ব্যস্ত হ'য়ে বলে, "একি তুমি কেন কষ্ট করতে গেলে?"

"কি হয়েছে তাতে? আজ তোমায় একটুও কাজ করতে দেবনা। মনে আছে আজকের তারিখটা; আজ থেকে ঠিক এক বছর আগে তোমায় আমি পেয়েছি। সেদিন তো তুমি কোন কাজের মধ্যে ব্যস্ত ছিলেনা সীমু! তোমায় ব্যস্ত হতে দেবনা।

শুয়ে শুয়েই হাত বাড়ায় অসীমা। সুবিমলের হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে বেশ আরাম করেই খেতে থাকে ঠাণ্ডা কফি। ওটা অসীমার বড় প্রিয় পানীয় ঘুমে চোখ ঢলে আসে তার। এমন ঘুম তো কোন দিনও পায়না। এমন সুন্দর ক্ষণে কেন অসিক ঘুম আসে। আজ কিছুতেই ঘুমোবে না সে কিন্তু সেই প্রথম রাতে ঘুমে ভেঙে পড়ে অসীমা। সমস্ত শরীরটা অবসন্ন করে দিয়ে, সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন করে একি ঘুম আসে—কিন্তু বড় বধূর। সুবিমলের বুকের ওপর মাথাটা এলিয়ে দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে। সুবিমল অতি সাবধানে ডাকে "সীমু! সীমু! সীমু ঘুমিয়ে পড়েছ?"

* * *

চোখ মেলে চেয়ে অবাক হ'য়ে যায় অসীমা। কিছু বুঝতে পারে না। স্বপ্নের ঘোর এখনও কাটেনি তার। কিন্তু চারিদিকে এতসব আবছা মূর্ত্তি কেন! কারা যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে তাকে চারিপাশ থেকে ঘিরে। ফিস্ ফিস্

ক'রে কথা বলছে কেন সব? মাথাটা তার ভার লাগছে। সারা গায়ে একটা আড়ষ্ট যন্ত্রণা। তাড়াতাড়ি উঠে বসতে চায় অসীমা কিন্তু কে যেন তাকে ধরে শুইয়ে দেয়। কি রকম একটা অসহায় অবস্থা বোধ ক'রে সে! নার্স কেন তার সামনে? কি হয়েছে তার? হঠাৎ মরিয়া হয়ে চিৎকার করে ওঠে অসীমা—"কি হয়েছে আমার বল শীগগির।"

নার্স ব্যস্ত হ'য়ে এসে বলে—"উঠবেন না দিদি আপনি এখনও খুব দুর্বল।"

"কেন আমি দুর্বল?"

"বলছি! একটু সুস্থ হোন।"

"সুবিমল কোথায়? আমার স্বামী! তাঁকে তো দেখছি না।"

"কৈ আপনার স্বামীকে তো একবারও এখানে দেখিনি দিদি।"

চিৎকার করে ওঠে অসীমা—"মাসীমাকে ডাকুন।"

মাসীমা আসেন কিন্তু বড় ক্লান্ত তিনি। অসিমার সামনে এসে বসেন। একদৃষ্টি অসীমা চেয়ে থাকে সুবিমলের মাসীমার চোখের দিকে। মাসীমার দুটি চোখে জল টলমল করে ওঠে।

"মাসীমা! সে কোথায়?"

"ওরে হতভাগী! সে ভালই আছে।"

"সে ভাল আছে তবে আমায় হতভাগী বলছ কেন?"

"তুমি সেরে ওঠো মা। তারপরে সব কথা শুনো।"

নার্স এসে জানিয়ে দিল। ডাক্তার বাবু এসেছেন। অগত্যা সব প্রশ্ন উপস্থিত মেয়ে থাকল।

ডাক্তার এসে প্রশ্ন করেন, "কি খেয়েছিলেন কাল রাত্রে?"

"কেন, রুটি খেয়েছিলাম।"

"রাতে কি সব দিন শুধু রুটি খেয়েই থাকেন?"

"না তাও খাই কিন্তু বড্ড ঘুম পেয়েছিল। রুটি খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ি। তারপর আর উঠিনি বোধ হয়।"

"শরীর খারাপ বোধ করছিলেন কি?"

"নাতো। কিন্তু আজ বড় দুর্বল লাগছে"।

"দেখুন মিসেস্ মিত্র! আমাদের কাছে লুকাবার চেষ্টা করবেন না। মিছিমিছি কেন পুলিশের ঝামেলায় যাবেন। আমি ডাক্তার, আমার কাছে লুকোবেন না। বলুন ব্যাপারটা খুলে কি হয়েছিল। জানেন কত বড় অপরাধ আপনি করতে চলেছিলেন। ভাগ্য ভাল ডোজটা পরিমাণ মত ছিলনা।"

অবাক বিস্ময়ে ক্যাল্ ক্যাল্ ক'রে চেয়ে থেকে অসীমা বলে—"আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন, না, আমি পাগলা গারদে এসে পড়েছি?"

পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার ক'রে ডাক্তার বাবু দেখান অসীমাকে। "মিসেস্ মিত্র এরপরেও কি আপনি অস্বীকার করবেন?"

তারই নিজের হাতের লেখা।

"তুমি কেন চলে গেলে? হলই বা নতুন চাকরী। আজ রাতে না গেলেই কি নয়? চলে যাবেই বলে বুঝি আমায় এত সাজালে? বেশ যাও ফিরে এসে আমায় আর দেখতে পাবে না। আমি চাইনা ঐশ্বর্য্য, চাই তোমায়! তুমি কাছে থাকলেই হল কি হবে অত টাকায়। অত আরাম বিলাস আমার সহ্য হবে না। বেশ ফিরে এসে দেখবে আমি নেই। যখন ফিরে এসে দেখবে আমি নেই তখন টাকার বুড়ি নিয়ে বুকে আগলে বসে থেকো। ইতি—তোমারই অবহেলার অসীমা"

একি? কিছুই মনে করতে পারে না অসীমা। কৈ সুবিমলের তো কোথাও যাবার কথা ছিলনা। এ চিঠি তো সে লেখেনি অথচ হাতের লেখা তো তার নিজেরই। আবার যেন ঝিম্ ঝিম্ করে ওঠে তার মাথাটার মধ্যে। চেতনার সমস্ত স্নায়ুগুলো মুচড়ে মুচড়ে উঠে এক অব্যক্ত যন্ত্রণার সৃষ্টি করে তার ভারাক্রান্ত মাথাটার মধ্যে।

• • •

মাসীমার অক্লান্ত সেবার আর যত্নে ধীরে ধীরে সেরে ওঠে অসীমা। কিন্তু কোথায় যেন ছন্দঃপতন ঘটেছে। সেরে উঠেছে সে দেহে। কিন্তু মন একেবারে খালি। অসীম শূন্যতার একটা নিঃসঙ্গ অবস্থা। পাগল হয়ে গেল নাকি সে? চারিদিকেই একটা চাপা গুঞ্জন। তাকে দেখলেই সবাই থেমে যায়। কেমন এক চাপা

সকলের চোখেই যেন একটা অস্ফুট জিজ্ঞাসা। কোথায় গেল মানুষটা সেই সুবিমল? একটা বছর যার অবিচ্ছিন্ন সান্নিধ্যে কেটে গেছে তার রঙীন দিন রাত্রিগুলি। মাঝে মাঝে অবশ্য দু'এক দিনের জন্য কোথায় যেন উধাও হয়ে যেত সুবিমল। জিজ্ঞাসা করলে তাকে আদর করে বলতো—"কেন সন্দেহ হচ্ছে?"

শিউরে উঠতো অসীমা ও কথা শুনে—ছিঃ ছিঃ কিযে বল তুমি আমাকে এত ছোট ভাব! মাসীমাকে জিজ্ঞাসা করে কোন উত্তরই পায় না।

• •

সংসারের কাজে একটু একটু করে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে অসীমা সময় কাটাতে চাইতো? অনেক দিন পরে কাপড়ের আলমারীটা খোলে। ঐ আলমারীতেই থাকতো গহনার বাক্স। একি একখানিও গহনা নেই? ভাল সাড়ীগুলোও নেই। কি হল? তবে কি মাসীমা তাকে সারিয়ে তুলবার জন্য ঐগুলোর সদ্ব্যবহার করেছেন? ছুটে যায় তাঁর কাছে। মাসীমা চুপ করে মাথা হেঁট করে রইলেন। কেটে পড়ে অসীমা। "অত ভয় না দেখালেই পারতেন মাসীমা। কি দরকার ছিল অত ঘটা ক'রে আমার চিকিৎসা করার। জানেন না? প্রত্যেকটির ডিজাইন যে তারই পছন্দ করা। কত দুঃখ পাবে ফিরে এসে যখন সে শুনবে যে তার পছন্দগুলো নির্দ্বিধায় অস্বীকার ক'রে বসে আছি।"

মাসীমা একটি কথারও জবাব দেন না। আশ্রয় নেন পুজোর ঘরে। সে বেলার মত সে ঘরের দুয়োর আর খোলেনা।

• •

দেখতে দেখতে দীর্ঘ একটা বছর পার হয়ে গেল। সুবিমলের কোন খবরই পাওয়া গেল না। নিশ্চয়ই কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে। কাগজে খবর পাঠায় অসীমা। পুরস্কার ঘোষণা করে কিন্তু কোন ফলই পাওয়া যায় না। এদিকে দিনও আর কাটেনা। বাড়ীর অর্দ্ধেকটা অংশ ভাড়া দেওয়া হয়েছে। সমস্ত অভ্যাসগুলোকে যতদূর সম্ভব সঙ্কুচিত করে ফেলেছে অসীমা তবুও আর টানা যায় না। মাসীমার কাছে গিয়ে হাত পাতে অসীমা "মাসীমা আমার তো সবই গেছে তোমার গলার হিরেটা যদি দাও তো এক মাসের জন্য বাঁধা দিই। এর মধ্যে একটা উপায় হবেই। খুলে বরখাস্ত পাঠিয়েছি। ছরে যাবার সম্ভাবনাই বারো আনা।" গলার ওপর থেকে কাপড়টা সরিয়ে ফেলেন মাসীমা। শীর্ণ কণ্ঠা দুটো নির্ম্মম ঘৃণা দেয় অসীমার চোখে। সাদা হাতীর দাঁতের মত করসা গলাটা একেবারে খালি। ঠিক যেমন খালি তার মনের ভেতরটা। মনের ভেতরকার শূন্যতা মাঝে মাঝে বাধা পায় বলবার সঙ্কোচে। তেমনি সাদা শীর্ণ গলাটার ওপর ধব্‌ধবে খান দুতিনটার পেঁচিয়ে থাকা মনে করিয়ে দেয় সব খোওয়া যাওয়ার হতাশা। তবু দিন কেটে যায় দুই অসহায় শাশুড়ী বৌয়ের। একজনের ভবিষ্যৎ আর একজনের বর্ত্তমান শূন্যতায় ভরা।

• • •

রংপুর থেকে অমলাদি এসেছেন হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে অসীমার ডিউটি তাকে দেখাশুনো করার।

কথায় কথায় অমলাদি অসীমার জীবনের সবটুকু জেনে নিলেন। বছর দুএক বাদে অসীমা জানতে পেরেছিল যে সুবিমল বিয়ে করেছে তাকে যাকে সে আগে থাকতেই ভালবাসত। টাকার গরবে সেই মেয়ের বাবা সুবিমলকে কিনিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, যে উপযুক্ত সাড়ী ও গহনা দিয়ে যদি সুবিমল কোন দিন সাজিয়ে নিয়ে যেতে পারে তার মেয়েকে তবেই বিয়ে দেবেন তার মেয়ের সঙ্গে। অধ্যবসায় আছে বৈকী সুবিমলের দীর্ঘ একটি বছরের সাধনায় নিজেকে সেই মেয়ের উপযুক্ত করে তুলতে পেরেছিল। এ কাহিনী জানতে পারার পর সেরাতের সেই অদ্ভুৎ চিঠিটার রহস্য পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল অসীমার কাছে।

অমলাদি প্রশ্ন করেছিলেন কেন নার্সের জীবন বেছে নিল অসীমা! তার উত্তরে সে জানাতে চেয়েছিল যদি কোন দিন আহত বা রুগ্ন হয়ে আসে সেখানে তাহলে একটি বারও তো সে তাকে দেখতে পাবে! সেবা করার সুযোগ পাবে। এই কথাই সে বলতে চেয়েছিল কিন্তু বলা হোলনা। মা না হবার দরকার নেই, সে রকম দেখার মত জীবনে অন্তত যেন না হয় সুবিমল ভগবান তাকে দুঃখ

রাখুন। এত কথা ভেবেছিল অসীমা কিন্তু কোনটাই প্রকাশ করে বলতে পারল না। মনের ভুলে কিছু না বলে মাসিমের শিশিটা তুলে নিয়েছিল হাতে করে, সেটা ফেলে পরে মৃত্যু অবধি। শিশিটা হাতে ক'রে দোলাতে দোলাতে চলেছিল অসীমা, যদি সুবিমল অসুস্থ হয়ে কোন দিন হাসপাতালে আসে তাই।

কি সর্বনাশ বিবর্ণ হয়ে যায় অবলাদির মুখ। স্টাফ নার্সকে ডেকে অনুরোধ জানায় তার স্বামী মিঃ মিত্রকে তখুনি ফোন করে দিতে যে তার ওখানে আসার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি যেন কোন মতেই তাকে দেখতে না আসেন। আরো অনুরোধ করে ছিলেন সেই দিনই যেন তাঁকে ঐ হাসপাতাল থেকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। হঠাৎ সেই অতি আবেদন স্তম্ভিত করেছিল হাসপাতালে নার্সকে এবং অবলাদির স্বামীকে। আর অবলাদির সেই আকুলতা দেখে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল নার্স অসীমা একদিন যে ছিল মিসেস্ মিত্র।

সাম্প্রতিক সাহিত্য ও সমালোচনা

(প্রবন্ধ)

গোপাল কৃষ্ণ রায়

বাংলা সমালোচনা সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্য সমালোচনা এই দুয়ের মধ্যে বেশ খানিকটা প্রভেদ আছে। বাংলা সমালোচনা সাহিত্য শতাধিক বৎসরের ঐতিহ্য মণ্ডিতও নয়—আর বাংলা সাহিত্য সমালোচনা সে বোধহয় রবীন্দ্রনাথই প্রথম ব্যাপক ভাবে সুরু করেন। সুতরাং তার ইতিহাসও স্মরণ কালের পর্য্যায়ভুক্ত। যদিও আমরা পাই অন্ততম প্রাচীন পত্রিকা "Friend of India" ও "সমাচার দর্পণে" দু একটা পুস্তক পরিচয় প্রকাশিত হ'তো—তাকে ঠিক সমালোচনা সাহিত্য বা সাহিত্য সমালোচনা বলা চলে না। তবে এই ভেবে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় যে তখন বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস, কবিতা ও ছোট গল্পের জন্ম হয়নি বা বাংলা সাহিত্য এত শাখা প্রশাখা বিস্তার করে পত্রে পল্লবিত আর পুষ্পে পুষ্পিত হ'য়ে ওঠেনি। তাতেই মনে হয় বাংলা সমালোচনা সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্যের সমালোচনার অতীত উদাহরণ উল্লেখযোগ্য নয়। তবে যখন থেকে ইংরাজী শিক্ষার আলো বিকীর্ণ হ'তে সুরু করলো তখন থেকে বাংলা সাহিত্যেরও সমালোচনা সৃষ্টি হতে লাগল। ঈশ্বর গুপ্ত, টেকচাঁদ ঠাকুর, কালিপ্রসন্ন সিংহ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ায় আলালের ঘরে দুলাল, হুতোম প্যাঁচার নক্সা, তিলোত্তমা কাব্য প্রভৃতির মধ্যে সমালোচনার রসদ লক্ষিত হতে সুরু করল।

ইংরাজী শিক্ষার জন্যে কেউ কেউ সমালোচনার প্রয়াসী হ'য়ে উঠেছিলেন—কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের 'প্রভাকর' পত্রিকায় তার বিরোধিতা চলেছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি (১৮৪৪ খৃঃ) Calcutta review বের হয় এবং তাতেই ইংরাজী ভাষায় বাংলা সাহিত্যের কিছু কিছু সমালোচনা প্রকাশ পেতে সুরু করে। 'সোম প্রকাশ' ও 'রহস্য সন্দর্ভ' পত্রিকাতেও বাংলা সমালোচনা কিছু কিছু প্রকাশিত হ'ত।

১৮৭১ সালে বঙ্কিমচন্দ্র Calcutta reviewতে বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা লিখতে সুরু করেন। তারপর ১৮৭২ সালে 'বঙ্গ দর্শন' পত্রিকা প্রকাশিত হবার পর বাংলা সাহিত্য সমালোচনার নতুন যুগ সুরু হয়। এবং পরবর্তী-কালে 'ভারতী' ও 'সাধনা' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ তাকে প্রাণবন্ত ক'রে তোলেন। মোট কথা বাংলা সাহিত্য সমালোচনা বঙ্কিমচন্দ্র সুরু করেছিলেন—আর রবীন্দ্রনাথ তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন। এবং পরে ধীরে ধীরে

রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে বেশ একটা সমালোচনা চক্র গড়ে উঠেছিলো।

'সবুজ পত্রের' সৃষ্টি হয়েছিল তখন। আর সেই 'সবুজ পত্রে'র যুগে প্রমথ চৌধুরী, অতুল চন্দ্র গুপ্ত, অমিত কুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি নিজেদের মতবাদ প্রচার করতে সুরু করলেন। মোহিত লাল, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার সেন প্রভৃতি অধ্যাপক বৃন্দ বাংলা সাহিত্য সমালোচনার কলেবর বৃদ্ধি করলেন।

সমালোচনা সাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধি হ'ল বটে কিন্তু সমালোচনার পদ্ধতি এমন বিভিন্ন রকম হ'য়ে উঠল যে, সমালোচনার গতি বোঝা বিপজ্জনক হয়ে উঠলো। যাইহোক আমার বক্তব্য সাম্প্রতিক সাহিত্য সমালোচনা নিয়ে।

বর্তমানে বাংলা সাহিত্য বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে আপন আসন প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে বলে আমরা দাবী করি। যদিও তা সাধিত হয়েছে রবীন্দ্র নাথকে দিয়ে। তাই ব'লে একথা আমি বলছিনে যে, বর্তমান সাহিত্যিক-দের রচনা বা বিশ্ব সাহিত্য দরবারে স্থান পেতে পারে না! বরং বলবো, বর্তমান লেখকদের অনেক এমন উপন্যাস আছে যা বিশ্ব সাহিত্যের ভাণ্ডারে স্থান লাভ করতে পারে। কিন্তু এখানে বলবার বিষয় সেই উপন্যাস খানাকে কে তুলে ধরেছেন বিশ্বের সাহিত্য দরবারে? এখানে প্রশ্ন ওঠে তারা নিয়ে। সকলেই বুঝতে পাচ্ছেন এ কাজ সম্ভব হ'তে পারে একমাত্র ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে। বাংলা সাহিত্য ক্রম বিস্তারের পথে। সাহিত্যের নানা শাখায় অসংখ্য রচনা প্রকাশিত হ'চ্ছে—তার সঙ্গে তুলনামূলক ভাবে সমালোচনা সাহিত্য বা সেই সব সাহিত্যের সমালোচনা হচ্ছে না। লেখকের বক্তব্য বিষয় বিচার করে নানা দিকের কথা চিন্তা করা যাচ্ছে না। ধরতে গেলে সমালোচনা একরূপ উঠেই গেছে।

লেখকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় রচনার সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে বেশী। যদিও এটা যে কোন দেশের সাহিত্যের পক্ষে শুভ লক্ষণ। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল সেই সব রচনা পাঠ করবার সময় পাঠকের নেই - অথবা পাঠকের সংখ্যাও বোধহয় কমে গিয়েছে। আর নতুন লেখকের লেখা—(গল্প কবিতা উপন্যাস) যাই-ই হোক পাঠকবর্গ সযত্নে পরিহার করে চলেন। এতে করে শুধু নতুন সাহিত্যিক-দের লেখার অমর্যাদাই করা হয় না। বস্তুতঃ সাহিত্যের নতুন পথ প্রসারিত করার বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়। আর সেই জন্যেই সাহিত্যের সমালোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ সমালোচকেরা লেখকের সাহিত্য প্রতিভার সম্যক স্ফুরণের পথ সুগম করে দিয়ে থাকেন। পাঠক যেমন নতুন লেখকের লেখা সযত্নে পরিহার করে চলেন—সমালোচকেরা যদি সমালোচনা না করেন—তা হলে অনেক ভাল লিখেও লোক চক্ষুর অন্তরালে থেকে যাচ্ছে। কালক্রমে হয়তো তার সাহিত্য প্রতিভা এবং লেখক সত্তা আঁধারের অতলে কবরস্থ হয়ে যাবে। কিন্তু সমালোচনা হলে আর পাঠকেরা পড়লে হয়তো তার স্থান অবিস্মরণীয় হতে পারতো। সত্যিকারের সমালোচনার অভাবে অনেক সাহিত্য ও সাহিত্যিক আলোকপ্রাপ্ত হচ্ছে না।

বাংলা সাহিত্য যতই সমৃদ্ধিশালী হোক না কেন—সমালোচক ও সমালোচনার অভাবে অনেক কাঁচ হীরা হ'য়ে যাচ্ছে—আর হীরা তাজা কাঁচের টুকরার মত যত্রতত্র পড়ে আছে।

শত শত লেখকের রচনা সমৃদ্ধ হয়ে শত শত পত্রিকা বেরুচ্ছে বটে—কিন্তু কদাচিৎ চোখে পড়ে কোন লেখকের কোন বিশেষ বইয়ের সমালোচনা।

সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদকবৃন্দও সমালোচনাকে পরিহার করে চলেছেন। বরং তাঁরা আর্থিক দিক বিবেচনা করে সাহিত্য পত্রিকাতে কয়েকটা সিনেমার অভিনেতা অভিনেত্রীর সচিত্র জীবনী ছাপিয়ে অর্থনৈতিক হয়ে উঠেছেন। পাঠকবৃন্দের কাছে আশা করি পত্রিকা-গুলির নামের কিরিস্তি দিতে হবে না। একটু সজাগ দৃষ্টি নিয়ে দেখলে দেখা যাবে বহু বছরের সাহিত্য ঐতিহ্য সম্পন্ন পত্রিকাগুলিও এই সংক্রামক রোগের হাত থেকে রেহাই পায় নি।

'পুস্তক সমালোচনা নামে' কয়েকটা দৈনিক পত্রের সাপ্তাহিক সংখ্যায় কিছু কিছু সমালোচনা প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু তাকে সমালোচনা বললে নেহাৎই ভুল করা হবে। কারণ তাতে লেখার বিচার করা হয় কম, লেখকের পরিচিতির ব্যাখ্যা করা হয় বেশী। নতুন লেখকের কোন

হই "আশার বাণী" নিয়ে তাঁদের সামনে উপস্থিত হয় না। —পরিচিত লেখকের অনেক "বাবিশও" উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে হাজির হয়।

রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের সময়ে কোন কাগজে কারো কোন রচনা প্রকাশিত হলেই পরস্পরের সমালোচনা বার হত। আজকাল কোন পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পের সমালোচনা ব্যতীত সাহিত্য এবং সাহিত্যিক যে বড় হতে পারে না—আশা করি একথা আমার সঙ্গে আপনারা সকলেই স্বীকার করেন

বৈদেশিক সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, সেখানে অতীতেও যেমন সাহিত্য সমালোচনার ঢেউ ছিল—বর্তমানেও তা তিরোহিত হয়ে যায় নি। তাঁরা লেখক সৃষ্টির জন্যে সমালোচনা করেন—মোসাহেব অহেতুক গুণকীর্তন করে সমালোচনা সাহিত্যের অবমাননা করেন না।

সমস্যা কণ্টকিত বাংলা

সতীদেবী মুখোপাধ্যায়

আধুনিক পৃথিবীর জনসাধারণের জীবন যাত্রা সমস্যা-কণ্টকিত প্রতিপদেই মানুষকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। খাওয়া, পরা, বাসগৃহ, বিদ্যার্জন, জীবিকা ইত্যাদি কত রকম সমস্যাই না আছে।

বাঙালী সমাজকে সর্বাপেক্ষা বেশী এই সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। প্রতিটী সমস্যার ভারে বাঙালী আজ ভারাক্রান্ত।

দেশের আর্থিক অবস্থা সমাজ ব্যবস্থার মেরুদণ্ড। বিগত যুদ্ধের অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বাঙালী স্বীয় প্রতিভা-বলে গত মন্বন্তরের আরম্ভ পর্যন্ত মোটামুটি আর্থিক স্বচ্ছলতার ভেতর দিন কাটিয়েছে। কিন্তু তার পর থেকে অর্থনৈতিক কাঠামোর ঘুণ ধরেছে।

জাতিকে শক্তিশালী করে তুলতে হলে তার অর্থ-নৈতিক কাঠামো দৃঢ় করে গঠন করা প্রয়োজন। অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের দিকে কোনরূপ দৃষ্টি দেওয়া হয়নি বলেই পূর্বে যে বাংলা দেশ সর্বভারতীয় ব্যাপারে শীর্ষস্থানে অবস্থান করছিল আজ সেই দেশ এবং সেই দেশের অধিবাসী সর্ব ব্যাপারে পশ্চাতে পড়ে রয়েছে।

বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে বাঙালী তার নিজের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে।

বিদ্যায় বুদ্ধিতে বাঙালী জাতি অন্যান্য জাতির তুলনায় কোন অংশেই কম নয়। তবে তার অপরাধ কোথায়? কেন বাঙালী আজ চাকরী পায়না, বাসা খোঁজবার আয়গাটুকু পাবারও অধিকার তার থাকে না। অনেকে বলে থাকেন—এর কারণ বাঙালীর চারিত্রিক কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটী। শ্রম বিমুখতা, পরশ্রী কাতরতা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা স্বজাতি প্রীতির অভাব ইত্যাদি ত্রুটীগুলি বাঙালীর অগ্রগতির প্রধান অন্তরায় সৃষ্টি করেছে

কথাটা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না। তবে বাঙালী শ্রম বিমুখ সে কথা আজকের দিনে আর বলা চলে না। জীবিকা অর্জনের জন্যে বাঙালী আজ সকল রকম শ্রমসাধ্য কাজই করতে পারে বা অগ্রসর হয়।

দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং জাতি প্রীতির অভাবই আমরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখে থাকি। আর সেই জন্যেই বাঙালী আজ নিজ দেশেও কাজ পায় না, বাস করতে বাড়ী পায় না। বাংলা দেশে প্রায় সকল প্রকার উচ্চপদেই অবাঙালীদের নিয়োজিত করা হয়ে থাকে। অথচ বাংলা দেশ বেকার সমস্যায় নিষ্পীড়িত। শুধু উচ্চপদস্থ কর্মক্ষেত্রেই নয় সকল প্রকার চাকুরীর ক্ষেত্রেই বাঙালীদের দাবী সকলের শেষে বিবেচনাধীন। এই পক্ষপাতিত্বের জন্যে কেবল অন্যকে দায়ী না করে নিজেদের

অবাঞ্ছনীয় ত্রুটীগুলিকে সংশোধন করা বিশেষ প্রয়োজন। নিজেদের এই ত্রুটীর জন্যে বেশীরভাগ বাড়ীওলা বাঙালী ভাড়াটে না রেখে অবাঙালীকে ভাড়া দিয়ে থাকেন

প্রশ্ন করে জেনেছি—অবাঙালীরা বাড়ীওলাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে থাকে এবং তারা মাসিক ভাড়াও দেয় বাঙালীদের তুলনায় বেশী। তাই বাড়ী ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে অবাঙালীর অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে।

নিজ দেশে বাঙালী গৃহহীন হয়ে অশেষ দুর্গতি ভোগ করছে এই সকল জটীল জাতীয় সমস্যার সমাধান এক কথায় হবার নয়। এজন্য চাই পারস্পরিক সহযোগিতা ও শ্রেণী বৈষম্য নীতির কিছুটা বর্জন। আজ বাংলা দেশের সমস্ত নরনারীকে স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করে দেখতে হবে আমরা যানে এই মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। কোথায় দাঁড়ানো তার উচিৎ এবং কি উপায়ে সে স্বীয় মর্য্যাদায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

দীপ জ্বালি

রমেন্দ্র নাথ মল্লিক

শান্তির আশায় জীবনে সান্ত্বনা দিতে চাও তুমি যদি
কেমন করেই আমার মনের কথাগুলো জানে করি।
তোমার অন্তরে খেলা শুধু যেন আমাকে জীবন দেবে,
এ কথা জেনেছ ;—চলে যাই তবে সুখেরই হাত ধরি।

কিন্তু আমারই মন ঘরে যায় যদি তুমি আকাশের
তারার দিশেতে দিনে দিনে কত পরিচিতি খোঁজ সে কি
আমি তো বিরহ দহনে পোড়ানো খাঁটি সোনা হলে এক
হৃদয়ের ভিড়ে আমাকে তখন কোন কাজে আসবে কি ?

আমি তো জীবনে যত দীপ জ্বালি ঘরতো তোমার মনে
তত তার শিখা নেই কোনটিও　তবু একবার ঠিক
কানে শুনি যদি আগেকার কথা পরিচিত সুরে সুরে
তাল লাগে সত্যি ভালবাসা আসে আশার জোয়ারে নদী।

একটি দীপের শিখাই উজ্জ্বল আলোর খবর দেবে
সেখানের প্রাণে বিতানীর বিভা তালই অনেক ভেবে।

সমাধান

আদিত্যনাথ মিশ্র

হারানো চাঁদে খুঁজে কি হবে বলো এ অন্ধরাতে,
একটি মুঠো আলোর তরে এত কাকুতি কেন !
আকাশে তারা এখনো আছে। জোনাকী জ্বলে কেন ?
প্রেমের রীতি এইতো। তবু স্মৃতির জানালাতে
জেগেই থাকি। শূন্যতাকে ভরিয়ে দিতে গিয়ে
মোহিনী রাতে গোপন কথা তুমি যা বলেছিলে
সে কথা ভাবি। মনটা ছুঁয়ে মন বেদনা নীলে

তোমার সোহাগ আসে ও হাসে সোনালী আভা মিছে।
উদাসী চোখে বাহিরে চেয়ে স্বপ্নবতী রাতে
এখনো জেগে থাকো তা জানি। অন্তরমিশ্রাতে
বলবে নাকি, 'সইব কত যন্ত্রণা দুখ বুঝে ?'
ঘর তো তুমি দেখছো নাকো—এই যে সুদূরগামী
ভাবনাগুলো যোগফলে যা দিয়েছে সে তো আমি।

একালের মন

হিরণ্ময়ী বসু

একেবারে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল প্রেমেনের সঙ্গে ছন্দার। পুজোর বাজার করতে বার হয়েছিল দুজনেই। দুজনেই দুজনকে পেয়ে খুসির বন্যা বইয়ে দিলে। হকারস্ কর্নারের পেছনে গোলদীঘির একটা বেঞ্চিতে বসে অনর্গল বকে চলল চিনে বাদাম আর কাবলি মটর-আলার প্রায় আট আনার বিক্রি হল।

অনেক বছর পর দেখা, প্রায় পনেরো, ষোল হবে, কাজেই বয়েসের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে ওদের মনটা এখন অনেক দূর এগিয়ে গেছে; তবু সেই কৈশোরের আনন্দ মাখানো দিনগুলোর স্মৃতি রোমন্থন করতে ভারী ভাল লাগল।

দু'জনেই দু'জনের কাছে প্রতিশ্রুতি দিল, এবার আর কেউ কাউকে হারিয়ে ফেলবে না। হারানোর ভয় অবশ্য ছিল না, কারণ প্রথম জীবনে এমন কোনো অঙ্গীকারের প্রয়োজন হয়নি—যাতে আজ নতুন করে উভয়কে পাওয়ার আনন্দটা তৃতীয় কোন পক্ষের ভয়ে অস্বীকার করতে হবে। সাদামাটা বন্ধুত্ব, যার শিকড়টা চিরকাল বায়ুভুক উদ্ভিদের মত ভেসেই থাকে।

এই দেখা হওয়ার পর ছন্দা তাদের বাড়ীতে বিশেষ এক ব্যাপারে নিমন্ত্রণ জানাল প্রেমেনকে। হাতের গোড়ার পোষ্টকার্ড ছিল না, তাই কোনটাই তুলে ধরল।

ওপক্ষে প্রেমেনের স্ত্রী রমা ফোনের রিসিভারটা তুলে নিল।

—কে কথা বলছেন?

ছন্দা—আপনি কে কথা বলছেন?

রমা—তাতে প্রয়োজন কি? আপনি কাকে চান—আর কে তাই বলুন।

ছন্দা একটু ইতস্তত: করে বলল—হ্যালো, আমি প্রেমেন বাবুকে চাই।

রমা—আপনি প্রেমেন বাবুর কে হন? আপনার নাম কি?

ছন্দা—সহপাঠিনী। প্রেমেনকে বলুন ছন্দা ডাকছে তাহলেই বুঝবে।

রমা—কি বুঝবে? (গলার স্বর গাঢ় হয়ে উঠল) আপনাদের এই বোঝাবুঝি চলছে কতদিন, জানতে পারি কি?

মহা মুস্কিলে পড়ল ছন্দা—অথচ এখন যদি রিসিভারটা রেখে দেয় তাতেও সমূহ বিপদ। তাই আমতা আমতা করে বলল—আপনি বুঝি প্রেমেনের বউ রমা?

তাচ্ছিল্যের স্বরে উত্তর দিল রমা—সে খবরও পৌঁছে গেছে দেখছি। আচ্ছা ওঁর অনেক সহপাঠিনীর নামই শুনেছি, কিন্তু আপনারটা শুনিনি কেন?

ছন্দা—কি করে শুনবেন? এত কাল কোন যোগাযোগ ছিল না তো, সেদিন ভাগ্যি দেখা হয়ে গেল।

রমা—সিনেমায় বুঝি?

ছন্দা—সিনেমায় নয়—কলেজ স্কোয়ারে।

রমা—বুঝেছি, সেদিন উনি রাত দশটায় বাড়ী ফিরলেন। আচ্ছা, অনুগ্রহ করে বলবেন কি এ রকম আপনাদের কতদিন ধরে চলছে?

ছন্দা—কি মুস্কিল আপনি তো দেখছি বড় অবুঝ মানুষ? বললামই তো, আগে কোনদিন দেখা হয়নি।

রমা—হাঁ এখন তো আমি অবুঝ হবোই। যখন বুঝবার মানুষের হদিশ পেয়েছেন তখন আমার স্বামী আমাকে এবার বাতিল করে দেওয়ার যেটুকু অপেক্ষা।

ছন্দা—আহা—হা! আপনি পাগলের মত কি বলছেন এসব? প্রেমেন শুনলে কি ভাববে বলুন তো?

রমা—শোনাচ্ছে কে, শুনি? স্বামীর মেয়ে বন্ধু সে কি না—যা নয় তাই বলে যাচ্ছে, অবুঝ—পাগল বোঝশক্তি কম। তা আপনার শক্তি পরীক্ষাটা আমার ঘরের ওপর দিয়ে না চালিয়ে অন্যত্র চেষ্টা করলেই তো পারতেন। তাহলে কোন হাঙ্গাম হত না।

এবার রীতিমত চটে উঠল ছন্দা। রাগত ভাবে বলল—আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য নীচু মন আপনার। বন্ধু যদি বন্ধুকে ফোন করে তাতে দোষটা কি শুনি? আপনার ঘর বর, কোনো ব্যাপারেই হাঙ্গামা বাধাবার স্পৃহা নেই আমার। কেবল একটা অনুরোধ জানাবার জন্যেই প্রেমেনকে আমার ফোন করা। তার জন্যে যে এত জবাবদিহি করতে হবে, মোটে ভাবতেই পারিনি। ধন্য মেয়েলি মন বাবা মেয়েদের। আজকের যুগেও এত সঙ্কীর্ণতা?

রমা—চমৎকার! আপনিই বা তাহলে মেয়ে হয়ে পুরুষের মন পাচ্ছেন কি করে শুনি? মেয়েদের মনটাই শুধু সঙ্কীর্ণ নয় বুঝলেন? পুরুষেরাও পর স্ত্রীর স্বাধীনতা যতখানি পছন্দ করে নিজের ঘরটির সম্বন্ধে ঠিক ততখানি সঙ্কীর্ণ। লেখাপড়া শিখে নিজের জাতকে ছোট করতে পারে যে মেয়েরা তাদের বিশ্বাস নেই। তারা কি না অনুরোধ জানাতে পারে?

ছন্দা—(অসহিষ্ণু ভাবে) আপনাকে বিশ্বাস করানো আমার সাধ্যাতীত! মাপ করবেন, প্রথম পরিচয়ে এত কটু আলাপ করবার আমার ইচ্ছা ছিল না। যাইহোক প্রেমেন এলে বলবেন দয়া করে। সমস্ত ব্যাপারটা খুলেই বলবেন তাহলে সে বুঝতে পারবে।

রমা—(ব্যঙ্গের সুরে) আমি আর খুলে কি বলব বলুন? খোলাখুলি কথাবার্ত্তা আপনারা তো আগেই সেরে রেখেছেন। তা নইলে এই ষোল বছর পর পুরোনো বন্ধুত্বের ঢেউ টেনে কেউ আবার পুরুষ বন্ধুকে কোনো অনুরোধ জানায়? আপনি নিশ্চয় অপিসে চাকরি করেন?

ছন্দা—হাঁ হাঁ আপনিওতো দেখছি—শুনেছেন আমার কথা।

রমা—আজ্ঞে না, কথার আন্দাজে ধরে নিতে হয়।

ছন্দা—ধরতে আপনি কিছুই পারেন নি, পারলে অযথা এতক্ষণ বাজে কতকগুলো কথা শোনাতেন না।

রমা—শুনুন তবে পেরেছি কি না। আপনার এখন একটা ব্যবস্থার চেষ্টা করছেন, তাই না? যদি অনুমতি করেন তাহলে বরং আমি একটা পাত্র দেখে যা হোক বিলি ব্যবস্থা করতে পারি।

ছন্দা—ধন্যবাদ তার দরকার হবে না রমা দেবী। আপাততঃ আপনার উর্বর মস্তিষ্কের প্রশংসা না করে থাকতে পারছি না। ভবিষ্যতে আর কখনো প্রেমেনকে দেখলেও কথা বলছি না। বাবা! সন্দেহ ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ নিয়ে ঘর করা? বেচারা প্রেমেন!

রমা—ওরে বাবারে বাবা, এমন মেয়েও হয় নাকি? স্ত্রীর কাছে তারই স্বামীর জন্য দরদ প্রকাশ? আজকালকার মেয়েরা কি মেয়ে, না ডাকাত? কি মন যে বাবা! আসুক আজ বাড়ী একবার, মজাটা টের পাইয়ে দিচ্ছি!

ছন্দা—মনটা এ কালের বটে কিন্তু ভুল করবেন না—বয়েসটা তা নয়। বাবা! আপনার মত স্ত্রী যেন ভবে মানুষের না হয়।

রমা—(সহাস্যে) আপনি তো আর কারো স্ত্রী হতে পারেন নি, তাহলে না হয় আপনার কাছেই যোগ্য স্ত্রী হওয়ার ধরণটা শিখে নিতাম।

ছন্দা—(রাগতভাবে) স্ত্রী হতে পারিনি মানে? ও খুসি তাই যে বলে যাচ্ছেন? আমার মত স্ত্রী ক'টা মানুষে পায় শুনি? আমি কোনোদিন আমার স্বামীর বান্ধবীদের অবত্ন করি না—তাঁরা আমারও বন্ধু।

রমা—এ্যাঁ, কি বলছেন কি? আপনি বিবাহিতা? আপনার স্বামী সংসার আছে? ছেলেমেয়ে? ইস্ আগে যদি বলতেন তাহলে তো এত কাণ্ডই হত না। তা যাই হোক, আপনার বন্ধু এলে আমি সব বলব, কিছু লুকোবো না। উপস্থিত আমারও এক বিশেষ বন্ধু এসেছেন তিনিও নাকি আপনাকে চেনেন, এক কলেজেরই বন্ধু বোধহয়।

ছন্দা—সে কি! আপনারও বন্ধু আছে? আমাকেও চেনেন? নামটা কি বলুন তো দেখি?

রমা—তিনি নিজেই কথা বলবেন, আপনি ধরে থাকুন।

ছন্দা—হ্যালো কই? কে আপনি? কি নাম বলুন তো?•

আগন্তুক—আমি গো, আমি নীলুর বাবা।

ছন্দা—ছিঃ! আমাকে লুকিয়ে ওখানে যেতে তোমার লজ্জা করেনি? প্রতিদিনই যাও বোধহয়? রাগে দুঃখে রিসিভারটা সশব্দে নামিয়ে রাখল ছন্দা। এতদিন লুকিয়ে রাখার কি প্রয়োজন ছিল? ছন্দার মন তোমার রমার মত সেকেলে নয়। রমার মত স্ত্রীকে এত লুকোবার কি থাকতে পারে? ছিঃ! পুরুষদের বাস্তবিকই বিশ্বাস করা যায় না!

ক্ষয়িষ্ণু মন্দির

ধীরেন বসু, এম-এ

ক্রমবিকাশমান পূর্ণিমার চাঁদের আলোক-আভায় পূর্বাকাশ রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে। নগরীর অন্তঃস্তলের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিয়া যে প্রশস্ত রাজপথ গ্রামাঞ্চলে প্রবেশাধিকার পাইয়াছে, তাহার দুই পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন বিজলীর ঝাড় চক্ষের নিমেষে একসঙ্গে জ্বলিয়া উঠিল। সুকেশ কালো প্রশস্ত পথের অন্তরঙ্গ অবধি বিজলীকর আলো আসিয়া ছড়াইয়া পড়ে নাই; তথাপি বিচ্ছুরিত আলোক-সম্পাত আলোধারার অন্তরবর্তী ব্যবধানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সুদীর্ঘ একটানা এক্সপথের অন্তরদেশ আলোর প্লাবন সৃষ্টি করিয়াছে—চলমান যানবাহনের উচ্ছ্বসিত শিরালোকরশ্মি ক্ষণে ক্ষণে তাহার জ্যোতি ম্লান করিতেছে মাত্র।

একটানা পথ যখন নগরের প্রান্ত ছাড়াইয়া, বনাকুল ঘেঁষিয়া প্রান্তরদেশে আসিয়া পড়িয়াছে। বনানীর পাদদেশে জলভৃক্ত ছোট ছোট কয়েকটি ইরাণী পরিবার তাঁবুর তলায় গুটি গুটি সংসার পাতিয়াছে। কাঠখড়-পোড়ানো অগ্নিশিখা বিচ্ছিন্নভাবে ও বিভিন্ন ভঙ্গীতে লক্ লক্ করিতেছে। যাযাবরী জীবন। সন্ধ্যারোহের বালাই নাই, অথচ স্বাচ্ছন্দ্যের ভরপুর— রাতের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া এক দল ভিন্ গাঁয়ের লোক কথায় কথায় সড়ক পার হইয়া গেল। রাতের প্রহর কালের আবর্তনে প্রথম চক্র পরিক্রম করিয়া দ্বিতীয় চক্রের অনুসারী হইয়াছে। তাঁবুর অন্তরালে আবালবৃদ্ধবনিতা এরই মধ্যে নিদ্রাবশ। প্রৌঢ় গোষ্ঠীতে যুমের আয়োজন সন্নিবেশে আসবাবহীন বিছানার শূন্য স্থান পূর্ণ করিয়াছে বটে, তাহাদের ঘরোয়া কোলাহল বা কলকাকলি থামে নাই। কে কয়খানা বাঁশের ঝুড়ি বানাইয়াছে বা কার কয়খানা বেতের চেয়ার বিক্রী হইল, মুখে মুখে তাহারই অনুভাগ হইতেছিল। ...পশ্চিম সীমানার কোণের তাঁবুতে নির্বাক ও নির্লিপ্ত রিজিয়া চোখ বুঁজিয়া পড়িয়া আছে। শিবিরবাসিনীদের মধ্যে রিজিয়া অন্যতমা কিশোরী। বর্ধিষ্ণু দেহসৌষ্ঠব তাহার বয়সের পরিমাপ বরাবরই ছিনাইয়া চলিয়াছে। তাহার স্বাস্থ্যসম্পদ ও সৌন্দর্যমহিমা কচি বয়সের খেলার আসরে পর্যন্ত তাহাকে রাণীর আসন আগলাইতে অপ্রতিহত ক্ষমতা দান করিয়াছে। তাইতো, আজও তাহার শৈশবের সঙ্গীমহলে সে 'রাণী রিজিয়া' বা 'রীয়া'—আরও শিশুসুলভ সরলতা মিশ্রণে 'রিদিয়ানী' নামে অভিনন্দিতা। ...আজ দিনভর ক্লেশ করিয়া তাহার শরীর যতটা অবসাদগ্রস্ত না হইয়াছে, মন ক্লান্ত হইয়াছে তাহার তুলনায় বেশী। কাল একটা বেসরকারী পায়ে-চলা পথ মাটি দিয়া বাঁধাইবার কাজে তাহাকে বাহির হইতে হইবে, অনতিদূর সহরতলী অঞ্চলে। অভ্যাসানুযায়ী কুটিরশিল্প-কাজেই রিজিয়া নিপুণহস্তা—তবে, কায়িক পরিশ্রমের বিনিময়ে দিনমজুরীর কাঁচা পয়সা.....পরপ্রত্যুষের কর্মতাগিদ আসন্ন প্রদোষকালের সুনিদ্রায় তাই বারংবার ব্যাঘাত জন্মাইতেছিল।

উন্মুক্ত সূর্য্যালোক তখনও ভূমি স্পর্শ করে নাই। বেতের ঝোড়াগাছি ও হাতকোদালিটা ছট্‌কা টানে ছিনাইয়া লইয়া তাঁবু-বিতস্ত নির্জন সঙ্কীর্ণ পথ বাহিয়া রিজিয়া সদর রাস্তায় আসিয়া নিস্তব্ধে খানিক দাঁড়াইল। পথ-

প্রান্তে গ্যাসের আলো তখন দিনের আলোয় দীপ্তিহীন হইয়া আসিয়াছে। পথের নিশানা লইয়া পূর্ণ উদ্যমসহকারে কর্মস্থলে রিজিয়াই আসিয়া প্রথম হাজির হইল। অল্পকাল মধ্যেই দলবদ্ধ ইয়াসী মজদুর যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া আসর জমাইয়া বসিল। এইবার কর্মগুরুর পালা। মজদুরদের মধ্যে স্ত্রীর সংখ্যাই বেশী। স্থির হইল, বনানীর অশ্বত্থগাছের তলায় জমিটুকু হইতে মাটি কাটিয়া তোলা হইবে—ক্রমাগত অশ্বত্থপাতার ছায়া ভোগ করিয়া জমির ওই অংশ তুলনায় সিক্ত। ক্রমশঃ কয়জন থামিয়া কাজ আরম্ভ হইল।

রীয়া শিক্ষার্থিনী; সহকর্মীরা অভিজ্ঞ শ্রেণীমজদুর। কি বছর চৈত্রের প্রখর রৌদ্র গায়ে মাখায় করিয়া তাহারা কত নূতন নূতন পুকুর কাটে, কত বা নির্জলা পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করিয়া রূপান্তর করে জলাশয়ে—মুক্ত করে অন্তঃসলিলা; বর্ষাকালের ঢালা স্রোতে ধসিয়া পড়া রাস্তাঘাটে যোজনও দিয়া থাকে কতই না। অন্তর্বর্তী সীমা নির্দেশে রীয়া নিজের পালা পথ নির্ধারণ করিল—অনভ্যাসের অপলাপ তাহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিল না। পর্শরচিত গোলাকৃতি শিরপেচ্ ব্যবহারে সহকর্মীরা মাটিবৃত্তি কোড়ার বহুলাংশ আংশিক লাঘব করিল। রীয়া উৎসাহী হইলেও অনভিজ্ঞ। উপস্থিত, তাহার মুক্ত বেণী পাংশু কেশরাজির স্বর্ণাঞ্চল হাতে মুড়াইয়া কৃত্রিম চাকৃতি তৈয়ার করিবার প্রয়াস সে আপনা হইতেই লাভ করিল। প্রহরান্তে সূর্যতাপ প্রখর হইবার সঙ্গে সঙ্গে রীয়ার রক্তিম মুখমণ্ডল উত্তপ্ত ও নাসিকাপ্রান্ত সিক্তিত হইয়া উঠিল। তাই, শূন্য কোড়া পাল্টাইয়া মাটিবৃত্তি কোড়া গ্রহণের উদ্দেশ্যে আপনার শিরোদেশ আগাইয়া দিবার অবসরে ঘর্মাক্ত বাহুপাশের পুরোভাগে একবার মুখখানি ঘর্ষণ করিয়া লইল।

এইবার বিরামের কয়েক মুহূর্ত। গতিপথের সীমানা নির্দেশে যার যার কোদালি কি কোড়া ফেলিয়া রাখিয়া গোল বৈঠক তৈরী করিল। মিলিত বৈঠকে, জলপানের সামান্য পুঁজি হইতে যে যার অংশ ভোগ করিয়া ও-বেলার সঞ্চয় সযতনে আলাদা করিয়া রাখিয়া দিল। বিরামের ছলে পাঁচ দশ মিনিট বসিয়া কাটাইবার সময় তো আর নয়। শৃঙ্খলানুযায়ী আবার কাজ সুরু হইল।

পশ্চিম দিগন্তে সেদিনের বেলা হেলিয়াছে। মাটি কাটার কাজের অগ্রসর গতি ক্রমে মন্থর হইয়া আসিল; সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে না আসিতে সেদিনকার মত কাজ সাঙ্গ হইল। তালভাঙা কোলাহলের মধ্য দিয়া দ্রুতক্ষেপে ইয়াসী পরিবার তাঁবুতে ফিরিয়া আসিয়াছে রীয়া গতিচঞ্চলা হইলেও একটু পিছনে পড়িয়া গেল আনমনে কি ভাবিতেছিল যেন। হয়তো বা দিনভর ক্লান্তি স্বীকার করিয়া যে পথের গ্রন্থি জুড়িয়াছে তারই গ্রাম খুঁজিয়া ফিরিতেছিল। ক্রমশঃ নয়া সড়ক পার হইয়া নিঃসঙ্গ রীয়া যখন বনান্তরালে জোড়দীঘির কাছে আসিয়া পৌঁছিল তখন কালিসন্ধ্যা মিলাইয়া গিয়া রাতের ছায়া ঘনভাবেই নামিয়াছে। জোড়দীঘির একাংশে নলবনের কোপ এমনভাবে শিক্ত বাঁধিয়াছে, যেন রীয়া সহজভাবে ক্ষণকাল সেইদিকে তার কোমল দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতেও চমকিয়া উঠিল; হয়তো এখনই দেখিবে, কোন পক্ষরাজ দিনান্তের শিকারশেষে খাবার উপর ভর করিয়া অর্ধ উন্মীলিত নেত্রে জলস্থ চাহনি নিক্ষেপে জলাভূমির পরে বিশ্রামের আসন পাতিয়াছে। রীয়া ক্ষণেক নিশ্চলক থাকিয়া নিঃশব্দ বোধ করিল। বিপাশের দীঘির জল সম্পূর্ণ নিরাভরণ না হইলেও স্বল্প লতাগুল্মবহুল এবং স্থানবিশেষে ফুটফুটে। শুটিকতক জলপদ্মের অস্ফুট কুঁড়ির মাঝে একটি বনহংসী নিরালায় গা-ঢালা দিয়া আয়াস করিতেছে আবার পাক ঘুরিতেছে, তার কালোছায়া অস্পষ্ট ঢেউ ভাঙার সঙ্গে ছন্দ মিলাইয়া গতিপথে যেন জলতরঙ্গের মধুর সুর সৃষ্টি করিয়াছে। জলের পরিমাপের সঙ্গে দীঘির কিনারার উচ্চতা লক্ষ্য করিয়া পারে দাঁড়াইয়া মুহূর্তেক বিলম্ব করিতেও নির্ভয়প্রাণা রীয়া নিতান্তই শঙ্কাকুল বোধ করিতেছিল। ওপারের ভাঙা প্রাচীরের পাঁজর ডিঙাইয়া অতর্কিতে একটি ধূসর মন্দির-চূড়া রীয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেই তার পথহারা নিঃসঙ্গ ভাবটা যেন কাটিয়া গেল।

মন্দিরে সন্ধ্যারতি সুরু হইয়াছে। শঙ্খের ওঙ্কারধ্বনি দূরত্বের ব্যবধান ঘুচাইয়া থাকিলেও গতিপথ নেহাৎ কম হইবে না বলিয়াই রীয়া অনুমান করিল তথাপি, অবিশ্রান্ত ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে পদসঞ্চালনের পংক্তি মিলাইয়া সে অগ্রসর হইল। দীঘির বাঁক ঘুরিতে না

পুরিতেই মন্দির অদূরে দেখিয়া রীয়া পুনশ্চ থমকিয়া দাঁড়াইল। অযাচিত হইলেও রিক্তহস্তে মন্দিরের ঠাকুর দর্শন তাহার কী করিয়া সার্থক হইবে?……দীঘির স্নানের ঘাট ও ঠাকুর-দালানের সিঁড়ি মুখোমুখি। কালের প্রবাহে ইটমোড়া সানের বাঁধ অনেকদিন খসিয়া পড়িয়াছে, এখানে সেখানে সামান্য আস্তরের প্রলেপও নাই। এমন কি, সোপান শ্রেণীর স্থানে স্থানে ইটের গাঁথুনি পর্যন্ত অসংলগ্ন। অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মেই সারি বাঁধা ইটের পাঁজর ভাংগিয়া কোথাও বটের চারা শিকড় ছড়াইয়াছে, আবার কোথাও নবঘনশ্যামদূর্বাদল শীষ মেলিয়াছে। ঘাটে নামিয়া জল ছুঁইবার পথটুকু কিন্তু এখনও স্পষ্ট ও সুগম রহিয়াছে,—কেবল নিয়মিত চলার সংস্পর্শে ইটের প্রশস্তি আংশিক ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। মন্দির দালানের বহির্মুখী আলোক সম্পাত প্রাংগনে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু ঘাটের সিঁড়ি অবধি আসিয়া পৌছায় নাই। সন্তর্পণে রীয়া অনিয়ন্ত্রিত সোপান শ্রেণীর নিম্নতম স্তরে আসিয়া গতিবেগ আরও সন্ত্রস্ত করিয়া লইল। রাতের অন্ধকারে জলপথের বৃক্ষরাজি যেন ঘটলা পাকাইয়াছে। দুর্গম মন্দিরে প্রবেশাধিকার লাভ করিবার জন্য রীয়ার একটিমাত্র পঙ্কজলির আজ প্রয়োজন। এক পা জলে নামাইয়া অন্তর্বেগে বিশেষ ভংগি ছড়াইয়া 'সব চাওয়ার' মতো রীয়া হাত বাড়াইল। কোন্‌টি প্রস্ফুটিত আর কোন্‌টি মুকুলবাসরে, আন্দাজ করিবার চেষ্টা করিয়াও রীয়া কোনো হদিস্ করিতে পারিল না। বৃদ্ধা ও তর্জনীর মাঝারে রীয়া একটি মাত্র স্তবকের পরশলাভ করিবার সংগে সংগেই স্তবকটি বৃন্তচ্যুত করিয়া চঞ্চলপদে ঘাগরার পরিধি দুলাইয়া দ্রুত পদক্ষেপে ডাংগায় আসিয়া দাঁড়াইল।

…মন্দিরের আরতি সাংগ হইয়াছে। ধূপদানী হইতে অবিরাম সুগন্ধি ধোঁয়ার কুণ্ডলিতে দিকপাল এখনও ছাওয়া। কাঁচুলিপরা অংগ-ভংগির সংগে গতির ছন্দ মিলাইয়া অবিলম্বে রীয়া মন্দির-দালানের আঙ্গিনায় আসিয়া পড়িল। পূজারী ব্রাহ্মণের সাড়া কোথাও নাই। শূন্য মন্দিরে নিঃশেষোন্মুখ ধূপশিখার আড়াল হইতে একটু একটু করিয়া ভাসিয়া উঠিল মহাকালের মূর্ত বিগ্রহ: বৈকালীর সন্ধ্যসমাপ্ত পূজা আরতির সম্ভোগ লইয়া স্মিত-হাস্যে তৃপ্তির মহিমা ছড়াইতেছে। ……আরতি-সজ্জার আয়োজন পড়িয়া আছে· …নৃত্যশেষে দেবদাসী যেমন রাখিয়া গিয়াছে তেমনই।

এদিকে সেদিকে কণেক ব্যাকুলতার আভাস বিলাইয়া নিঃসুম অন্ধকারেও রীয়া লক্ষ্য করিল, প্রাংগণের একাংশে সেকেলে কোনো দালান-বাড়ীর ভগ্নাবশেষ স্থূল অবয়বে পড়িয়া আছে··· মন্দিরের পরিবেশে যেন কোন ধর্ম-পিপাসু অনামধন্য পরিবারের সৌখীন রুচি বহুকাল সংস্কারের অভাবে পড়িয়া আত্মসোপন করিয়া আছে। ইতিমধ্যে রাত্রির যবনিকা অনেকখানি নামিয়া আসিয়াছে। ক্ষণবিহ্বল রিজিয়া গতিস্তব্ধপদে মন্দির কক্ষে প্রবেশ করিয়াই সম্মুখদ্বার নিমুক্ত করিয়া দিল···কারুকার্যখচিত তাম্রপুষ্পপাত্র হইতে মহাকালের উৎসর্গপ্রলুব্ধ চন্দনসিক্ত শতদলে অঞ্জলি ভরিয়া রিজিয়া প্রণতি অর্ঘ্য জানাইবার জন্য নতজানু হইয়া বসিল: কবির কল্পনা বাস্তবের সংগে সুর মিলাইয়া অনাস্থিকে গাহিয়া উঠিল:

…বনানীর কোলে প্রাকার আড়ালে
তন্দ্রা নামিয়া আসে:
তরংগ তালে, মৃদু হিল্লোলে
তরীখানি ঘাটে ভাসে।

মনের মানুষ

আশা গংগোপাধ্যায়

(একাঙ্কিকা)

প্রথম দৃশ্য :

[রাত্রি গভীর ; প্রায় দেড়টা কি দুটো হবে। রাস্তায় গাড়ী-ঘোড়ার আওয়াজ আর একেবারেই শোনা যায় না।

একটি প্রশস্ত কক্ষ। বিছানাতে স্বামী শংকর ও তার স্ত্রী পার্বতী, দুটো সন্তান নিয়ে নিদ্রামগ্ন। অকস্মাৎ পার্বতী বিছানা ছেড়ে উঠে ঘরের বাইরে চলে গেল]

শংকর : (একটু পরে ঘুম ভেঙে বিছানা হাতড়াতে হাতড়াতে) এ কি! বিছানা খালি কেন? পারু আবার গেল কোথায়, অ্যাঁ? যাই, উঠে দেখি, আলোটা জ্বেলে দেখি। না থাক্—রাস্তার আলো এসে ঘরে পড়েছে, তাতেই হবে। আলো জ্বাললে আবার খুকু ঘুমুর ঘুম ভেঙে যেতে পারে।

(ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে একটু চড়া গলায়)—পারু—ও পারু, পার্বতী! না :—বারান্দায়, ছাদে—কোথাও ত দেখতে পাচ্ছি না। (ঢং ঢং করে কাছে কোথাও ঘড়ি বাজল)।

ইস্, রাত দুটো বাজল। এখন আবার কি কাজ পড়ল? বারান্দার আলোটা জ্বালব নাকি? না, থাক্। আলো জ্বেলে অন্ধকারকে ঢাকা দিলে ত চলবে না। রাতের আঁধারের মধ্যেই খুঁজে নিতে হবে অন্ধকারের অভিসারিকাকে। হুঁ, যা ভেবেছি ঠিক তাই। (ছাদের ঘরে চোখ পড়ল) ঐ ত ছাদের ঘরে আলো জ্বলছে—দরজা খোলা, চারি দিকে কাগজপত্র ছড়ানো। আশ্চর্য! বার বার নিষেধ করা সত্ত্বেও রাত দুপুরে সাহিত্য না করলে ওর কিছুতেই চলবে না। নাঃ, জ্বালালে দেখছি। উঃ, কি তন্ময়—কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপই নেই! (জলদগম্ভীর স্বরে) পার্বতী, পার্বতী!—(ডাকতে ডাকতে এগিয়ে যায়)। কোনও সাড়া নেই!

২য় দৃশ্য :

[কক্ষান্তর। পার্বতী কাগজে একমনে কি লিখে চলেছে। শংকর এগিয়ে এসে]—

শংকর : আচ্ছা, যে সময়টাকে ভগবান ব্যবস্থা করেছেন ঘুমিয়ে কাটাবার জন্য, পৃথিবীর সমস্ত লোক যখন আরামে নিদ্রা যেতে, সম্রাট থেকে দিনমজুর অবধি যখন শয্যার নিরাপদ কোলে আশ্রয় নিতে—এই বাঁধাধরা সময়টিতে মূর্তিমতী অনিদ্রের মত চলে কিনা এই হতভাগ্যের বিমুখী ভার্য্যার রসরচনা, কবিতার অলীক কল্পনা আর প্রবন্ধসাহিত্যের ফুলঝুরি। আশ্চর্য মেয়েলী মেয়ে বটে! পারু, এই পারু—শুনছ?

পার্বতী : (কাগজ থেকে মুখ না তুলেই) কি, কি ব্যাপার?

শংকর : আচ্ছা, এই রাত-দুপুরে আবার তুমি লেখালেখি সুরু করলে।—কিছুতেই বন্ধ করবে না তোমার ঐ স্বপ্নবিলাস? কী যে অক্ষয়স্বর্গ লাভ হবে গল্প লিখে বই ছাপিয়ে, তাও জানি না। তার চেয়ে বেড়াও, গান গাও, খাওয়াদাওয়া কর, বন্ধুবান্ধব নিয়ে হৈ-হল্লা কর, সিনেমা থিয়েটার দেখ যত খুসী—কত শত নির্দোষ উপায় আছে সময় কাটাবার।

(পার্বতীর কাছ থেকে কোনও সাড়া না পেয়ে ঈষৎ চটে গিয়ে) কি, শুনতে পাচ্ছ না বুঝি?

পার্বতী : (একটুখানি মুখ তুলে দেখে) হ্যাঁ, বল শুনছি।

শংকর : এত যে উপায়, এর কোনটাতেই মন ভরে না বুঝি? দিনান্তে কাগজের গায়ে হিজিবিজি কালির আঁচড় না কাটলে কিছুতেই তোমার শান্তি নেই, না? ধন্য তোমার সাহিত্য-প্রীতি! (হঠাৎ আগ্রহের সঙ্গে উঁকি দিয়ে) দেখি, দেখি, চাপা দিচ্ছ কেন—দেখি?

(কই, তোমার কাগজখানা টেনে নিয়ে পড়তে সুরু করল

পার্বতী : (বিরক্তভরে) আঃ, কি যে পাগলামি কর—

শংকর : (কাগজের উপর চোখ রেখে) হুঁ! এই ইন্দ্রজিতটি যে, শুনি? এত ইনিয়ে বিনিয়ে প্রত্যাখ্যান করছ—মিনতিতে ভেজে পড়ছ? তোমার সেই অশোকদা বুঝি?

পার্বতী : তার মানে? দেখছ না, গল্প লিখছি? কি যে যা তা বল পাগলের মত।

শংকর : বাঃ বাঃ সুন্দর হচ্ছে! কথাগুলি ত হুবহু মিলে যাচ্ছে, এই যে—(একটানা পড়তে থাকে):

"ইন্দ্রজিৎ, ও কথা বলে আর আমার মনে আঘাত দিও না। আমার মত সমস্যায় পড়লে তুমি নিজে কি করতে, বলা যায় না। কোনও মেয়েই পারে না অসুস্থ বাবা-মা, নাবালক ভাইবোনদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে নিজের জন্য স্বর্গরচনা করতে। জমিদার লক্ষ্মীনারায়ণকে বিয়ে করলে যদি সংসারে সুখ আসে, সকলে পেটভরে দু'বেলা খেতে পায় তবে আমার কি উচিত নয় তাদের জন্য নিজের সুখ বিসর্জন দেওয়া?

ইন্দ্রজিৎ বলল—কেন, আমি কি নিতে পারব না তোমার বাপ-মা ভাই-বোনের ভার? আমাদের এত দিনের ভালবাসা প্রেম, স্বপ্ন সব ওই ধনী জমিদারের স্বর্ণচক্রের তলায় পড়ে মিলিয়ে যাবে? না না, সুরভি—"

পার্বতী : (বাধা দিয়ে) আঃ থামো, থামো!

শংকর : এই ত, হ্যাঁ (পড়ে যায়)—"সুরভি বলে, না না, সে কিছুতেই হয় না। তোমাকে ছাড়তে আমার বুক ভেঙে যাবে, তবু ওদের ক্ষীণ দেহের উপর নিজের সুখশয্যা আমি কিছুতে রচনা করতে পারব না। এ জীবনটা ব্যর্থ হোক, পরজন্মের জন্য আমি করব কৃচ্ছ্র সাধন, করব তপস্যা।"

পার্বতী : নাঃ, আচ্ছা জ্বালায় পড়া গেল, দেখছি! দাও আমার কাগজপত্র।

শংকর : (নিজের মনে বলে যায়) একেবারে মিলে যাচ্ছে। তাই বলি, যাচ্ছে যাচ্ছে কিসের চিন্তায় ডুবে যাও? অর্থবানদের উপর অর্থহীন আক্রোশ, সংসারে নিরাসক্তি, স্বামী সন্তানের উপর মমতাহীনতা কিসের জন্য? হুঁ, আমি সবই বুঝতে পারি। একেবারে খাঁটী সত্যি—ঠিক তোমার চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে লিখেছ অক্ষরে অক্ষরে।

পার্বতী : যা খুসী বল তোমার। (একটু নরম সুরে) আচ্ছা, তোমার মত উন্মাদ ত আর দ্বিতীয় দেখিনি! গল্পের বিষয়বস্তু কি নিজেকে নিয়েই সব সময় রচিত হয়? সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, অমর কথাশিল্পী শরৎ চন্দ্র, এদের শত শত উপন্যাসের বিভিন্ন নায়ক কি তাঁরা নিজেরা ছিলেন? কল্পনার ফুল যখন রূপে-রসে-বর্ণে-গন্ধে সত্যকে ছাড়িয়ে যায়, তখনই ত হয় সার্থক সৃষ্টি, তখনই লেখনী হয় চিরস্মরণীয়—রচয়িতা থাকে উত্তরকালের মানবহৃদয়ের চিত্রপটে আঁকা।

শংকর : বাহ্বা তোমার কাব্য। কথার যাদুনিতে ত তোমার সাথে পারবার যো নেই। আচ্ছা, এই সব নিজের জীবনের কেচ্ছা পাঁচজনে যখন পড়বে, তারা কি বলবে বল ত? তারা কি সন্দেহ করবে না তোমার চরিত্রে? তুমি যে তোমার কৈশোরের প্রেমিক সেই অশোকদাকে নিয়ে এই সব গল্প লিখছ, এটা কি ভাল হচ্ছে?

পার্বতী : কি যা তা বলছ? কে আবার বিয়ের আগেকার প্রেমিক আমার? অশোকদা? ছিঃ ছিঃ, তিনি ত আমাদের পরিবারের বিশিষ্ট বন্ধু—আত্মীয়ই বলা যেতে পারে। তাঁর সাথে আমার প্রেমের সম্পর্কটাই বা কোথায় দেখলে?

শংকর : (মুখভঙ্গী করতে করতে) হ্যাঁ হ্যাঁ, জানা আছে। ওই রকম পারিবারিক হিতৈষীরাই ত ক্রমে ক্রমে জামাতার পদে প্রমোশন পান। আমি ত আর খোকন নই যে বোকা বানিয়ে ছেড়ে দেবে? ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

পার্বতী : (হতাশ হয়ে) থাক, তর্ক করে লাভ নেই। আর লেখা হবে না। এভাবে দিনের পর দিন ঝগড়া করে নিজের সব সাধ আর বজায় রাখা যায় না। সারাদিন ছেলেদের তদারক করে, সংসারের জোয়াল ঠেলে, তোমাকে সঙ্গ দিতে আর সময় থাকে কোথায়?

তাই ত বেছে নিয়েছি মধ্যরাত্রির এই নিবিড় প্রহরটুকু। তাতেও তোমার চোখ টাটাল? উঃ, পুরুষের খেলার পুতুল হওয়া ছাড়া কি মেয়েদের আর কিছু করবার উপায় নেই?

শংকর: মানে?

পার্বতী: হাঁ, সংসারের জন্য উদরান্ত খাটো, সন্তানের জন্য নিজের স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দাও, স্বামীর সুখের জন্য আত্মবলি দাও—নিজের ব্যক্তিত্বটুকু দাও জলাঞ্জলি—সব চুলোয় দাও—মুছিয়ে দাও একেবারে—তবেই তুমি হবে সুগৃহিণী—উদার, মহান্। ছিঃ—

শংকর: সেটা কি খারাপ, না দোষের?

পার্বতী: (উপহাসের সুরে) না, না, দোষের নয়—একটুও দোষের নয়—নিজস্ব স্বপ্ন, নিজস্ব ভাবনাবিলাস, স্বাধিকার-বোধ কখনও যেওনা প্রকাশ করতে, তাহলেই সুখের সংসারে জ্বলবে আগুন—পুরুষের স্বার্থীত্বে, প্রভুত্বে লাগবে অপমানের অনির্বাণ জ্বালা—নিরবচ্ছিন্ন শান্তির স্রোতে জাগবে কাল বৈশাখীর অশান্ত তুফান! যাও—ঢের লেখা হয়েছে—(কাগজ পত্র গোছাতে থাকে)—আর নয়—শোবে, চল।

শংকর: এই ত লক্ষ্মী মেয়ের মত কথা—চল। ওকি! আবার থমকে দাঁড়ালে কেন?

পার্বতী: (বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে আকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল) আঃ—কি সুন্দর ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে ছাদে—চল না দু'মিনিট বাইরে একটু দাঁড়িয়ে আসি? ঘরে যা গুমোট—চল না লক্ষ্মীটি?

শংকর: থাক্—থাক্। অত সোহাগে আর কাজ নেই। উনি চললেন এখন কাব্য করতে চাঁদের আলোয় দখিন হাওয়ায়—আর আমি যাঁ কোরে আকাশের তারা গুনি পাশে দাঁড়িয়ে। কেন, আজ কি ঘুমটুম হবে না না কি? (আশ্চর্য হয়ে) আচ্ছা অদ্ভুত মানুষ ত তুমি! পৃথিবীশুদ্ধ লোক ঘুমোচ্ছে—আর তোমারই যত নিশাচরবৃত্তি। কেন সারাদিন, সারা সন্ধ্যে ত রয়েছে—কল্পনার জাল বোনা—যৌবনের স্বপ্ন কি তখন ভাল চলে না? আমি কি এমনই অপদার্থ যে তোমার কল্পনার খোরাকটুকুও যোগাতে পারি না?

পার্বতী: (কপালে করাঘাত কোরে) হায়রে—অতি দুঃখে হাসিও পায়। নাও চল—দরকার নেই বাবা হাওয়া খাবার—শোওয়া যাক্, ঘুমোনো যাক্ বিছানায় গিয়ে।

শেষ দৃশ্য:

[পাশাপাশি শয্যা। পার্বতী কল্পনার জাল বুনে চলেছে নিঃশব্দে। চিন্তা করছে, কিভাবে সাজালে গল্পের চরিত্রগুলি বাস্তবে রূপান্তরিত হয়ে উঠবে। পাশে শংকর নিদ্রিত। এমন সময়]—

শংকর: ঘুমোলে—পাকু, ঘুমোলে নাকি?

পার্বতী: না, কেন, কি হল আবার তোমার?

শংকর: (মিনতির স্বরে) একটা কথার সত্যি জবাব দেবে? বলনা?

পার্বতী: ওমা, হাতড়পুরে আবার কিসের সত্যি জবাব?

শংকর: (আদরের সুরে) না, তুমি সত্যি বলবে বল—কথা দাও আগে?

পার্বতী: (সন্দেহ ভরে) কি ব্যাপার?

শংকর: আগে বল, সত্যি জবাব দেবে।

পার্বতী: আচ্ছা, সত্যি বলব, কথা দিলাম।

শংকর: (গদ্‌গদ্ স্বরে), পাকু, পাকু, ঐ ইন্দ্রজিৎ লোকটা কে, পাকু? সে কি তোমাকে আমার চেয়েও বেশী ভালবাসে? সে কি পারে আমার চেয়েও বেশী আদর করতে—ভালবাসতে? (পাকুর গায়ে হাতটা রাখে)

পার্বতী: (প্রবল ঘৃণায়) আঃ—সরে বলছি। শীগ্‌গির ছাড়ো হাত—তোমার স্পর্শটাও অশুচি লাগে। এত নীচ মনও ত দেখিনি, শুনিনি কখনও।

শংকর: (কোনও কথা না শুনে বলে চলে) অশোকদা কি তোমাদের বাড়ীতে দিনরাত থাকতেন? আচ্ছা, কি করেন তিনি? এখনই বা আছেন কোথায়?

পার্বতী: (গম্ভীর স্বরে) জানি না, যাও—

শংকর: বাঃ রে—তুমি যে এখুনি কথা দিলে আমাকে সত্যি কথা বলবে—লুকোবে না কিছু?

পার্বতী: (তিক্ত স্বরে) আচ্ছা মানুষ ত! নিজেও

তুমি ঘুমোবে না, আমাকেও চোখ বুঁজতে দেবে না। ভোর হতে না হতেই ত সংসারের ঘানিতে গিয়ে লাগতে হবে। দয়া-মায়া, আক্কেল-বিবেচনা একটুও যদি থাকে তোমার। স্নেহ ভালবাসা বলে কিছু কি নেই প্রাণে? (আক্ষেপে কণ্ঠ রোধ হয়ে আসে) আমার যেমন কপাল!—শুধু শুধু স্বপ্ন মনকে ব্যস্ত কোরে মিথ্যে সন্দেহের জ্বালায় জ্বলছ, আমাকে জ্বালাচ্ছ—নিজেও অশান্তি ভোগ করছ।

শংকর: উঃ, তুমি এক কথায় জবাবটা দিলেই ত সব চুকে যায় এক মিনিটে।

পার্বতী: (দৃঢ় স্বরে) কিসের জবাব? কিসের জবাব জানতে চাও, শুনি?

শংকর: (বেশ সহজ ভাবে) ওই যে তুমি লিখেছ—তুমি লিখেছ যে ইন্দ্রজিৎ—

পার্বতী: (কাঁকিয়ে ওঠে) ইন্দ্রজিৎ ত কি? কি বলতে চাও তুমি?

শংকর: (আগ্রহে) ওটি কে?

পার্বতী: (সহজ স্বরে) কে আবার—মানুষ।

শংকর: হাঁ, হাঁ, সে ত আমি জানি। সেই কথাটাই ত জানতে চাই আমি। পরিষ্কার কোরে বলই না, কে ও, কোথাকার মানুষ?

পার্বতী: (আচ্ছন্নভাবে বলে) মানুষ—মানুষ। আমার মনের মানুষ।

শংকর: (বিস্মিত স্বরে চীৎকার কোরে ওঠে) এঁ্যা, কি বল্লে? তোমার—তোমার মনের মানুষ, তোমার মনের?

পার্বতী: (উত্তেজনায় উঠে বসে তারস্বরে চীৎকার কোরে বলে ওঠে এবার) হাঁ্যা গো হাঁ্যা, সত্যি বলছি—বিশ্বাস করো। আমার নিজের মানুষ—আমার অন্তরের মানুষ—আমার একেবারে অত্যন্ত আপনার জন। হয়েছে? (স্বামীর মুখের সামনে হাত নেড়ে বলে) হয়েছে—বিশ্বাস হয়েছে তোমার? (বলেই হাঁপাতে হাঁপাতে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে মুখ গুঁজে)।

শংকর হতবাক্ হয়ে যায়।

(লেখিকার "মনের মানুষ" ছোট গল্পের নাট্যরূপ)

নিবিড় রাত্রির পর

শ্রীসিদ্ধার্থ গংগোপাধ্যায়

শীর্ণস্রোতা নদীটির দুই তীরে সন্ধ্যা নেবে এলে,
স্তব্ধ হয় তারাদের পথচলা, বিশ্রামের সুর
চারিদিক ভরে রাখে, রাত্রি, নিস্তব্ধ কথা নিয়ে
ক্রমশঃ ঘনিয়ে আসে, বুকে বাজে ঘুমের নূপুর।

এ-নদীর ঢেউয়ে জ্বলে গাঢ় নীল শুভতার আলো,
কাহিনী ফুরিয়ে যায়, আবার কাহিনী গড়ে ওঠে,
নির্ঝর অশ্রান্ত ঝরে, শব্দ করে টিপিটিপি পায়,
অন্তরায়া মাঠে মাঠে বাতাসের হরিণেরা ছোটে।

তারপর অন্ধকারে আশ্চর্য পাখির ডাকে ভোর,
হঠাৎ শিউরে ওঠে, আলোকের ছুরিকা আবার,
খুলে দেয় নির্ভরে স্বর্ণ-আঁকা সকালের ঘোর,
দিগন্তের চিত্রপট ফুটে ওঠে রঙের বাহার।

নিবিড় রাত্রির পর শেষ হয় স্বপ্নের মৃগয়া,
তখনো ঘুমায় তবু চন্দ্রকলা আকাশের নীড়ে,
মেঘমালা জাল বোনে শান্ত নীলে, উদার হাওয়ায়,
লজ্জালু ফুলেরা সব ঘুম থেকে জেগে ওঠে ধীরে।

স্বপ্ন

গীতা গুহ

হাতের কাজ বন্ধ রেখে প্রশ্ন করল সাহানা, কী ব্যাপার বলুন তো ?

সুধাবিন্দু কোথায় ? আপনি কী করছিলেন ? এলো-মেলো কথা বলে গেল নীলাদ্রি ; সাহানা জানে, এসব কথা বলতে সে আসেনি।

নীলাদ্রি টুরে গেছে, আজ ফিরবে না—কিন্তু কী ব্যাপার বলুন তো ? সাহানা হাসল, সুস্থির হোয়ে বসুন দেখি। —চেয়ারটা এগিয়ে দিল সে নীলাদ্রির দিকে, তার কথা মতই যেন বসে পড়ল নীলাদ্রি।

চা আনব ? সাহানা সম্পূর্ণ ভাবে নীলাদ্রীর দিকে মন দিয়েছে, চেয়ারের পাশে এসে দাঁড়াল।

চা খাব না। নীলাদ্রির কণ্ঠস্বর মৃদু শোনাল, আপনি বসুন, মিসেস সেন।

মোড়াটা নীলাদ্রির চেয়ারের কাছে টেনে নিয়ে বসল সাহানা, কী ঘটেছে বলুন দেখি ? উৎসুক তার কণ্ঠস্বর।

মিসেস সেন·····কী যেন বলতে গিয়েও বলতে পারল না নীলাদ্রি। মমতা জাগল সাহানার মনে, স্বামীর বন্ধু নীলাদ্রিকে সে বুঝতে পারে।

মিসেস সেন····· মাথা নীচু করেছে নীলাদ্রি। কী বলতে চান, বলেই ফেলুন না—আন্তরিকতার ভরে উঠল সাহানার কণ্ঠস্বর, এমন কী কথা থাকতে পারে, যা বলতে আপনি এত সঙ্কুচিত হোয়ে পড়ছেন ?

মিসেস্ সেন, আপনার কাছে বহুবার এক ভদ্রমহিলার কথা বলেছি···তার সঙ্গে অনেক দিন দেখা নেই আমার··· এক সঙ্গে কাজ করতাম আমরা।··· অনেক কষ্টেই যেন কথাগুলো বলে চলেছে নীলাদ্রি, আপনাকে তো বলেছি, সাধারণ মেয়ের চেয়ে ওর বুদ্ধি ছিল অনেক বেশি—পড়া-শুনা করতেও ভালবাসত, যা আপনারা ডিগ্রী না পেলে কী পেলেও করতে চান না। ওর পড়বার সুযোগ ছিল কম, কিন্তু তবুও···একটা মাসিক পত্রিকার কয়েকটা পাতা নীলাদ্রি এগিয়ে দিল সাহানার দিকে, মিসেস্ সেন—সে গল্প লিখত, তারই একটা লেখা কাহিনী এটা, কাহিনীটা আমার জানা ছিল, তাই—মিসেস সেন, পড়বেন আপনি ?

নীলাদ্রির প্রতিটি কথাই শুনছিল সাহানা, এবার হাত বাড়িয়ে ছেঁড়া পাতা কটা তুলে নিল।

মিসেস্ সেন, আর এই ছবিটা···সাহানা দেখল, এও মাসিক পত্রিকারই একটা ছেঁড়া পাতা। নীলাদ্রি বলল,—

তারই ছবি বলে যেন মনে হোচ্ছে আমার। দক্ষিণ ভারতের কোন মন্দিরের এক মর্মর মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে একটি ছিপছিপে মেয়ে ; পাশ থেকে ছবিটা তোলা হোয়েছে, মুখখানা তাই সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে না।

নীলাদ্রি বলল, মেয়েদের চোখে মেয়েদের কেমন লাগে, জানি না। কিন্তু ও সুশ্রী।—ছবিটা সাহানার হাতে দেবার আগে আরেকবার ভাল করে তা দেখল নীলাদ্রি। হ্যাঁ ওরই ছবি, মিসেস্ সেন—উঠে দাঁড়াল সে, আজ আসি চলুন।

কিন্তু চা খাওয়া হোল না তো।

সে সময় পড়ে রয়েছে। ব্যস্ত ভাবেই চলে গেল নীলাদ্রি।

নীলাদ্রি চলে গেল। আর ঐ ছেঁড়া পাতাগুলো নিয়ে কোন্ এক সুচেতা মৈত্রের কাহিনী পড়তে আরম্ভ করল সাহানা। সুধাবিন্দু বাড়ি নেই, অখণ্ড অবসর রয়েছে সাহানার আর ছিল মেয়েদের সহজাত কৌতূহল প্রবৃত্তি।

নীলাদ্রি নিতান্তই ভালমানুষ, অবশ্য সে ছিল ভাল ছাত্র। পড়াশুনা শেষ করে সুনামের সঙ্গে বড় ডিগ্রী নিয়ে ভাল চাকরী পেল সে, চাকরীতে তার উন্নতি হোল। তারপর অভিভাবকদের পছন্দমত সুন্দরী শিক্ষিতা মমতাকে সে বিয়ে করল। মমতার রুচি ছিল, বুদ্ধিও ছিল,—সাহানা মেয়ে হোয়েও স্বীকার করবে, মমতার মত মেয়েকে পাওয়া যে কোন পুরুষের ভাগ্যের কথা।··· সুধা-

বিন্দু বলে, ছাত্র জীবনেও সহপাঠিনীদের সঙ্গে প্রেম করেনি নীলাদ্রি, সেটা তখন স্বাভাবিক ছিল।

তবু সাহানা আর সুধাবিন্দু এই মুখচোরা ভদ্রলোকের কাছে এক অপরিচিতার অনেক গল্প শুনেছে···নানা ছলে তার কথা নানা ভাবে বলতে পেলে খুসি হোত নীলাদ্রি, অবশ্য তার কথা বলে গেলেও সে লজ্জা পেত।··· তাই সুধাবিন্দু কী সাহানা কেউ তাকে এ নিয়ে কোন প্রশ্ন করতে পারত না।

যদিও নীলাদ্রির জীবনে কোন কিছুরই অভাব ছিল না। আর সুধাবিন্দু ভাবত, নীলাদ্রির জীবনে কোন বাধা আসেনি বলেই সে বোধহয় এমন ভালমানুষ হোয়ে পড়েছে।

সাহানা গল্পটা পড়ল। লেখিকার ভাষা ঝরঝরে, তবে কাহিনী নিতান্তই মামুলি। বিবাহিত পুরুষকে ভালবাসল আধুনিক কালের উপার্জনশীলা একটি মেয়ে; তার জীবনের তিরিশটা বছরের সব কটা বছরই কেটেছিল দুঃখকষ্টে। কঠিন তার জীবনযাত্রা, তাই হৃদয়ের উত্তাপকে সে যথা-সম্ভব দূরে সরিয়ে রেখেছিল। তবু আবেগের কাছে তাকে হার মানতে হোল জীবনের কোন দিককেই অস্বীকার করা যায় না, অনেকটা মাশুল দিয়ে তা সে জানল।

সুখী, বিবাহিত জীবনের অধীশ্বর, স্ত্রীর ভালবাসায় তার গুণে মুগ্ধ পুরুষের জীবনের কোথাও হয়ত ফাঁক ছিল। কিম্বা সাধুক পুরুষ একটি নারীকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, তাই সে মেয়েটিকেও ভালবেসেছিল। স্ত্রীর কাছে গোপন করে সে তার প্রণয়িনীর কাছে যেত। নীতির শাসন মানা হোচ্ছে না, অন্যায় হোচ্ছে তা বুঝত মেয়েটি, তবুও সে প্রশ্রয় দিত। কিন্তু এ কথা গোপন রইল না। শিক্ষিতা, রুচিবতী স্ত্রী এ নিয়ে তর্ক তোলেনি, স্বামীর জীবনে যদি এভাবে পূর্ণতা আসে, পথ ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিল সে। কিন্তু এতটা মনের জোর ছিল না বিবাহিত পুরুষের; তাছাড়া পিছুটান প্রবল ভাবে নাড়া দিল তাকে, খোকনকে নিয়ে স্ত্রী চলে যাবে, এতটা সহ্য করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুতরাং তাকে ঘরে ফিরতে হোল। আর জীবনে যে মেয়ে কিছুই পেল না, তাকেই আবার ত্যাগ স্বীকার করতে হোল। এখানেই লেখিকা তাঁর কাহিনী শেষ করেছেন।

মাসিক পত্রিকার ছেঁড়া পাতাগুলো গুছিয়ে রাখল সাহানা। মমতার কথা তার মনে হোল, মনে হোল, মমতা আর নীলাদ্রির বড় আদরের সন্তান রুটুকে···তার বেশি আরও কিছু ভাবল সাহানা। ···নীলাদ্রি সেই অপরিচিতার কথা বলতে গিয়ে বিষম হোয়ে পড়ত, একটা অদ্ভুত শ্রদ্ধা তার মনে ছিল সে কথা বুঝত সাহানা। একদিন নীলাদ্রি বলেছিল, মিসেস্ সেন, শুধু ওর ছোট ভাইটির 'পরে ওর স্নেহ ওকে যে টুকু শান্তি দিত। দুঃখকে সহ্য করবার অসাধারণ শক্তি ওর ছিল, ওর মনের ক্ষতকে কেউ তাই কোনদিন বুঝতে পারেনি। ছেঁড়া শাড়ি পরে ও অফিসে আসত। মেয়েরা তো সব সময়ে সাজ-পোষাকের দীনতাকে গোপন করেই রাখতে চায়। কিন্তু ও ছেঁড়া আঁচলের কোণা ছুলিয়ে কেমন একটা আত্মতৃপ্তি পেত।

···এমন আরও এলোমেলো অপ্রাসঙ্গিক সব টুকরো টুকরো কথা···সাহানা ভাবছিল, নীলাদ্রির মত মুখচোরা মানুষটাও মাঝে মাঝে মুখর হোয়ে পড়েছে।

পরদিন আবার এল নীলাদ্রি। লেখাটা—বলতে গিয়ে লজ্জায় জড়িয়ে এল তার কণ্ঠস্বর।

ভালই হোয়েছে। পাকা হাতের লেখা।

এ কাহিনীর সঙ্গে আমি জড়িত মিসেস্ সেন, এ কাহিনী আমি জানি—বলে ছেঁড়া পাতাগুলো যত্নের সঙ্গে গুছিয়ে তুলে নিল নীলাদ্রি।

আজ আমি চলি, মিসেস্ সেন।

সাহানা তাকে বসবার অনুরোধ করবার সময়ও পেল না। একটু বেশি তাড়াতাড়ি যেন সে চলে গেল।

এতক্ষণ যে মমতা জেগেছিল সাহানার মনে সহসা দাক্ষিণ্যের হাসিতে তা চাপা পড়ল। কেমন যেন করুণা জাগল সাহানার মনে; শুধু নীলাদ্রির জন্য নয়, আরও কারুর জন্য। কিন্তু সে মমতার ছোঁয়া পেল না কাহিনীর নায়িকা, যার জীবনের ট্রাজেডি গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছিল নীলাদ্রির মন।

গালে হাত দিয়ে বসে কী যেন ভাবছিল সাহানা···

সুচেতা মৈত্র একদিন বিশেষ পরিচিতা কেউ ছিল নীলাদ্রির : কিন্তু আজ সে কোথায় আছে, কেমন আছে তা জানে না নীলাদ্রি। সবটা এই কাহিনীটুকু।

নীলাদ্রি ভাবে ; ভেবে হয়ত কিছু তৃপ্তিও পায়, সুচেতার জীবনে ট্রাজেডি গভীর হোয়েছে···নীলাদ্রি তার বেদনাকে অনুভব করে কেমন যেন দুঃখ পায়, এ দুঃখের বিলাস। জীবনের পূর্ণতায় পুরুষ তৃপ্ত হয় না, তাই ব্যর্থতা আর নীলাদ্রির বাকখানে অশরীরি সুচেতা থাক না !— কিন্তু নায়িকার জীবনের এ ট্রাজেডিকে বিশ্বাস করে না সাহানা, মেয়েদের মন নিয়েই বিশ্বাস করতে পারে না। মেয়েদের জীবনে ভাব কম ; বাস্তব জীবনের দুঃখ তারা সহ্য করতে পারে, কিন্তু দুঃখের বিলাস ?

মনে পড়ল সুরজিৎকে···সাহানার সহপাঠী সুরজিৎ রায়। সাহানা আর সে এক সঙ্গে অনার্স ক্লাস করত ; তাই তাদের ঘনিষ্ঠতা কিছু বেশি হোয়েছিল। সাহানার বান্ধবী-দল তাকে ঠাট্টা করত, তা গ্রাহ্য লাগত না সাহানার। যদিও সে জানত মেয়েলী ভাবের এই লাজুক সুরজিতের সঙ্গে দস্তুরমত প্রেম করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কেমন একটা কৌতুকও ছিল ওর মনে। অতি উৎসাহী তৃপ্তি একদিন খবর আনল, এরই মধ্যে সুরজিৎ কোন এক মেয়েকে হৃদয় এবং বাক্‌দান করে ফেলেছে! অথচ সাহানার 'পরে তার দুর্বলতার কথা ক্লাসের ছেলেদেরও আলোচনার বস্তু তা ওরা সবাই জানে।

সেদিন কখন জমে সাহানা, তৃপ্তি, সন্ধ্যা, ওদের সকলের আড্ডা জমেছিল। একটা বিরাট প্ল্যানের খসড়া রচনা হোয়ে গেল। অনার্স ক্লাসে যাওয়াই হোল না সাহানার। সভাভঙ্গ হবার সময় শেষ কথা বল সাহানা, আমাকে তোমরা পঞ্চাশ টাকা ঠিক দেবে ? ঠিক তো ?

ঠিকই দেব, বল সন্ধ্যা অবিশ্বাসী অনীতা ; কিন্তু তুই পারবি তো ?

দেখাই যাক্ না—জয় করবার আগেই বিজয়ের হাসি ফুটে উঠল সাহানার মুখে।

পরদিন আবার সেই পরিচিত অনার্স ক্লাস। প্রোফেসার চ্যাটার্জি হেগেলের দর্শন বোঝাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু সাহানা সে দিকে মন দিতে পারছিল না একটুও। তার মনে হোচ্ছিল, ঘণ্টা আজ শেষ হোতে যেন বড্ড বেশি দেরী হোচ্ছে ! অবশেষে ঘণ্টা বাজল। সাহানা প্রফেসারের সঙ্গে বার হোল না। সুরজিৎ তার অপ্রস্তুত ভাব নিয়ে বই খাতা গুছোতে ব্যস্ত। সাহানা লক্ষ্য করত, মেয়েদের মত একটু বেশি বই খাতা নিয়ে কলেজে আসতে ভালবাসত সুরজিৎ।

সুরজিৎ আর সাহানা পাশাপাশি হাঁটছিল। ময়দান শহরের কলেজ, সামনে ছিল গঙ্গানদী। তীরে এসে সাহানা বল, বসবেন ও দিকের বেঞ্চটায় ?

ওরা দু'জনে কাছাকাছি বসেছিল।···সুরজিৎ ভাবের দৃষ্টি মেলেছিল নদীর দিকে। আর সাহানা প্ল্যানটা ঝালিয়ে নিচ্ছিল, প্রেম নিবেদনের প্ল্যান। সেদিন সুন্দর অভিনয় করল সাহানা, উপন্যাসের নায়িকার মত প্রেম নিবেদন করেছিল···সুরজিৎ ভীত, বিব্রত।

তারপর ট্রাঙ্কার নিচে কলেজ ছেড়ে চলে গেল সুরজিৎ। আর চাঁদা তুলে সাহানার বান্ধবীর দল সাহানাকে পঞ্চাশ টাকা দিয়েছিল।···সেদিনকার উত্তেজনায় একটা আনন্দ ছিল। সুরজিৎ কলেজ ছাড়বার পর ওদের আসরটা আরেকবার আলোড়িত হোয়েছিল। তারপর ফোর্থ ইয়ার, টেষ্ট পরীক্ষা, ওরা ভুলে গেল।

আরও কয়েক বছর পর তৃপ্তি খবর আনল, সুরজিৎ বিয়ে করেছে। তারও কিছুদিন পরে অনীতা জানাল, সাহানার সেদিনকার অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে সুরজিৎ তার বন্ধুদের কাছে গল্প করে থাকে আজও···সাহানার জন্য 'মন কেমনের হাওয়া' তার মনে প্রায়ই বয়ে থাকে।

সাহানা আর অনীতা এক সঙ্গে হেসেছিল। কী যেন তুই বলেছিলি সাহানা ?

অনীতার প্রশ্নের জবাব দিল সাহানা ; যদিও হাসি গোপন করেছিল। সে বল পড়া পুথির মত, সুরজিতের 'পরে তার এ দুর্বলতার ইতিহাস তারই জীবনের সম্পদ হোয়ে থাকবে। সুরজিৎ আরেকজনকে ভালবাসে, কিছুই তার দেবার নেই সাহানাকে, তবু সাহানার এ প্রেম তারই গোপন ঐশ্বর্য···সুরজিৎও যেন গোপন রাখে তাকে··· সাহানার গলা কেঁপেছিল আর সুরজিতের চোখে জল চিক্ চিক্ করে উঠল।

দশ বছর আগেকার সামান্য ঘটনা আজও অসামান্য হোয়ে উঠল না সাহানার কাছে। শুধু কৌতুকের হাসিটা আজ সে হাসল না। সুরজিতের মূর্খতাকে আজ ধিক্কার দিল না।

নীলাদ্রির কথাই আবার সে ভাবল। মমতার সুখ সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়, নীলাদ্রিও কী অসুখী? তবু চিরকাল স্বপ্ন দেখবে পুরুষ, আর কড়ো হাওয়ায় উড়ে চলবে না মেয়েরা, মাটির সঙ্গেই নাড়ীর যোগ যে তাদের। গল্পের নায়িকার যে ট্রাজেডির সঙ্গে নীলাদ্রি যোগ খুঁজছে তার প্রণয়িনীর জীবনের—সত্যিই তেমন কিছু ঘটেছে কী?

উঠে দাঁড়াল সাহানা, আজকে সুধাবিন্দু ফিরছে।

ভুলেছ কি সেই সব কথা?

অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

তবু রাতে অন্তরঙ্গ আলাপন নিভৃতে নির্জ্জনে
সময়ের স্রোত ঠেলে প্রচ্ছন্ন সম্ভোগ তৃষা লয়ে,
লাগে ভালো। মুখ ফুটে না-বলা কথাটি চেপে মনে,
বুক ফাটে তবু অনিবার।
তবুও চতুরা হয়ে উত্তেজনা রচিছ আবার!
এখনো রঙ্গিন নেশা নয়নের কোণে যায় ঘুরে,
গোলাপী কপোলে কেন যৌবনের বিদ্যুতের আভা!
স্তন-শতদল দুটি বিকশিত এবে:
নৈশ-সঙ্গ-সুখ-তরে কতবার হয়ে গেছে ভাবা!
অন্তরের সব ক্ষুধা সাঙ্গ করি, তবু কেন কেঁপে
ওঠো মোর আলিঙ্গন লাগি?
তুমি অমন করিয়া আপনারে রেখোনাক' ঢাকি?

তুমি শুনেছিলে কবে ঘরে বসে মোর কণ্ঠ হোতে
স্বরচিত কবিতার বাণী, সচকিত হোয়ে শেষে
চেয়েছিলে বাতায়নে, জোয়ার এসেছে
নদী-স্রোতে।
তুমি মোর সাথে মিলিয়াছ কোন্ পথ দিয়ে এসে
বালিগঞ্জে যাবার ট্রামেতে
ঘরের মোটর ফেলে; কহিয়াছ—নমস্কার কবি!
আমার স্বাক্ষর আজি রাখিলাম তোমার
খাতেতে।'
সহসা চাহিয়া দেখি তুমি যেন ছবি।

সেই হোতে মনোবাতায়নে ছিল যত মিলিমিলি,
খুলে দিয়ে গেলে অভিসারে।
আমরা দু'জনে বসে অগোচরে ঘুরে নিরিবিলি
বেঁধেছিনু রাঙা রাখী নিশি-যাপনার অঙ্গীকারে।
ভুলেছ কি সেই সব কথা?
আবার তনুতে তুমি জড়ায়ে দাও গো বাহুলতা।
রাত্রি হয়েছে অনেক
অতনু রাতির এসো করি অভিষেক।

•———

আবাহন সঙ্গীত

যূথিকা দাস

এসো মা, এসো মা মাতঃ,
মম হৃদে আসন পাতা
(মা) তোমার লাগি শুধুই আছে।

ভয়-ভয়-নাই মা জানা
জানি শুধু তুই আমার মা
(মা) তোর নাম গান ছাড়া কিবা আছে।

ডাকার মত ডাকতে যদি
পারতুম দুর্গা নিরবধি
দেখতুম মাগো কেমন করে
আসবি না তুই আমার কাছে।

কর্ম্ম চক্রে বেঁধে দিয়ে
রাখ্‌ছিস্ মা তোর পথ ভুলায়ে
আমি অধম সেই চক্রে ঘুরে
কাটাই সময় শুধুই মিছে।

দয়া করে মুক্ত কর মা
ভবের জ্বালা আর সহে না
দীপ জ্বেলে দে জীবন-মাঝে
তুই দুর্গা মা দুর্গতি নাশি
তাই কাঁদি মা, তোর কাছে আসি
চাই যে ডাকতে
প্রভাত সাঁঝে।

বিরহ জাগিল সে হৃদয়

তপতী চট্টোপাধ্যায়

সুখ পূর্ণ পারাবারে
ধূসর সে প্রান্তরে
একা ছিল চির সত্যময়
সেই স্তব্ধ পূর্ণ ক্ষণ
বিষাদে হোল মগন
বিরহ জাগিল সে হৃদয়
ছিল নাতো তাহা দেখি
চমকিয়া উঠিবার
কোনও এক বিস্মিত অন্তর
চির স্থির জ্যোতিষের
সে আজ বিস্মৃতির
সচকিত স্মরীর-প্রহর
আপন হিয়ার মাঝে
সবুজ আলোর সাজে
গড়ে চন্দ্র সূর্য্য ফুল হাসি

কান্না প্রেমে পূর্ণ ধরা
মিলন আনন্দ-ভরা
ভরালো হৃদয়ে সুখরাশি
আপনার সৃষ্ট রূপে
আপনি বিস্মিত হয়ে
ধরা পানে সূর্য্যসম বহি
কি কথা বলার আশে
অনুরাগ-স্ফুট ভাষে
উঠিলে একটি সুর গাহি
তখনি জাগিয়া উঠি
ধরার হৃদয় কটি
চমকি চাহিল নিজ পানে
নিজের হৃদয়টিরে
দেখে কে পূর্ণ করে
দিয়ে গেছে বিরহের গানে।

জাহ্নবী জীবন

(উপন্যাস)

কমলা দেবী

(১)

কোথায় সেই জাহ্নবী জীবনাহন।

যাকে খুঁজছে আজ হেমন্তশেষের ফসল কাটা ঘাঠের চির খাওয়া মাটী : আর মৃত সন্তানের পাশে বসে অদৃষ্ট-বাদী মা। বিংশ শতাব্দীর নূতন যুগসন্ধিক্ষণের পটভূমিকায় যার অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের সম্ভাবনায় সমস্ত মানুষের চেতনার মর্মমূলে বেজেছে ব্যাকুলতার বিজয় বিষাণ।

প্রখর গতি ক্ষমতা আর স্বপ্ন ধারা? তুমি জান কি শকুন্তলা? সে কোথায়?

ট্রেন হু হু করে ছুটে চলেছে। তার সঙ্গে ছুটেছে গেরুয়া মাটীর স্রোত, আর অসমতল রুক্ষ প্রান্তর। মাটীর টিলা আর শুকরিত শাল পলাশের বন। দুর্গাপুরের অরণ্য বিভাগের পিছনে মেঘের নীল ওড়না গায়ে জড়িয়ে পর্বতশ্রেণী আর আকাশের নীল পট শ্বেত-শুভ্র হংস বলাকা। এরা কোথায় ছুটে চলেছে, কি খুঁজছে, কাকে খুঁজছে শকুন্তলা তুমি জান কি?

ছোট্ট ষ্টেশন—বিস্ময়ের বাষ্পে ভরা তার পরিবেশ।

গাড়ী থামতে শকুন্তলা, এ্যাটাচি কেসটা হাতে নিয়ে নেমে পড়ল। কুলী ওর বাকী জিনিষ নামিয়ে নিল। সম্পূর্ণ নূতন দেশ, অপরিচিত পরিবেশ। তার মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজের পানে চেয়ে শকুন্তলা যে ক্ষণিকের জন্য আত্মবিস্মৃত হোল না, এমন নয়। কোথায় তার আবাল্য পরিচিত কলিকাতা, আর কোথায় এই অখ্যাত পল্লীর ক্ষুদ্র ষ্টেশন। এর পিছনে আরও কত কি আছে কে জানে?

"—আপনি কি শ্রীমতী শকুন্তলা চৌধুরী? কোলকাতা থেকে আসছেন?" নিস্পত্র শিমুল গাছটার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে শকুন্তলা পিছন ফিরে প্রশ্নকারীকে বললে,—"আজ্ঞে হ্যাঁ"।

অপরিচিত যুবক বললে—"কমলা বিদ্যামন্দিরের সেক্রেটারী, আপনাকে রিসিভ করার জন্য আমায় পাঠিয়েছেন"।

শকুন্তলা বললে—"ও, ধন্যবাদ"।

কুলীকে ইঙ্গিতে অনুধান জানিয়ে যুবক বললে, "আমার সঙ্গে আসুন"—ষ্টেশনের বাইরেটা নিতান্তই অপরিচ্ছন্ন। টাঙ্গা ও কয়েকটি বাস যাত্রীর অপেক্ষায় প্রস্তুত রয়েছে। গ্রাম্য উলঙ্গ বালক বালিকা, চতুর্দিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। দুই চার জায়গায় বিক্রী হচ্ছে তেলে ভাজা খাবার। একটি বটগাছের তলায়, পায়ে রূপার নূপুর দিয়ে এক বিদেশিনী নাচছে সস্তা পাঁচমিশালী নাচ। আর তার পাশে দাঁড়িয়ে এক বেকার ছেলে বাঁশীতে সুর দিয়েছে বেসুরো গজলের। ওদের মুখের দিকে চাইলে সহজেই অনুমান করা যায়, যে ওরা আষাঢ়ের সমাজ বিপ্লবের দুর্লভ আমদানী। ওদের চারিপাশে গ্রাম্য লোকের অসম্ভব ভীড়।

পথের একধারে একটি সুবৃহৎ গাড়ী দাঁড়িয়েছিল। তার নিকটে এসে দরজা খুলে দিয়ে যুবক বললে, "আসুন মিস্ চৌধুরী।"

শকুন্তলা বসতে সে দরজা বন্ধ করে দিতে শকুন্তলা বললে, "আপনি উঠবেন না?"

যুবক বললে "আমার নাম রাকেশ লাহিড়ী। আমি ড্রাইভ করবো।"

সে কুলির সাহায্যে শকুন্তলার বাক্স বিছানা কেরিয়ারে ওঠাতে লাগল। শকুন্তলা হাত বাড়িয়ে বললে, "ব্লাউটা আমার কাছে দিন।"

স্ট্র্যাপটা ব্লাউটের গায়ে জড়িয়ে সেটা শকুন্তলার হাতে হাতে দেবার সময় রাকেশ চকিতে একবার তার মুখের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। শকুন্তলার ভরা যৌবনশ্রীকে রাকেশ

মনে মনে শ্রদ্ধা জানাল। শকুন্তলার পিঠের উপর এলিয়ে পড়া, কালো বিহ্বলীর ছন্দে, সে দেখতে পেল, যেন অনির্দিষ্ট পথের এক সাঙ্কেতিক চিহ্ন। এমনটি সে ভাবেনি। সে ভেবেছিল, হেড মিসট্রেস। তিনি নিশ্চয়ই বয়স্কা, এবং কোলকাতা ছেড়ে যখন এই গ্রাম্য স্কুলে এসেছেন, তখন বুঝতে হবে নিশ্চয়ই তাঁর অর্থাভাব অত্যধিক। এবং তারই চিহ্ন তাঁর চোখে মুখে পরিস্ফুট থাকবে। কিন্তু এতো তা নয়—এ মেয়ের মুখে কোথাও তো মনের অপ্রাচুর্যের কথা লেখা নেই? এ হয় সন্ন্যাসিনী, না হয় বিপ্লবিনী, স্টীয়ারিং-এর ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে রাঘেশের চিন্তারও মোড় ঘুরে যায়।

সত্যি কি শকুন্তলা দীক্ষা নিল, আজ এই বৈশাখী ঘাটীর কাছে থেকে এই অপরাহ্ণ বেলায় নব সন্ন্যাসের? গ্রামের পথ দিয়ে গাড়ী ছুটে চলেছে। শকুন্তলা গালে হাত দিয়ে বসে আছে। দূরে দেখা যাচ্ছে দামোদরের জল রেখা। পড়ন্ত বেলার রৌদ্রে তার বালুবেলা ঝকঝক করছে। পথের ধার দিয়ে সার বেঁধে গ্রাম্য মেয়েরা যাচ্ছে জল আনতে। পাশে পাশে তাদের জড়িয়ে আছে লজ্জা, মুখ অবগুণ্ঠনে ঢাকা। কোথা দিয়ে এরা আসে, দেখবে? কি করে বঞ্চিত হবে এই গ্রাম্য পরিবেশ? শকুন্তলা গালে হাত দিয়ে ভাবছে; এদের জাগাতে হবে। এই গণচেতনা জাগ্রত না হলে দেশ এগিয়ে আসবে কি করে?

একটি অসমতল জায়গায় ধাক্কা খেয়ে রাঘেশের গাড়ী-খানা একবার ভীষণ ভাবে লাফিয়ে উঠল। রাঘেশ ব্যস্ত হয়ে বললে, "লাগেনি ত মিস চৌধুরী? শকুন্তলার কাণে সে কথা প্রবেশ করল কিনা বোঝা গেল না। কারণ তখনও সে তেমনিভাবে গালে হাত রেখে প্রান্তরের দিকে চেয়ে বসেছিল। রাঘেশ ভাবল, এ মেয়ে নিশ্চয়ই মায়াবিনী নয়, অভিনেত্রী। কিন্তু তবুও ওর মধ্যে একটা মনোহারিত্ব আছে, (ইংরাজীতে যাকে বলে Charming, তাই আরকি) যা এই বর্ণরেণু মাখা গোধূলি বেলায় রাঘেশের মনকে বারে বারে স্মরণ করিয়ে দিতে লাগল মহাকবি কালিদাসের মানসকন্যা শকুন্তলার কথা। সে শকুন্তলাও কি এমনি তন্বী দীর্ঘাঙ্গী ছিল? এমনিতরো কি ছিল, তার চোখেও বিদ্যুতের আলো? এমনি তরোই ভাব নিয়ন্ত্রা ছিল সেও? যার জন্য তাকে মহামুনি দুর্বাসার কোপানলে পতিত হয়ে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দিতে হয়েছিল জীবনের সমস্ত সুখ বিসর্জন। এও কি নিজেকে কোনও কোনও শুভক্ষণে উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে মনে মনে! তাই এই ভাব বিহ্বলতা?

রাঘেশ যখন শকুন্তলার রূপ এবং চারিত্রিক রহস্যের ইন্দ্রজালের পাশে ব্যাকুল পতঙ্গের মত অনুধাবন করছে শকুন্তলার মন তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে ধর্মতলা, এসপ্ল্যানেড, কলেজ ষ্ট্রীট আর ওয়েলিংটন্ ষ্ট্রীটের মোড়ে মোড়ে।

(

"আমরা এসে পড়েছি।"—

শকুন্তলা গালের থেকে হাত নামিয়ে দেখল, একটী একতলা বাড়ীর সামনে এসে ওরা দাঁড়িয়েছে। মেহেদী গাছের বেড়া দিয়ে ঘেরা বাগানটি ঠিক ছবির মত। মাঝে ব্যাঁকারির দরজা। চারিদিকে নির্জন প্রশান্তি। শকুন্তলার মনে হোল এসবই তার যেন অনেক দিনের চেনা। সে গাড়ী থেকে নেমে বললে, "আমি এইখানেই থাকবো?"

রাঘেশ বললে, "হাঁ, আপনার কোয়ার্টার দেখিয়ে দিচ্ছি চলুন। মিস চৌধুরী, এই আমাদের কমলা বিদ্যামন্দির। একেবারে শিশু।"

"শিশুই একদিন তরুণ হয়"—বলে শকুন্তলা রাঘেশের দিকে চোখ তুলে তাকাল, দেখল সুন্দর সুপুরুষ এক যুবাকে। পরিশ্রমের ফলে মুখটি হয়ে উঠেছে লাল। যে কোনও তরুণী মেয়ের চোখে এই ছবিখানি অতি সুন্দর ঠেকত, এ কথা বলতে, কোনও বাঁধা নেই। কিন্তু শকুন্তলার মন তাতে অভিভূত হোল না। সে বললে, "সেক্রেটারী বাবুর সঙ্গে কি এবেলাই দেখা করতে হবে?"

রাঘেশ বললে, "কোনও দরকার নেই। আজ আপনি ক্লান্ত, এখন বিশ্রাম করুন। কাল আপনাকে আমি অফিসে নিয়ে যাবো।"

বারান্দার একপাশে একটি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার পানে চেয়ে সে বললে, "বকুলদি, ইনি আমাদের হেড

মিস্‌ট্রেস। দেখো, এঁর যেন কোনও রকম অসুবিধে না হয় এখানে।"

শকুন্তলা বললে, "আমার জন্য আপনাকে অনেক পরিশ্রম করতে হচ্ছে রাকেশ বাবু।"

রাকেশ বললে, "আপনার অনুগ্রহে আমাদের স্কুলটি চালু হলে, আমাদের আর কোনও কষ্টই থাকবে না মিস্ চৌধুরী – আচ্ছা চলি এবার ; নমস্কার।"

শকুন্তলা নমস্কার করে বললে, "অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

বারান্দার পিছনে একটি প্রকাণ্ড ঘর। তাকে চার ভাগে বিভক্ত করে চারটি ক্লাসরুম তৈরী করা হয়েছে। পঞ্চম ষষ্ঠ শ্রেণীতে খুব কম ছাত্রী পড়ে। তাতেই সে দুটো ক্লাস পিছনের ঢাকা বারান্দায় করা হয়েছে। হল ঘরটির দক্ষিণ দিকে একটি বেশ বড় ঘর। বকুলদি সেই ঘরে শকুন্তলাকে নিয়ে গিয়ে বললে, "এই ঘরটি আপনার দিদিমণি"—ঘরে প্রবেশ করে শকুন্তলা দেখল, তার সাজ সজ্জা অতি সাধারণ হলেও বেশ মার্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। ঘরের দক্ষিণ দিকের জানালার ধারে একটি খাট পাতা। শিয়রের কাছে একটি তেপায়াতে সেদিনের একখানি সংবাদ পত্র রয়েছে। একটী ফুলদানিতে কয়েক গুচ্ছ সূর্যমুখী ফুল। ধূপ পুড়ছে নিঃশব্দে। তার গন্ধে ঘরটি সুরভিত। ওধারে একটি টেবিল এবং তার কোলে একটি চেয়ার পাতা। দেয়ালে একটি সাবেকী আয়না টাঙানো। তার নীচে একটি ছোট টুল। একটি ঝকঝকে হ্যারিকেন লণ্ঠন টেবলের উপর বসানো রয়েছে। উত্তর দিকে জানালার সামনে একটি ইজি চেয়ার পাতা। দ্বারদেশে একটি চমৎকার হাতে বোনা পাপোষ। ঘরের দেওয়ালে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীদের সুন্দর প্রতিকৃতি টাঙানো রয়েছে।

শকুন্তলা বিস্মিত হয়ে বকুলদির পানে চাইল। দেখল শ্রীময়ী এক অপরূপা নারী মূর্তি। বেশ বাস নিতান্ত সাধারণ হলেও বেশ একটা দীপ্তি আছে সর্বত্র। মুখের দিকে চাইলেই একে সম্ভ্রম করতে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। আপনা হতেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "এ সবতই আপনার পরিকল্পনা বুঝি বকুলদি ?"

বকুলদি হাতজোড় করে বললে, "ছি ছি দিদিমণি আমায় আপনি বলে সম্বোধন করে আর লজ্জায় ফেলবেন না। আমি বিদ্যামন্দিরের সামান্য একজন পরিচারিকা মাত্র। আপনি কতবড় বিদুষী, কত সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে, আপনাকে আমার শ্রদ্ধা করতে দিন। আপনার স্নেহচ্ছায়ায় মানুষ হতে দিন। এখানে সকলেই আমায় দিদি বলে, সেইজন্য আপনি শুধু দিদি বলতে পারেন। কিন্তু তার বেশী আর কিছু নয়।" বকুলদি যতক্ষণ কথা বলছিল, শকুন্তলা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছিল। তার কথা শেষ হলে সে বললে, "আচ্ছা তোমার কথাই রইল বকুলদি। কিন্তু তুমি ছদ্মবেশী পরিচালিকা নও ত ?"

বকুলদির সুন্দর, আশ্চর্য রকমের করুণ মুখে হঠাৎ একবার বেদনার নীল বিদ্যুৎ বলসে উঠল। সে বললে, কি যে বলেন দিদিমণি তার ঠিক নেই। আপনি একটু বিশ্রাম করুন। আমি চা নিয়ে এখনি আসছি"।

বকুলদি চলে গেল। শকুন্তলা বাক্স খুলে সাবান তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে গেল।

রাত্রে খেতে বসে শকুন্তলা বললে, "বকুলদি, তোমার খাবার কই ?"

"বিধবাদের ত এসব জিনিষ খেতে নেই দিদিমণি ?" বকুলদি বললে।

শকুন্তলা চমকে উঠে বকুলদির দিকে চাইল। ইস, বকুলদি বিধবা। নিশ্চয়ই তার জীবনে মস্তবড় একটা দুঃখ রয়েছে ? কিন্তু এটা দুঃখ না ফাঁকী, ও ঠিক বুঝতে পারে না।

বকুলদি বললে "রান্না কেমন হয়েছে দিদিমণি ?"

শকুন্তলা বললে, "চমৎকার হয়েছে বকুলদি। মা যাবার পরে এমন সব খাবার খেয়েছি বলে মনে পড়ে না।"

হাতের বোনাটি বাটিতে রেখে বকুলদি বললে, "আহা, মা না থাকার দুঃখ আমি জানি দিদি।"

শকুন্তলার মনেই রইল না যে, ও একজন স্কুলের পরিচারিকার সঙ্গে কথা বলছে। বকুলদির বয়সের মত সাদা মুখে বিশ্বের স্নেহ সমুদ্র যেন জমাট বাঁধা। শকুন্তলার মনে হোল, ও যেন বহুদিন খুঁজে পেয়েছে নিজের একটা বড় বোন। মানুষের মন এমনি ; সে কখন কাকে সে কি

ভাবে গ্রহণ করে তা নিজে জানতে পারত না! ও আত্মগত ভাবে বলতে লাগল, "প্রথম প্রথম বড় কষ্ট হোত বকুলদি। লুকিয়ে কেবলি কাঁদতুম। কিন্তু বিমাতার সঙ্গে মতান্তর, মনান্তর ধীরে ধীরে আমার মনকে কঠিন করে তুলতে লাগল। তারপর অতিষ্ট হয়ে একদিন তিনি ও বাবা আমায় যখন বোর্ডিং-এ পাঠিয়ে দিলেন, তখন আমার কিশোর মন ভেবেছিল, সেইখানে সে খুঁজে পাবে তার শৈশবের সোনার দিনগুলি।"

শকুন্তলা চুপ করল। বকুলদি বললে, "তারপর দিদিমণি?"

তারপর? শকুন্তলা বললে, "তারপর আমার কিশোর মন সেই হারিয়ে ফেলা শৈশবকে খুঁজে না পেলেও, পেয়েছিল এক স্বাধীন সত্তার অনুভূতি সমস্ত জীবন ভরে। তারপর বোর্ডিং জীবন শেষ হয়ে গেলে এলুম কলেজ হোষ্টেলে। অশান্তির ভয়ে বাবা আমাকে ছুটির সময় বাড়ী নিয়ে যেতেন না। পাঠিয়ে দিতেন আমার এক মাসীমার বাড়ী। অনেক জায়গায় গেছি, অনেক দেখেছি, সকলেই আমার সমালোচনা করে, কেউ সহযোগিতা করে না। দূর থেকে দেখে, কাছে ডাকে না। নারীর আত্ম স্বাতন্ত্রকে অগ্রাহ্য করার জন্য সকলেই যেন উন্মুখ।"

বললে, "আপনার মতের সঙ্গে কারুর মতের মিল হয় না নিশ্চয়ই"—ঠিক বলেছ বকুলদি, শকুন্তলা বললে, "আমার মত ও পথ সকলের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।"

"সে ত দেখতেই পাচ্ছি দিদিমণি—বকুলদি বললে", তা না হলে এতো বড় বিদুষী মেয়ে কেউ কখনও এই অজ গ্রামে আসে? সহরের বড় বড় স্কুল কলেজ আপনাকে পেলে লুফে নেবে।

শকুন্তলা কোনও কথা না বলে, নীরবে খেতে লাগল। এক সময় বকুলদি আবার বললে, "আচ্ছা দিদিমণি এখানে আসাতে, আপনার বাবার মত ছিল?" শকুন্তলা বললে, "না বকুলদি, বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে চলে এসেছি। একটু নীরব থেকে সে আবার বললে", বাবা আমার এক জায়গায় বিয়ের ঠিক করেছিলেন, কিন্তু যাকে চিনি না, জানি না তার কাছে হঠাৎ নিজেকে সমর্পণ করার মধ্যে আমি কোনও আদর্শই দেখতে পাইনে। আর একটা কথা—শকুন্তলা একটু থেমে খানিকটা জল খেয়ে বললে, "আর একটা কথা, আত্মীয় অনাত্মীয় অনেক পুরুষের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। তাদের আমি বেশ ভালোভাবেই চিনি কিন্তু এইসব পুরুষের মধ্যে প্রেমে পড়ার মত এমন কিছু দুর্লভ বস্তু আছে বলে আমি মনেই করিনে"—বকুলদি একটুখানি মুখ টিপে হেসে বললে, "তবে নারী পুরুষের মধ্যে প্রেম হয় কি করে দিদিমণি?"

শকুন্তলা নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললে, "তোমরা যাকে বল প্রেম, আমি তাকে বলি আত্মবিলুপ্তি। যার ফলে মানুষ সৃষ্টি করে আরও কতগুলি মানুষ।

বকুলদি বললে, "তারও ত দরকার আছে দিদিমণি। উত্তরাধিকারী হিসেবে ত মানুষের দরকার। মানুষ না হলে সৃষ্টি রক্ষা করবে কে?"

শকুন্তলা বললে, "পৃথিবীর সমস্ত নর ও নারী তাই করুক। আমি ত কাউকে নিষেধ করছিনে? তবে আমার ও পথ নয়।"

বকুলদিও ছাড়বার মেয়ে নয়। সে বললে, "আচ্ছা দিদি, প্রেম যদি কিছুই নয় একটু ভুয়ো জিনিষ: তবে মানুষ মানুষের জন্য কাঁদে কেন?"

কাঁদে ঠিক—শকুন্তলা বললে, "মানুষ প্রেমে পড়ে কাঁদে ঠিক, তবে সে কান্নার জন্ম প্রেমের থেকে হয় না। তার জন্ম হয় মনের করুণ অনুভূতি থেকে। মানুষ কাঁদে নিজের জন্য, অপরের জন্য নয়। মানুষ যা কিছু করে করে সবই নিজের আত্মতুষ্টির জন্য করে। তবে যার মনের দৃষ্টিভঙ্গী উন্নত সেই করতে পারে জীবনে উন্নতি। কারণ মানুষ অনিচ্ছায়, মনের অস্বীকৃতিতে কোনও কাজ করতে পারে না—করলে তা সার্থকও হয় না। কাজেই পর, কথাটা নিজেকে ভোলাবার একটা মহামন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রেম কথাটাও ঠিক তাই। ওটা নিজেরই অনুভূতির একটা বিকৃত রুচি ভিন্ন আর কিছুই নয়।"

বকুলদি ত অবাক, এ মেয়ে বলে কি? প্রেমের যদি কোনও মূল্যই না থাকে ত' সে কিসের জন্য জন্ম জীবন, ভোর করছে এই কৃচ্ছ্রসাধন? ওর মুখের দিকে চেয়ে শকুন্তলা হঠাৎ কথা কয়ে উঠল, তুমি কি ভাবছ বুঝেছি

বকুলদি—কিন্তু তোমার এই কৃচ্ছ্রসাধন, এও জেনো তোমার আত্মতুষ্টির জন্য ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ এর পিছনে আছে তোমার বিরাট আশা। পরজন্মে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হবার মনোবল। বল তাই নয় কি ?"

বকুলদি কি বলবে ? দুষ্টছাড় মেয়েকে সে বোঝাবে কি করে ? লেখাপড়ে নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করলে সে ত তেতে হবেই। অতঃপর শকুন্তলার নিটুর হাত থেকে মৃত স্বামীর আত্মার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সে বললে, থাকগে দিদিমণি ওসব কথা। আমি যা বুঝিনি তার জবাব দোব কি করে ? এখন বলুন আপনার বিয়ের কি হোল ?"

শকুন্তলা হেসে বললে, "বিয়ের বিষয় কৌতূহলী হওয়া ত ব্রহ্মচারিণীদের উচিত নয়। তারপর বকুলদির দিকে চেয়ে বললে, "আচ্ছা বলছি, তুমি রাগ কোর না বকুলদি। আমি শুধু এইটুকুই প্রমাণ করে দিলুম যে তোমার এই ব্রহ্মচর্য্য নিজেকে রক্ষা করার জন্য মাত্র—তোমার মৃত স্বামীর সম্মানের জন্য নয়। এইরকম প্রত্যেক মানুষকেই আমি তার ভুল বুঝিয়ে দোব। যাতে আগামী কালের মানুষরা আজ চেঁচামিচি না করে "পরের জন্য জীবন, পরের জন্য জীবন। জীবন নিজের জন্য। সকলেরই উচিৎ এই নিজ জীবনের উন্নতির প্রতি সতর্ক থাকা। কারণ নিজ নিজ আত্মার উন্নত বিকাশের মধ্যে দিয়েই ধরা পড়বে, সমগ্র জাতি ও পৃথিবীর উন্নতি ও অবনতির প্রধান রূপটি।"

বকুলদির বরফের মত সাদা মুখের দিকে চেয়ে সে বললে, "আমার কাছে ফাঁকী চলবে না। বকুলদি উত্তর দাও আমার কথার ?"

বকুলদি বললে, "উত্তর দোব দিদিমণি আজকে নয় এবং মুখেও নয়। আপনার বন্ধু হয়ে সহযোগিতার মধ্য দিয়ে। এখন বলুন আপনার বিয়ের গল্প"—শকুন্তলার সুন্দর মুখ হাসিতে ভরে উঠল ; সে বললে, "আমি তাই ভেবে ছিলুম। আচ্ছা এবার শোন বিয়ের পরিণতি। বাবাকে আমার মতামত জানাতে তিনি উঠলেন ভীষণ রেগে। বললেন সব কিছুকে অস্বীকার করাই তোমার স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আমার কর্ত্তব্য থেকে বঞ্চিত করার স্পর্দ্ধা তোমার নেই। এটা জেনে রেখো। আমার কাজ আমি কোরবোই।" আমারও মাথায় মাথায় রোখ চেপে গেল, বিয়ে আমি কোরব না। কিন্তু বাবার অবাধ্য হয়ে ত বাবার বাড়ীতেও থাকা চলে না। কাজেই সেখান থেকে খালি হাতে বেরিয়ে একেবারে চলে এলুম মাসীমার বাড়ী। বাবা একদিন সেখানে এসে আমার জিনিষ পত্র সব দিয়ে গেলেন। মাসীমার কাছে কিছু টাকা দিয়ে গেলেন। কিন্তু আমার সঙ্গে একটাও কথা কইলেন না। কয়েক সেকেণ্ড নীরব থেকে শকুন্তলা আবার বললে, "তারপর থেকে আমিও নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করলুম। কলকাতার দুটো কলেজে কাজ করে মনে সুখ না পেয়ে চলে এসেছি এখানে"।

বকুলদি বললে, "এখানে সুখ আপনি পাবেন দিদিমণি। তবে বাপ-মার রাগ, সন্তান দুদিন চোখের আড়াল হলেই সব অন্ধকার দেখেন। তারপর খানা-তল্লাসী করে অভিমানী খোকা খুকীকে কোলে টেনে নেন।"

শকুন্তলা মৃদু কণ্ঠে বললে, "হয়ত বা তোমার কথাই ঠিক বকুলদি"—

তার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। বকুলদি বললে, "আমি আপনার পাশের ঘরেই থাকবো। মাঝখানে দরজা আছে। রাত্রে যদি কোনও দরকার হয় ডাকবেন আমায় বুঝলেন দিদিমণি"—

শকুন্তলা বললে, "যদিও রাত্রে আমি ঘুমাই কম, তাহলেও ঘুম আমার একেবারে নীরেট। বোমা পড়লেও ভাঙে কিনা সন্দেহ।"

ও চলে চলে গেল। বকুলদি সেইখানে বসে বুনতে লাগল।

(ক্রমশঃ)

মহিলা সমাচার

জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

গিরি আরোহণে মহিলা

হিমালয় অন্তর্গত ২৬,২৫৮ ফুট উচ্চ 'চো ওয়' শৃঙ্গে আরোহণের জন্য একদল মহিলা গত আগষ্ট মাসে অভিযান শুরু করেন। এই নারীবাহিনী ম্যাডাম ক্লড কোলানের নেতৃত্বে ১২ জন মহিলা লইয়া গঠিত। তাহাদের মধ্যে ৯ জন শ্বেতাঙ্গিনী ও ৩ জন ভারতীয়। ভারতীয় সকলেই তেনজিং নোরকের কন্যা ও ভাতুষ্পুত্রী।

ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়ায় বঙ্গললনা

২৭শে আগষ্ট কুমারী আরতি সাহা (১৯ বৎসর বয়স্কা) দুর্দান্ত বর্ষার উত্তাল তরঙ্গায়িত ইংলিশ চ্যানেল পার হইবার অভিযান করেন। তাহার সঙ্গে এ্যামেরিক্যান মিস্ গ্রেটা এ্যাণ্ডারসন, মনিকা টমসন এই সাঁতার প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কার পাইয়াছেন। যদিও আরতি সাহা পুরাপুরি চ্যানেল পার হইতে পারেন নাই, তাহার সাঁতারদক্ষতা, ক্ষিপ্রতা ও নির্ভিকতা লক্ষ্য করিয়া ৭৫ পাউণ্ড পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। আবার মিস সাহা ৩০শে সেপ্টেম্বর চ্যানেল ১৬'২০ মিনিট মধ্যে অতিক্রম করিয়া এশিয়ান মহিলাদের মধ্যে প্রথম চ্যানেল অতিক্রম সাঁতারুর গৌরব লাভ করিলেন।

উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে বঙ্গরমণী

সম্প্রতি অনেক বঙ্গরমণী আমেরিকা ও ইউরোপে নানা বিষয়ে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ এবং অধ্যয়ন করিবার জন্য গিয়াছেন।

শ্রীমতী সুজাতা লাহিড়ী, এম-এস-সি, লক্ষ্ণৌ ড্রাগ রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের কর্মী বায়োকেমিষ্ট্রিতে এম-এস-সি পড়িবার জন্য ক্যানাডায় গিয়াছেন।

কুমারী নবনীতা দেব যাদবপুর হইতে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পাশ করিয়াছেন। তিনি আমেরিকার ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিষয়ে গবেষণা করিয়া ডক্টরেট পরীক্ষা দিবার জন্য যোগদান করিয়াছেন। ইনি কবিদম্পতি নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবীর একমাত্র কন্যা।

শ্রীমতী বাণী চক্রবর্ত্তী, এম-এ, ব্যবহারিক মনস্তত্ত্ব বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ পাশ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি টাটা ইনষ্টিটিউট্ হইতে সোস্যাল সায়েন্সে ডিপ্লোমা পান। সম্প্রতি তিনি স্কলারশিপ করিয়া যুক্ত আমেরিকা রাষ্ট্রের সেনিসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করিয়াছেন। আমরা ইহাদের সাফল্য কামনা করি।

বাঙ্গালীর মেয়ের এক অভিনব পুরস্কার লাভ

কলিকাতায় ৭ নং চৌরঙ্গী রোডে প্রাক্তন হোয়াইট এ্যাওয়ে লেডলর বাড়ীতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ইউ-এস্-আই-এস্ সংস্থা এক বিরাট আরাম ও জ্ঞানদায়ক গ্রন্থাগার করিয়া নগরবাসীদের পরম উপকার করিতেছে। সেই লাইব্রেরীর পাঠকপাঠিকার সংখ্যা ৫০ হাজারের অধিক হইয়াছে। শ্রীমতী দীপ্তি মুখার্জী ৫০ হাজারতম সভ্য শ্রেণীভুক্তা হইলেন, সেই জন্য এই সংস্থার ডিরেক্টর চার্লস এচ সাণ্ট্রাণ্ড মহাশয় দীপ্তি দেবীকে একখানি মূল্যবান পুস্তক উপহার দেন।

বাঙ্গালা শিক্ষায় অবাঙ্গালী মেয়েদের আগ্রহ

২৭শে সেপ্টেম্বর তিলক হলে নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির ২২তম সমাবর্ত্তন উৎসব হইয়া গেল। বর্ত্তমান বর্ষে যে সর্বভারতীয় বাংলা পরীক্ষা হইয়াছিল তাহাতে মোট ১৮৭ জন আদ্য মধ্য অন্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার মধ্যে আদ্য পরীক্ষায় ৪৩টি মহিলা, মধ্য পরীক্ষায় মোট ৫৩ জন মধ্য পরীক্ষায় মোট ২৭টি মহিলা উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

ভারতীয় তামিলসঙ্ঘ হইতে ৩৯, পদ্মপুকুর কেন্দ্র হইতে

১৪, মহারাষ্ট্র মণ্ডল ২, গুজরাতি স্ত্রীমণ্ডল ২৪, গুজরাতি মহিলামণ্ডল ১, রামকৃষ্ণপুর ১, প্রাইভেট ২, বোম্বাই ৮, দিল্লী ২, এর্ণাকুলাম ৪, জিভাগ্রাম ১, নাগপুর কেন্দ্র ১, কাশিয়ং ১১, লাভলিং ২।

মধ্য পরীক্ষার ছাত্রীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী সুব্রহ্মণ্যেরান 'মীর দত্ত' পদক, অন্ত পরীক্ষার প্রথম হওয়ায় স্বর্ণমণ্ডিত 'রবীন্দ্র ঘোষ পদক,' শ্রেষ্ঠ ছাত্রীরূপে কুমারী পদ্মা আয়েঙ্গার 'অন্নপূর্ণা গোস্বামী' স্বর্ণমণ্ডিত পদক, পার্ব্বত্য প্রদেশের শ্রেষ্ঠ ছাত্রী 'সান্ত্বনা রায়' পদক, শ্রীমতী রুক্মিণী সুব্রহ্মণ্যেরান (কাশিয়ং), শ্রীমতী আশা সপ্রু (দিল্লী) 'রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়' স্বর্ণমণ্ডিত পদক পাইয়াছেন। বাংলা গানের জন্য 'রাসকুমার চাওলকার' স্বর্ণপদক ও কীর্ত্তনের জন্য 'পি, কে, মুখার্জী' স্বর্ণমণ্ডিত পদক কুমারী ভি যোগাম্বল পাইলেন। বাংলা আবৃত্তির জন্য মধ্য পরীক্ষার্থিনী শ্রীমতী চন্দ্রা পূজারী 'নীল' পদক এবং উইলসন সপ্তম শ্রীমতী সুন্দরম পাইয়াছেন। গুজরাতি স্ত্রীমণ্ডলে বাংলা শিক্ষার্থীদের পর্দা নৃত্যের জন্য প্রদান করা হইয়াছে।

গার্ল গাইড মহাসম্মেলনে ভারতীয়

গত জুলাই মাসে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কালারোডে সহরে বিশ্ব গার্ল গাইড মহাসমাবেশ হয়। পৃথিবীর ২৬টি দেশের হাজার তরুণী যোগদান করেন। ভারত হইতে কুমারী পুষ্প রানাডে (বোম্বাই নিবাসী) এবং বীণা আগরওলা (নারা দিল্লীবাসী) যোগদান এবং কোন কোন অভিযানের নেতৃত্বও করেন।

বঙ্গের বাহিরে বাঙালী ছাত্রীর কৃতিত্ব

বর্ত্তমান বর্ষে ইউ, পি মধ্যশিক্ষা বোর্ডে আই-এ পরীক্ষায় কুমারী ইন্দিরা চট্টোপাধ্যায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

এ বৎসর লক্ষ্ণৌয়ের কন্যার মিউজিক বোর্ডের 'সঙ্গীত তীর্থ' পরীক্ষায় শ্রীমতী সবিতা রক্ষিত ১ম বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

আগত আরতি দত্ত

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর আমাদের প্রিয়তম শ্রীমতী আরতি দত্ত নেদারল্যাণ্ড সমাজিক শিক্ষায় কৃতিত্বের সহিত 'থিসিস' লিখিয়া ডিগ্রোমা প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তাঁহাকে আমরা সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। তাঁহার গৌরব ও শান্তিময় দীর্ঘজীবন কামনা করি।

১৯শে সেপ্টেম্বর সরোজনলিনীর গভর্ণিং বডির সভ্যরা তাঁহাকে এক প্রীতি সম্মেলনে সাদর অভ্যর্থনা জানান। আমাদের আশা ও ভরসা যে তাঁহার কলেজ অভিজ্ঞতা দ্বারা সমগ্র দেশের নারীসমাজ বিশেষ উপকৃত হইবে।

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি

বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় গত বৎসরের পরীক্ষিত হিসাব ও কার্য্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন করা হয়। ১৯৫৯-৬০ সালের জন্য নিম্নলিখিত কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হয়:

প্রধান পৃষ্ঠপোষক—পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু। পৃষ্ঠপোষক: শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস ও শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুর। সভাপতি: শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ, সহ-সভাপতি: শ্রীমতী বিভা ঘোষ, শ্রীমতী মনীষা রায়, শ্রীমতী চিত্রলেখা সিন্ধান্ত ও শ্রীমতী মণিকা গুপ্ত।

সাধারণ সম্পাদিকা: শ্রীমতী গীতা মুখার্জী, কোষাধ্যক্ষ: শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সহ-কোষাধ্যক্ষ: শ্রীপ্রফুল্লকুমার রায়, মহিলা সমিতি বিভাগীয় সম্পাদিকা: শ্রীমতী প্রীতি সেন, বিদ্যালয় বিভাগীয় সম্পাদিকা: শ্রীমতী আরতি দত্ত, আরও ২১ জন নির্ব্বাচিত সদস্য, এতদ্ভিন্ন সরোজনলিনী শিল্প ও ট্রেণিং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা-

ঘর, কলিকাতা কর্পোরেশনের দুইজন কাউন্সিলার, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিল্প ও স্বাস্থ্য বিভাগের একজন করিয়া প্রতিনিধি এই কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় রহিয়াছেন।

মহিলা সমিতি পরিদর্শন

সরোজনলিনী কমিটির কার্য্যকরী সমিতির সদস্যাদের অনেকেই মহিলা সমিতি পরিদর্শন করিয়া সমিতির কর্ম্মীদের উৎসাহিত ও শিল্পকাজে নতুন নতুন পরিকল্পনা প্রদান করিয়া থাকেন। সম্প্রতি যে সকল সদস্যা যে যে সমিতি পরিদর্শন করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করা যাইতেছে :

শ্রীমতী সুনীলা গুপ্তা, আজাদগড় ও কলিকাতাস্থিত একাধিক মহিলা সমিতি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি সমিতির বিভিন্ন কার্য্যাবলী বিষয়ে সকল তথ্য সংগ্রহ করেন।

হাওড়া রেলওয়ে মহিলা সমিতির বার্ষিক উৎসব পালন উপলক্ষে এক বিশেষ অনুষ্ঠান ও শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। শ্রীমতী প্রীতি সেন ও শ্রীমতী সবিতা ব্যানার্জ্জী উক্ত উৎসবের দ্বিতীয় দিবসে যোগদান করেন এবং সমিতি কর্তৃক আয়োজিত শিল্প প্রদর্শনী দেখিয়া বিশেষ প্রীত হন।

শ্রীমতী অমিতা চৌধুরী ও শ্রীমতী প্রীতি সেন কাঁচড়াপাড়া ও ভাঙ্গাপাড়া সমিতি পরিদর্শন করেন। সমিতিঘরের বিভিন্ন কার্য্যাবলী বিশেষভাবে তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখেন এবং শিল্পকাজ সম্বন্ধে তাঁহারা নতুনতুন ধারণা দেন।

জালপুর মহিলা কল্যাণ সমিতির কার্য্যবিবরণী

১৯৫৮ সালে সমিতির কার্য্যক্রমের দ্বিতীয় বৎসর শেষ হইয়াছে। এই বৎসর সমিতির সদস্যসংখ্যা ছিল :

স্থায়ী	—	৭১
অস্থায়ী	—	২৬
পৃষ্ঠপোষক সদস্য	—	৭

সমিতির তত্ত্বাবধানে এই বর্ষের—

১। ছাট, কাট, সেলাই, বুনন, সুতাকাটা প্রভৃতি শিক্ষা বিভাগ

২। বয়স্ক শিক্ষা বিভাগ

৩। নৃত্য গীত প্রভৃতি সুকুমার কলা বিভাগ ও

৪। সমাজসেবা ও উন্নয়ন বিভাগ পরিচালিত হইয়াছে। এই বিভাগের তত্ত্বাবধানে বৎসরের যাবতীয় উৎসব, যথা : গান্ধীজীর জন্মতিথি, নেতাজীর জন্মতিথি, স্বাধীনতা দিবস, সাধারণতন্ত্র দিবস, রবীন্দ্র জন্মোৎসব, প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

এই বৎসর ২০টি নিরক্ষরা মহিলাকে আক্ষরিক জ্ঞান দান করা হইয়াছে এবং ১৬টি মহিলা ছাট, কাট, সেলাই প্রভৃতি শিখিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত মাতৃমঙ্গল, শিশুপালন ও পরিবার নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে নিয়মিত আলোচনাদি করা হইয়াছে এবং তাহাতে কিছু কিছু ফললাভ হইয়াছে। সমিতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলাগণের মধ্যে উপযুক্ত বিবেচনায় এই বৎসর ২৫০৲ হিসাবে ৬ জনকে সরকার হইতে শিল্প ঋণ সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ঋণের সাহায্যে তাহারা প্রত্যেকেই একটি করিয়া উষা সেলাইকল (ফুট) পাইয়াছেন। তবে সমিতি এখনও তাঁহাদিগকে নিয়মিত কাজ সংগ্রহ করিয়া দিতে পারে নাই।

সমিতির সভানেত্রী এবং সম্পাদিকা ব্যক্তিগতভাবে রাজভবনে যাইয়া মাননীয় রাজ্যপালের একান্ত সচিব শ্রীযুক্ত শরদিন্দু দত্তমজুমদার আই-এ-এস্, মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় তাঁহার কৃপায় U.C.R.W. fund হইতে রাণাঘাট মহকুমা শাসকের মাধ্যমে একটি গভীর নলকূপ পাওয়া গিয়াছে। উহা বসান ও চাতাল তৈরী করা হইয়াছে। এই নলকূপটি এতদঞ্চলে বহু অনুন্নত পরিবারের জলকষ্ট দূর করিতেছে।

নদীয়া জেলাশাসক শ্রীযুত মোহিনীমোহন কুশারী আই-এ-এস মহাশয় সমিতির গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং ঘারোদ্ঘাটন উভয় উৎসবে পৌরোহিত্য করিয়া এবং নানা পরিকল্পনার মাধ্যমে বিশেষভাবে উৎসাহ দান করিতেছেন। নদীয়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুত নৃসিংহপ্রসাদ সরকার এম, এ, বি, এল ; এম, এল, সি মহাশয় এই সমিতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন।

বর্ত্তমান বৎসর হইতে এই সমিতি সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং উহার জুনিয়র ও সিনিয়র ডিপ্লোমা কোর্সের পাঠ্যক্রমানুযায়ী পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

গোবিন্দ নগর মহিলা সমিতি

১৯৫৬ সনের ৫ই আগষ্ট তারিখে কতিপয় উদ্যম মহিলাগণের চেষ্টায় ২নং গোবিন্দনগর মহিলা শিল্পাশ্রম নামে একটি মহিলা সমিতি স্থাপিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল অবসর সময়ে বয়স্ক মেয়েরা কিছু লেখাপড়া ও সেলাইয়ের কাজ করার জন্য সুযোগ ও সুবিধা পান। সমিতির কোনরূপ তহবীল ছিল না। মুষ্টি ভিক্ষা প্রচলন দ্বারা উহা খুব সাধারণভাবে ১৯৫৬ সন পর্য্যন্ত চালান হয়। ১৯৫৭ সনে জাতীয় সরকারের উন্নয়ন বিভাগ অগ্রসর হইয়া আসিয়া এই সমিতির সভ্যাগণ যাহাতে সাবলম্বী হইয়া নিজেরা কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে পারে, সেই বিষয়ে পরামর্শ দিয়া এবং নানারূপ সাহায্য করিতে থাকেন। ছাত্রী বেতন ও সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা-আদায় করিয়া ১৯৫৭ সনের প্রথম ভাগ হইতে একজন শিল্প শিক্ষিকা নিযুক্ত করেন এবং একটি সূচি শিল্প ও সিলাইয়ের ক্লাস খোলা হয়। ১৯৫৭ সাল অভয়াশ্রমের যোগাযোগে এই মহিলা শিল্পাশ্রমের মাধ্যমে একটি অক্ষর চরকার শিক্ষার কেন্দ্র খোলা হয়। তাহাতে ৪০ জন মহিলা যোগ দিয়া কাজ শিক্ষা করে এবং ২০ জন মহিলা শিক্ষা সমাপ্তে নিজ বাড়ীতে চরকায় সূতা কাটিয়া মাসিক অবসর সময়ে ১০—১৫৲ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে। ১৯৫৭ সনের নবেম্বর মাস হইতে এই সমিতি সরোজ নলিনী নারীমঙ্গল সমিতির সহিত অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ১৯৫৮ সনে এই সমিতিতে চাকদহ উন্নয়ন বিভাগ, একটি সিলাইর কল, হারমণিয়ম, ঘড়ি, বসিবার জন্য বড় সতরঞ্চ, চামড়ার কাজের জন্য Punching Machine একটি, বড় আলমারী ও প্রায় ৪০ গজ কাপড় দিয়া এই সমিতিকে সাহায্য করিয়াছেন। দুঃস্থ মানবগণের সেবার জন্য সময় সময় এই সমিতির মাধ্যমে দুগ্ধ ও ঘৃত বিতরণ করা হয়। এই সমিতি ১৯৫৮ সনের প্রথম ভাগ হইতেই একজন শিক্ষয়িত্রী মেয়েদের শিল্প শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন এবং এই সমিতি হইতে গত বৎসর ৫ জন মহিলা সিলাইয়ের সার্টিফিকেট পরীক্ষা দিয়াছিলেন এবং এই সমিতি সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির মফঃসলের পরীক্ষা কেন্দ্র বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। কাঁচড়াপাড়া ও চাকদহ সমিতির মহিলারা এই কেন্দ্রে পরীক্ষা দিয়াছেন। এই সমিতি অল্প বয়স্ক বালক বালিকার জন্য একটি Pre-Primary স্কুলও পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। তাহাতে ১৫-২০ জন বালক ও বালিকা রীতিমত শিক্ষা লাভ করিতেছে। গত ১৯৫৮ সনের শেষভাগে এই সমিতি ১৮৬০ সালের কোম্পানী আইনানুসারে রেজিষ্ট্রিকৃত হইয়াছে, কেন্দ্রীয় সরকার হইতে এককালীন ৬০০৲ ছয় শত টাকা দান-স্বরূপ পাইয়াছেন। উহা দ্বারা একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থাগার স্থাপন করা হইয়াছে। একটি আলমারী ও ছেলেমেয়েদের খেলার সামগ্রি খরিদ করা হইয়াছে। গত ১৯৫৮ সনে ২৫ জন বয়স্ক মহিলা এই সমিতি হইতে শিল্প শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সমিতির ৩-৫ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকার জন্য একটি নারছারী স্কুল খোলা হইয়াছে কিন্তু এই সমিতির নিজস্ব কোন গৃহ নাই। জনৈক সহৃদয় মহিলা এই সমিতিকে কিছু জায়গা দিয়াছেন। গত ২৩শে মার্চ্চ নদীয়া জেলার শাসক শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন কুশারী আই, এস্, মহোদয় এক গৃহের ভীত স্থাপন করিয়াছেন। জনসাধারণের দানেই উক্ত গৃহ নির্ম্মান কার্য্য সমাধা হইবে। আশাকরি অদূর ভবিষ্যতে এই সমিতি একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য হইয়া বহু জনহিতকর কার্য্য করিবে, এই আশাই আমি পোষণ করি ইতি—২৮।৮।৫৯

বিনীতা—
নীলিমা চক্রবর্ত্তী
সম্পাদিকা।

কবিতায় শতশ্লোকী গীতা
(দ্বিতীয় সংস্করণ]
শ্রীপুষ্প দেবী
প্রাপ্তিস্থান—দাসগুপ্ত এণ্ড কোং
৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
ও ১, ডাঃ শ্যামাদাস রো, কলিকাতা-১৯.